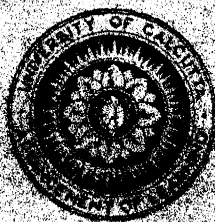
"গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতাবলী"

# বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম-এ





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

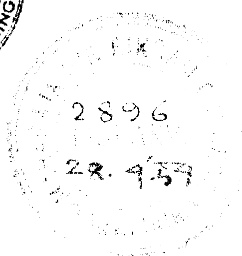
[illegible]৮

"গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতাবলী"

# বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম. এ.




কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৮

মূল্য—৭৲

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN, (OFFG.)
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
48 HAZRA ROAD BALLYGUNGE, CALCUTTA

1503 B—July, 1918—E

# ভূমিকা

"বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের "গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার"রূপে আমি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহাই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। বক্তৃতাদানের পর যথাসময়ে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মুক্তিলাভের সৌভাগ্য ঘটিল তাহার ছয় বৎসর পরে! শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ-বিভাগের নানা গোলযোগই নাকি এই অসম্ভব বিলম্বের কারণ। এই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যুগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ অস্বাভাবিক গোলযোগ হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয় এবং তজ্জন্য অনুযোগ করাও বোধ হয় অনুচিত, কিন্তু এই বিলম্বের ফলে আমার যে সকল অসুবিধা হইয়াছে তাহার দুই একটি পাঠকবর্গের গোচরে আনা কর্তব্য মনে করিতেছি। এই ছয় বৎসর যে সাধারণ বৎসর ছিল না তাহা বলা বাহুল্য। এই কয় বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সহিত আমাদের দেশেরও অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য এই গ্রন্থেরও নানা স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু ইহার যে অংশ পূর্বেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন করা সম্ভবপর ছিল না। কেবল শেষাংশের মুদ্রণকালে মাঝে মাঝে এই সুযোগ কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে উভয় অংশের মধ্যে হয়ত কোন কোন স্থলে অসামঞ্জস্যাদি দোষ ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন অল্পস্বল্প মুদ্রাকর প্রমাদও আছে। আশা করি, এরূপ কোন দোষ লক্ষিত হইলে পাঠকবর্গ তাহার কারণ বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু আর একটি কারণে এই বিলম্বের জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত। বাংলা নাটকের উৎপত্তিকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত

ইহার ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এই. প্রথম। কেবল বাংলা কেন, ভারতের আর কোন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত নাটকের এরূপ ইতিহাস রচনার চেষ্ট' বোধ হয় ইহার পূর্বে আর কখন হয় নাই। কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি "ইতিহাস" সঙ্কলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে উক্ত নাটকের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস বলা চলে না। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির দুই একটি কিংবদন্তিমূলক তথাকথিত ইতিহাস, কতিপয় নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং তাহাদের রচনাকাল-নির্ণয়ের ব্যর্থ বা সফল চেষ্টা ভিন্ন আর বেশী কিছু সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচ্যপণ্ডিতগণ সাধারণতঃ এই সকল পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতদেরই অনুবর্তী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু অধিক গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে নাটকের রচনাকালাদি লইয়াই বাদপ্রতিবাদে রত হইয়াছেন—সংস্কৃত বা প্রাকৃত নাটকের ক্রমবিকাশের ধারা আবিষ্কারের জন্য কোন প্রগাঢ় চেষ্টার লক্ষণ তাঁহাদের গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি কোন মহাজনের পথ অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই নাই এবং তাহার ফলে প্রতিপদক্ষেপে আমাকে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা ও গবেষণার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এরূপ পদাঙ্কবিহীন বিঘ্নসঙ্কুল অজানাপথে একা অগ্রসর হওয়া যে সুখসাধ্য নয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহার উপর আর একটি কারণ এই কার্য্যের দুরূহতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাঙালী জাতি ভারতের প্রাচীনতম জাতিগণের মধ্যে অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাদেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ দ্বারা এই মহাজাতি গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে এবং বহু ধর্মবিপ্লব ও অসংখ্য রাষ্ট্রবিপ্লব ইহার কৃষ্টি ও সমাজের উপর স্ব স্ব প্রভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের নাট্যপ্রবাহও স্বভাবতই আদিমকাল হইতে এই পরিবর্তনশীল বিমিশ্র কৃষ্টি ও সমাজের অনুগামী হইয়া চলিয়া আসিয়াছে।

সুতরাং ইহার উৎপত্তির মূল-উৎস অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গহনবনে প্রবেশ করিয়া পথপ্রদর্শকের অভাবে নিজের পথ নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছে এবং ইহার অভিব্যক্তি-শৃঙ্খলের যে সকল অংশ হারাইয়া গিযাছে বা লুপ্ত হইয়াছে, যুক্তিসঙ্গত অনুমানের সাহায্যে সে সকল অংশ পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় এবং সম্ভবতঃ আমারও কোন কোন স্থানে তাহা হইয়াছে। অবশ্য আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে সংগৃহীত তথ্য-গুলিকে যত্নসহকারে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক যাহা সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফলে যে আমি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিশূন্য হইয়াছি এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমার কখনও হয় নাই। তদ্ভিন্ন সর্বত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করাতে আমার অনেক সিদ্ধান্ত প্রচলিত-মতের বিরোধী হইয়াছে এবং এমন অনেক কথা আমি বলিয়াছি যাহা সাধারণের নিকট নিতান্ত অভিনব বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও গতানুগতিকতায় যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা তাঁহাদের চিরপোষিত সংস্কার ত্যাগ করিয়া আমার এই সকল নূতনমত যে সহজে গ্রহণ করিবেন এরূপ ভরসা আমি করিতে পারি না। এইজন্য নিরপেক্ষ, বিশেষজ্ঞ ও সর্বজনমান্য সমালোচকদের দ্বারা আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থটি সময়মত প্রকাশিত হইলে এ পরীক্ষা এতদিনে হইয়া যাইত। আমিও তদনুসারে নিজ ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইতে পারিতাম। এই প্রাচীন বয়সে ইহার পর আর তাহা সম্ভব হইবে কি না জানি না।

কিন্তু ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, অতীতে আমার এই দীর্ঘজীবন যে আমাকে একটা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে তাহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি। কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েক বৎসর পরেই ইহার সহিত আমার পরিচয়

আরম্ভ হয় এবং পরে নানা কারণে সে পরিচয় ক্রমশঃ খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে এই রঙ্গালয়ের ও এখানে অভিনীত নাটক-সমূহের ক্রমবিকাশের প্রথমাবধি সকল পর্য্যায় খুব নিকট হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি। তদ্ভিন্ন নানা রঙ্গালয়ের পরিচালকবর্গের অনুরোধে এই ব্যাপারে নেপথ্যে একটা প্রয়োজনীয় অংশও আমাকে বহুবৎসর যাবৎ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্য যুগের নাটকের আলোচনাকালে আমাকে যে সকল জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই কারণে আমি বর্তমানযুগের নাটকাদি-সম্বন্ধে অধিকতর দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এ যুগের যে সকল ঘটনাদির উল্লেখ আমি করিয়াছি সেগুলি প্রায় সমস্তই আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অথবা সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অবগত হইয়াছি। তাঁহারা সকলেই আমার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং ঐ সকল ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কিন্তু মন্তব্য ও সমালোচনাগুলি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের। সেগুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার রহিল সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর।

কিন্তু আশা করি পাঠক ও সমালোচকগণ সকল সময়ে মনে রাখিবেন যে, বাংলা নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত একটা বিবরণ দেওয়া এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু ইহা আমাদের নাট্য-সাহিত্যের অভিব্যক্তির ইতিহাস। সুতরাং আমাদের বহু নাটকেরই উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কেবল যে সকল নাটক ও ঘটনা আমাদের নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছে, কিংবা উহার প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, প্রধানতঃ সেই সকল নাটক ও ঘটনারই আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আমি প্রত্যেক যুগ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশপূর্বক কিরূপে নাটকগুলি নবযুগোপযোগী রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য যে সকল নাট্যকার নূতন কিছু দান করিয়া আমাদের নাট্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন

কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা কর্তব্য মনে করিয়াছি। কিন্তু জীবিত আধুনিক নাট্যকারগণের এরূপ দান সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও নানা কারণে তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি নাই। তাঁহারা সকলেই আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুতরাং আশা করি তাঁহারা আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া এ ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

নাট্যজগতে আমাদের এই প্রগতির যথার্থ মূল্য ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমি এই গ্রন্থমধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকেরও উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসের আলোচনাকালে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের সহিত আমি সর্বত্র একমত হইতে পারি নাই। পাশ্চাত্ত্যেরা সাধারণতঃ গ্রীক নাটক হইতেই এই ইতিহাস আরম্ভ করেন, কারণ গ্রীস-দেশকেই তাঁহারা তাহাদের সকল কৃষ্টির ও সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া মনে করেন। ইউরোপের বাহিরের কোন দেশ হইতে গ্রীস তাহার কৃষ্টির কোন অংশ লাভ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় তাঁহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। এমন কি, গ্রীসদেশ যে কেবল ইউরোপের আদি-গুরু নন, পরন্তু প্রাচ্যদেশীয়েরাও যে তাহাদের নাটকাদির আদর্শ গ্রীস হইতে পাইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই ব্যগ্র দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, নাট্যাভিনয় ব্যাপারটা প্রাচীনযুগের ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, সুতরাং গ্রীসদেশের মত এখানে সেকালে কোন "জাতীয়" নাটকের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই সকল পণ্ডিতের মতে, সংস্কৃত নাটকই প্রথম ভারতীয় নাটক, আর তাহা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল গ্রীকনাটকের জন্মের বহুশত বৎসর পরে। কিন্তু সে নাটকও "জাতীয়" নাটক ছিল না, কারণ সাধারণ জনগণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে নাট্যরসের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদ লাভ করিতেও আমাদের দেশের জনসাধারণকে ইহার

পর নাকি আরও দেড়হাজার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল! এই মত যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু অজ্ঞানসম্ভূত, তাহা আমি এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল নাট্যপ্রবাহই একটি মূল-উৎস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া একই ভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। একস্থান হইতে উৎপন্ন—কিন্তু বিভিন্নমুখী— নদীসমূহ যেমন দেশভেদে বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হয়, তেমনই একই উৎস হইতে উৎপন্ন নাট্যধারা বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, মানবের যে সহজাত চিরন্তন বৃত্তি তাহাকে উৎসবে মাতায় ও এইরূপে নানা ললিতকলা সৃষ্টি করিতে তাহাকে প্রণোদিত করে তাহা সর্বত্রই সমান। প্রস্তরযুগের অসভ্য মানবগণ-কর্তৃক গুহাগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলির সহিত আধুনিক-কালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রসমূহের তুলনা করিয়া দেখিলে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যে বৃত্তি মানুষকে প্রথমে কেবল "নৃত্ত" করায়, তাহাই ক্রমশঃ "নৃত্য"রূপে বিকশিত হইয়া শেষে "নাট্য" সৃষ্টি করে। আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, গ্রাক সভ্যতার জন্মের বহুপূর্বেই এদেশে এই নাট্যসৃষ্টি হইয়াছিল এবং যে "শিবোৎসব" এই নাটকের জন্মদাতা তাহা সম্ভবতঃ আমাদের এ অঞ্চলের বণিক্ ও ঔপনিবেশিকদের দ্বারাই পশ্চিম অঞ্চলে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আমি ইহাও দেখাইয়াছি যে, গ্রীকনাটকের ন্যায় আমাদের দেশের নাটক যে কেবল গণ-নাট্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা নয়, পরন্তু বহু-বৎসরব্যাপী প্রবল বিজাতীয় প্রভাব সত্ত্বেও বর্তমানকাল পর্য্যন্ত ইহা ইহার জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই। কালক্রমে কতকগুলি দোষ আমাদের নাটকে ও রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিলাতী নাটক এবং রঙ্গালয়ও যে সে সকল দোষ হইতে

মুক্ত থাকে নাই তাহা আমি দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ এই সকল দোষ মানবচিত্তের স্বাভাবিক দৌর্বল্য হইতে উৎপন্ন এবং মানুষ এ বিষয়ে সর্বত্রই সমান। সুতরাং আমাদের এ সকল দোষ দেখাইয়া পাশ্চাত্ত্য নাটক ও রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না। আর আমাদের নাটকের আদর্শও যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, তাহা আমি পাশ্চাত্ত্যদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সমালোচকদেরই মত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, নানা কারণে আমাদের রঙ্গালয়ের ও নাটকের উন্নতি আশানুরূপ হইতে পারে নাই। সেই জন্য, কি উপায়ে এই উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহা আমি গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতিকামী সুধীবর্গের দৃষ্টি এদিকে আপতিত হইলে আমি যে নিরতিশয় সুখী হইব তাহা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই বয়সে এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছি তাহার মূলে ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ.। তাঁহারই অদম্য আগ্রহ আমাকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থের লভ্য নিন্দাস্তুতির অন্ততঃ কতকটা অংশ যে তাঁহার প্রাপ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

# সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

# বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

## প্রথম অধ্যায়

### নাটকের উৎপত্তি—প্রাক্ আর্যযুগ ও আর্যযুগ

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সন্তোষজনক ভাবে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অথচ এরূপ ইতিহাস-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ অতীতকে না জানিলে বর্তমানকে ঠিক বোঝা যায় না। কোন নদীর গতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাহার মূল উৎস এবং যে সকল উপনদীর সংযোগে তাহার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। জাতীয় সংস্কৃতির ধারাও নদী-প্রবাহের ন্যায়। একটা উৎস হইতে বহির্গত হইয়া পরে নানা-দেশাগত উপধারার দ্বারা ইহা পুষ্ট হয় এবং তাহার ফলে কোন কোন স্থানে মূলধারাটির এরূপ পরিবর্তন ঘটে যে তাহাকে চিনিবার উপায় থাকে না। কিন্তু এরূপ আত্যন্তিক পরিবর্তন যখন মূলধারাটি ক্ষীণ অবস্থায় থাকে কেবল তখনই সংঘটিত হইতে পারে। নতুবা প্রবাহটি একবার পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠিলে আর একটি সমশক্তিশালী প্রবাহ আসিয়াও তাহার বিশেষ রূপান্তর ঘটাইতে পারে না। যমুনার অগাধ কালো জল গঙ্গা-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে জন্য গঙ্গার বর্ণের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতির আলোচনাকালেও আমরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কত বিজাতীয় সংস্কৃতিই না এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু আমরা সে সকল উদরসাৎ করিয়াও নিজত্ব হারাই নাই। আমরা দেখিব, আমাদের কৃষ্টির এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য আমাদের নাটকেও পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম

জাতি-সমূহের মধ্যে আমরা অন্যতম। আর্যজাতির ভারতে আগমনের বহুকাল পূর্ব হইতে বাঙ্গালী জাতি বঙ্গদেশে বাস করিতেছে। আর্যদের সহিত সংস্রবের পূর্বে তাহারা প্রধানতঃ প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিরই একটি শাখা ছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসর তাহারা তাহাদের নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি সভ্যতার কত উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল তাহার কতক পরিচয় আমরা মোহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাইয়াছি। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি ও ভাবধারার মূল উৎস খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে সেই প্রাক্-আর্য-যুগে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের কৃষ্টির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইলেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ইহার একটি প্রধান অঙ্গের—আমাদের নাটকের—প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা বলেন, ইংরেজী নাটকের অনুকরণেই আমাদের নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার স্রষ্টিকর্তা হইতেছেন কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী। এমন কি, পুরাতন যাত্রার সহিতও নাকি ইহার নাড়ীর যোগ নাই। আমি বাংলা নাটকের এই নব স্রষ্টাদের গৌরবহানি করিতে চাহি না, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলা নাটক বাস্তবিক এত অর্বাচীন নয়। একটি প্রাচীনতম উৎস হইতে ইহার উৎপত্তি এবং নানা প্রতিকূল প্রভাব সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাহার সহিত ইহার সংযোগ ছিন্ন হয় নাই। প্রথমে সেই উৎসের কথাই আমি বলিব, নতুবা আমরা বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ ও তাহার বর্তমান গতি-প্রকৃতির কথা বুঝিতে পারিব না।

আমাদের নাটকের প্রাচীনত্ব

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, জাতীয় ধর্মোৎসবই নাটকের জনক। দেবালয়ই ছিল প্রথম রঙ্গালয় এবং ভক্তেরাই ছিলেন তাহার প্রথম অভিনেতা। এই ধর্মোৎসবগুলি সর্বত্র একই কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই কারণটি হইতেছে—আমাদের জিজীবিষা—বাঁচিবার ইচ্ছা। জীবমাত্রেই চায় বাঁচিতে এবং সে-জন্য চাই যথেষ্ট পরিমাণে

জাতীয় ধর্মোৎসব নাটকের জনক

খাদ্য। কিন্তু খাদ্যও চিরকাল জীবকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না—আজ হউক, কাল হউক, একদিন তাহার জীবনের অবসান হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন শেষ হইলেও সে তাহার বংশধরগণের মধ্য দিয়া বাঁচিতে পারে। এইজন্য খাদ্য ও সন্তান জীবের প্রথম কাম্য এবং যে দেবতার দয়ায় তাহা পাওয়া যায়, তিনিই মানুষের আদি দেবতা।

ধর্মোৎসবের উৎপত্তি

প্রথমে সূর্য্য বা সূর্য্যাধিষ্ঠিত দেবতাই উল্লিখিত খাদ্য ও প্রজনন-শক্তিদাতা দেবতারূপে পূজিত হইতেন। ঋতুভেদে সূর্য্যের তেজের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যে প্রকৃতিদেবীর উৎপাদিকা শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা মানুষ প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ক্রান্তিবৃত্তের কোন বিশেষ স্থানে সূর্য্য-দেবের আগমনের ফলে যখন ধরিত্রীদেবী ফুল-ফল-শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধি-শালিনী হইয়া উঠিতেন, তখন অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষের হৃদয়ও মহানন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং দলে দলে নরনারী নবজীবনদাতা সূর্য্যদেবের মন্দিরে সমবেত হইয়া তাহাদের সেই প্রাণের আনন্দ দেবতাকে নিবেদন করিত। প্রথমে এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য। পরে তাহাই ক্রমবিকাশের ফলে রীতিমত নাট্যাভিনয়ে পরিণত হয়। আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারেরা বলেন, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিয়া এই পরিণতি সাধিত হইয়াছিল ;—প্রথম, 'নৃত্ত' অর্থাৎ তাললয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেপমাত্র ; তাহার পর, 'নৃত্য' অর্থাৎ ভাবভাবযুক্ত বিবিধ-মুদ্রা-সাহায্যে মূক অভিনয়সহ নর্তন ; পরিশেষে, 'নাট্য' অর্থাৎ নৃত্যগীতসহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সকল দেশেই নাটকের উৎপত্তি এই ক্রমানুসারেই হইয়াছিল।

আদি দেবতা—সূর্য্যদেব

নাটকের তিন পর্য্যায়—নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য

সকলেই জানেন, ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিপথের চারিটি সন্ধিস্থান আছে—কর্কটক্রান্তি, তুলাক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও মেষক্রান্তি। বর্ত্তমানকালে ২১শে জুন তারিখে সূর্য্যদেব কর্কটক্রান্তি হইতে দক্ষিণাভিমুখে তাঁহার

রথ চালাইয়া তিনমাস পরে তুলাক্রান্তিতে পৌঁছান এবং সেখান হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া তিনমাস পরে মকরক্রান্তিতে উপস্থিত হন এখান হইতে তিনি উত্তরাভিমুখী হইয়া ২১শে মার্চ তারিখে মেষক্রান্তিতে পৌঁছান এবং সেখান হইতে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া ২১শে জুন তারিখে পুনরায় কর্কটক্রান্তিতে আগমন করিয়া পুনর্যাত্রা আরম্ভ করেন। এইরূপে এক বৎসরে তিনি সমস্ত পথটি ঘুরিয়া আসেন। এই জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে 'সংবৎসর-কালচক্র' নামে অভিহিত করা হয়। পথটি গোলাকার, সুতরাং ইহার যে কোন বিন্দু হইতে বৎসর আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সুবিধার জন্য উপরিলিখিত চারিটি সন্ধি-স্থানের কোন একটি হইতে বৎসর আরম্ভ করা হয়। অবশ্য সর্বত্র একই সময়ে নববর্ষারম্ভ হয় না। কোথাও মেষ-সংক্রান্তি বা বাসন্ত বিষুবদ্ দিন হইতে, কোথাও তুলা-সংক্রান্তি বা শারদ বিষবদ্ দিন হইতে, কোথাও মকর-সংক্রান্তি হইতে, কোথাও কর্কট-সংক্রান্তি হইতে বৎসর গণনা করা হয়। আবার একই দেশে বিভিন্নকালে নববর্ষারম্ভের দিন বিভিন্ন হইতে পারে। ইহার উপর অয়ন-চলনের ফলে বিষুবদ্ দিনের স্থিরতা থাকে না। বিষুবন্ বা ক্রান্তিপাত-বিন্দু বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা করিয়া পশ্চাদ্গমন করাতে প্রতি ৭২ বৎসরে এক দিন করিয়া বিষুবদ্ দিন পিছাইয়া যায়।

সংবৎসর কালচক্র

নববর্ষারম্ভের বিভিন্ন কাল

উদাহরণ-স্বরূপ আমাদের বাংলা বৎসরের কথা বলা যাইতে পারে। এই বৎসর মেষ-সংক্রান্তি হইতে গণনা করা হইয়া থাকে। পূর্বে এক সময়ে ঐ সংক্রান্তি ১লা বৈশাখে হইত, কিন্তু অয়ন-চলন বশতঃ এখন তাহা ৭ই চৈত্রে হইয়া থাকে। সুতরাং ৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ) হইতে আমাদের বর্ষ গণনা করা উচিত, কিন্তু এরূপ ভাবে মাঝে মাঝে পঞ্জিকা সংস্কার করিতে গেলে নানা অসুবিধা ঘটে। আমরা সেইজন্য অয়ন-চলনকে উপেক্ষা করিয়া নিরয়ণ গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি এবং প্রাচীন প্রথা মত

নববর্ষোৎসব

এখনও আমরা চৈত্র-মাসান্তে চড়ক-পূজা ও ১লা বৈশাখে নববর্ষারম্ভের উৎসব করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা মকর সংক্রান্তির উৎসবও বড়দিনে না করিয়া পৌষমাসান্তে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ নববর্ষারম্ভের বা অন্যান্য উৎসবের দিন স্থানীয় ঐতিহ্য ও সুবিধা অনুসারেই নির্বাচিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেশের প্রধান শস্যের বীজ-বপনের বা অঙ্কুরোদ্গমের সময় অথবা শস্য গৃহজাত করিবার সময়ই জাতীয় উৎসবের প্রকৃষ্টকাল বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা হউক, সূর্য্যদেবের গগনপথে যাত্রা ও ক্রান্তিবৃত্তের বিভিন্নস্থানে আগমনের উপর এই সকল উৎসবের কাল ও তদুপলক্ষে নাট্যাভিনয় নির্ভর করিত বলিয়া ক্রমশঃ যাত্রা, উৎসব ও নাট্যাভিনয় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সূর্য্যদেবের শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ

প্রথমে স্বয়ং সূর্য্যদেবই কালের নিয়ন্তা মহাকাল-রূপে এই সকল উৎসবে পূজিত হইতেন, কিন্তু পরে তাঁহার গুণাবলীর প্রতীকস্বরূপ শিবমূর্ত্তি কল্পিত হয়। সকলেই জানেন, শিবের দুই মূর্ত্তি—(১) পূর্ণবিগ্রহমূর্তি; (২) প্রজাবর্দ্ধক দেবতার প্রতীকস্বরূপ লিঙ্গমূর্তি। এই উভয় মূর্ত্তিতেই তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই পূজার সার্বজনীনতা ও প্রাচীনতার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সকল প্রাচীন দেশেই এই দুই

শিবপূজার সার্বভৌমিকত্ব

মূর্তি নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত বিগ্রহগুলি সর্বত্র একরূপ না হইলেও সেগুলি যে একই দেবতার মূর্তি তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনকালে এই পূজার এইরূপ সব্বত্র বিস্তৃতি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালে ইহা একস্থান হইতে বিভিন্ন-দেশে প্রচলিত হইয়াছিল এবং মোহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নস্তূপে প্রাচীনতম মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনুমিত হয় যে, ভারতের প্রাগৈতিহাসিক

প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা

দ্রাবিড়জাতি—অসুরেরা—এই পূজার প্রবর্তক ছিল। বণিগ্‌বৃত্তির জন্য এই জাতির বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাচীন দ্রাবিড় বণিকরাই বেদে

'পণি' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন ; এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন ফিনিসিয়া দেশ এই পণিদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পণি ও ফিনিসিয়ান্

ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ফিনিসিয়ান্ বণিকদের নিকট কত ঋণী তাহা সকলেই জানেন। তাঁহারা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন এবং এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ কৃষ্টি ও সভ্যতা ঐ সকল দেশে বিস্তার করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী বলে, পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার জননী এথেন্স নগরী প্রথমে তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকরা এই ফিনিসিয়ান্‌দের নাম দিয়াছিল, 'লাল মানুষ'। তাহারা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিত বলিয়াই নাকি তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রক্তবর্ণের সহিত শিবেরও সম্বন্ধ আছে। দ্রাবিড় (তামিল) ভাষায় 'শিবপ্পু'-শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ। এই শব্দ ও শিব-শব্দ মূলতঃ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। সূর্য্যদেবই যে কালক্রমে শিব ঠাকুরে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা উপরে বলিয়াছি। সুতরাং প্রথমে শিবের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত শিবকুমার গণপতি রক্তবর্ণরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। খুব সম্ভব ফিনিসিয়ান্‌রা শিবপূজক ছিল বলিয়া রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ বা পতাকা ব্যবহার করিত। সুতরাং দ্রাবিড় জাতি কর্তৃক প্রাচীন জগতে শিবপূজা-পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, প্রাচীন মিশরের ওসিরিস, গ্রীসের দিওনুসিওস (দেব শিব), এসিয়া মাইনরের হিট্টাইট দেবতা তেশুব, জাপানের শিউঅ (শিব) প্রভৃতি দেবতা যে আমাদের শিবের অনুরূপ দেবতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালের শিবের রক্তবর্ণ শিবকুমার গণপতিতে রক্ষিত

মাতৃদেবী ও কুমার

মোহেঞ্জোদাড়োতে শিব একা পূজা পাইতেন না, পরন্তু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মাতৃদেবী অম্বা বা উমা এবং কুমার। এই মাতৃদেবী ও কুমারের সহিত মিশরের আইসিস ও হোরাস, গ্রীসের হেরা ও কুমার জিউস, ফিনিসিয়ার

আস্টার্ট ও তাম্মুজ ( বা আডোনিস ), এসিয়া মাইনরের বেলে ও অ্যাতিস, কার্থেজের সপুত্র টানিথ দেবী প্রভৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেবতা-সম্বন্ধে কল্পিত কাহিনীগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই মাতৃদেবী মূলতঃ শিবেরই শক্তি ছিলেন, যদিও পরে তিনি কোন কোন স্থানে ধরিত্রী বা প্রকৃতি-দেবীতে রূপান্তরিত হন। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা কুমারের সহিতই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অধিক সম্পর্ক, কারণ কুমারের জন্ম বা বিজয় উপলক্ষে যে উৎসব হইত তাহা হইতেই নাটকের উৎপত্তি হয়। সুতরাং কুমারের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য কুমারসম্ভবে যে কুমারের জন্মকথা বলিয়াছেন তাহার পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি ভিন্ন একটি জ্যোতিষিক ভিত্তি আছে। তুলা-সংক্রান্তির পর সূর্য্যদেব যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, ভূমণ্ডলের উত্তরার্দ্ধে ততই তিনি তেজোহীন হন এবং তাহার ফলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জগতে নির্জীবতাব লক্ষণ দেখা দেয়। তখন আমাদের মত উত্তর-গোলকার্দ্ধবাসীদের মনে হয় যেন সূর্য্যদেব জরাপ্রাপ্ত ও শক্তিহারা হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তিনি মকরক্রান্তিতে পৌঁছাইলে তাঁহার দক্ষিণায়ন শেষ হয় এবং তিনি পুনরায় উত্তরাভিমুখী হন। ইহার পর যতই তিনি উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন উত্তর-গোলকার্দ্ধবাসীরা ততই তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান তেজ অনুভব করিতে থাকে তাহাদের বোধ হয় যেন সূর্য্যদেব তাঁহার হারান শক্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং তাহার সংযোগে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছেন। এই ব্যাপারই পৌরাণিক কবি-কর্তৃক শিবশক্তির পুনর্মিলন ও কুমারের জন্মকাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং এই শুভ যোগ মকরক্রান্তিতে সংঘটিত হয় বলিয়া মকরকেতন মদন এই বিবাহের ঘটকরূপে কল্পিত হইয়াছেন। কিন্তু কবি ঘটকবিদায়ের যে সাংঘাতিক ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই হউক তাহা ঘটকের পক্ষে যে

কুমারসম্ভবের জ্যোতিষিক ভিত্তি

নিরুৎসাহজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি আবহমানকাল এই কার্য করিয়া আসিতেছেন এবং বোধ হয় চিরদিনই করিবেন, কারণ 'স্বভাব যায় না ম'লে।'

এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, শিবকুমার শিব হইতে ভিন্ন নন। পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইরূপে তিনি চিরজীবী হন। এই জন্যই মহাভারত বলেন, ভার্য্যার আর এক নাম জায়া, কারণ স্বয়ং আত্মা তাঁহাতে অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মকর-সংক্রান্তিতে শিব জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহাবিষুব বা মেষসংক্রান্তিতে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুঞ্জয় মূর্তিতে আবির্ভূত হন। সুতরাং এই দুই দিবস উত্তর-গোলকার্দ্ধবাসীদের মহোৎসবের দিন। বৈদিক যুগে প্রথমোক্ত দিনে নববর্ষারম্ভ করা হইত ও শেষোক্ত দিনে যজ্ঞারম্ভ করা হইত। বাংলা দেশে আমরা মকর-সংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ ও মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে চড়ক-পূজা করিয়া থাকি।

কুমারের জন্ম ও বিজয়—শিবোৎসবের ভিত্তি

খ্রীস্টানেরা মকর-সংক্রান্তিতে খ্রীষ্টমাস উৎসব ও মেষ-সংক্রান্তিতে ঈস্টার উৎসব করেন। কিন্তু তাঁহারা শিব-কুমারের স্থানে ঈশ্বর কুমার যীশুকে বসাইয়াছেন এবং তাহার ফলে কুমারের জন্মোৎসব যীশুর জন্মোৎসবে ও মৃত্যুঞ্জয় কুমারের বিজয়োৎসব কবর হইতে যীশুর পুনরুত্থান-উৎসবে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাস্তবিক যীশুর জন্ম বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান কবে হইয়াছিল তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সেই জন্য খ্রীস্টানেরা চিরাগত প্রাচীন উৎসবদ্বয়কেই নিজ ধর্মোৎসবে পরিণত করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ঈস্টার পর্ব যে প্রাচীন বসন্ত-উৎসব তাহা ঈস্টার নামেই বুঝা যায়, কারণ ঈস্টার ছিলেন প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় যুগের ঊষাদেবী বা বাসন্তী-দেবী। তবে খ্রীস্টানেরা এই উৎসব ঠিক মেষ-সংক্রান্তির দিনে না করিয়া তাহার পরবর্তী পূর্ণিমা তিথির পর প্রথম রবিবারে করিয়া

খ্রীষ্টমাস ও ঈস্টার—প্রাচীন শিবোৎসবেরই রূপান্তর

থাকেন। সংক্রান্তির সহিত প্রকৃষ্ট বার ও তিথি সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই প্রাচীন উৎসবদ্বয়ের মধ্যেই নাটকের জন্ম হইয়াছিল। গ্রীক নাটকের জন্ম হইয়াছিল বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দিওনুসিওসের উৎসবে আর খ্রীষ্টান নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল খ্রীষ্টমাস ও ঈস্টার পর্বে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে। আর আমাদের দেশে যে শিবোৎসব উপলক্ষেই নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি উপাধি হইতেই বেশ বুঝা যায়।

শিবোৎসব হইতে নাটকের জন্ম

মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিতে আমরা মহেশ্বরের দুই একটি বিশেষণ ভিন্ন আর তাঁহার গুণাগুণের পরিচয় পাই নাই বটে, কিন্তু সেখানে যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে আমরা সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের কল্পনাশক্তি ও দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। এরূপ কল্পনাকুশল ও শিল্পনিপুণ জাতির যে একটা সাহিত্য ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ তাহাদের নৃত্যশীল মূর্তিগুলি দেখিলে তাহারা যে সঙ্গীত-নৃত্যকলানুরাগী ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শিবমূর্তিগুলিতে তাহাদের যে ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে পরবর্তী কালের শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, আর্য ঋষিগণও তাহাদের কল্পনা নিজস্ব করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সকল কল্পনা হইতেই আমাদের অনেক প্রাচীন কাহিনী, গাথা ও গীতিকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ সেই সকল কাহিনী অবলম্বন করিয়াই আমাদের প্রাচীন নাট্যকারেরা তাঁহাদের নাটক রচনা করিতেন। সুতরাং উল্লিখিত মূর্তিগুলির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মোহেঞ্জোদাড়ো হইতে প্রাপ্ত শিবমূর্তি প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার নিদর্শন

মোহেঞ্জোদাড়োতে যে সকল শিবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি ত্রিশীর্ষক বা ত্রিমুখ, দীর্ঘকেশসম্পন্ন, ভুজঙ্গভূষিত ও যোগাসনে উপবিষ্ট এবং তাহাদের মস্তক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট। দেবতার তিনটি মুখ সম্ভবতঃ তাঁহার সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তৃত্বের প্রতীকস্বরূপ কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সৃষ্টি ও স্থিতির দেবতা—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—পৃথক্ হইয়া পড়েন। শিবের দীর্ঘ কেশ ও শৃঙ্গদ্বয় তাঁহার অসীম শক্তির পরিচায়ক ছিল, পরে তাঁহার সশৃঙ্গ মুকুটটি ত্রিশূলে পরিণত হয়। তাঁহার ভুজঙ্গভূষণের অর্থ এই যে, তিনি কালের নিয়ন্তা মহাকাল। প্রাচীনতম কাল হইতে সর্প কালের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য সর্পরাজের একটি নাম অনন্ত এবং তিনি সর্বধ্বংসী বলিয়া তাঁহার আর এক নাম শেষ। কুণ্ডলাকারে অবস্থিত সর্পের সহিত ক্রান্তিবৃত্ত বা সংবৎসর-কালচক্রের সাদৃশ্যই বোধ হয় এই কল্পনার ভিত্তি। কিন্তু কাল সর্পের ন্যায় কেবল ধ্বংসই করে না, সেই সঙ্গে সে অবিরত নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কালচক্রের আবর্তনের ফলে এক দিকে যেমন সর্বধ্বংসী হলাহল উদ্গীর্ণ হয়, অন্যদিকে তেমনই সঞ্জীবনী অমৃতধারা নিঃসৃত হইতে থাকে। কালের নিয়ন্তা মৃত্যুঞ্জয় শিব সেই জীবান্তক কালকূট পান করিয়া জগৎকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন এবং সর্বত্র অমৃতবর্ষণ করিয়া নূতন প্রাণের বীজ বপন করেন। ফলে ধরিত্রীদেবী ফলফুলপ্রসূ হইয়া সমস্ত জীবলোকের হৃদয় আনন্দে মাতাইয়া তোলেন। সুতরাং নটরাজ মহাকাল বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত উভয় প্রকার নাটকেরই স্রষ্টা।

প্রাচীন শিবমূর্তির ব্যাখ্যা

শিবের মহাকাল-মূর্তি

মোহেঞ্জোদাড়োর কোন কোন শিবমূর্তিকে হস্তী ব্যাঘ্র-মহিষ-মৃগাদি-পশুদ্বারা বেষ্টিত দেখা যায়, আবার কোন কোন মূর্তিকে এক বৃক্ষতলে অবস্থিত দেখা যায়। প্রথম প্রকারের মূর্তিটি শিবের পশুপতি-মূর্তি। ইহাতে বোঝা যায় যে, শিব কেবল কৃষকদের দেবতা ছিলেন না, পরন্তু ব্যাধদেরও দেবতা ছিলেন—তাঁহার কৃপায় যেমন শস্য বৃদ্ধি পাইত, তেমনই পশুবৃদ্ধিও হইত। এইজন্য আমরা আমাদের প্রাচীন

সাহিত্যে তাঁহাকে কিরাত ও কৃষক উভয়রূপেই দেখিতে পাই। শিবরাত্রি উপাখ্যানের নায়ক একজন ক্ষুধার্ত ব্যাধ শিব তাহার অশ্রুপাতে ব্যথিত হইয়া তাহার চিরদারিদ্র্য ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকার মূর্তির পার্শ্বে যে বৃক্ষ দেখা যায় তাহা অশ্বত্থবৃক্ষ। জগতের প্রাচীনতম উপাখ্যানসমূহে যে অমৃতফলদাতা জীবনবৃক্ষের (Tree of Life) উল্লেখ দেখা যায় এ সেই বৃক্ষ। অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রের আকার হৃৎপিণ্ডের

জীবনবৃক্ষ ও বোধিদ্রুম

ন্যায়, সম্ভবতঃ সেইজন্যই ইহাকে জীবনবৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছিল। অশ্বত্থবৃক্ষের আর এক নাম বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষ (Tree of Knowledge), কারণ তত্ত্বজ্ঞানই মানুষকে অমরত্ব প্রদান করে। সুতরাং অশ্বত্থ-বৃক্ষতলই মৃত্যুঞ্জয় যোগিরাজের প্রকৃষ্ট আসন। সকলেই জানেন, এক অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে বসিয়াই শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন শিবের শৃঙ্গদ্বয় ত্রিশূলে পরিণত হইয়াছিল, তখন ত্রিশূলাকৃতি পত্রধারী বিল্ববৃক্ষই লয়কর্তা শিবের প্রিয়বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অশ্বত্থবৃক্ষ স্থিতিকর্তা বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

মোহেঞ্জোদাড়োর যে নৃত্যশীল মূর্তিগুলির কথা বলিয়াছি, দুঃখের বিষয় সেগুলি ভগ্ন ও মুণ্ডবিহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং সেগুলির মুখ কিরূপ ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে সেগুলি যে নৃত্যরত যুবকের দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। সার জন মার্শাল অনুমান

মোহেঞ্জোদাড়ো হইতে প্রাপ্ত নৃত্যশীল মূর্তি

করেন, সেগুলি নৃত্যশীল নটরাজের মূর্তি। এ অনুমান হয় ত ঠিক, কিন্তু মূর্তিগুলি উৎসবরত ভক্তদের মূর্তিও হইতে পারে, কারণ আবহমানকাল হইতে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি শিবপূজার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। 'জ্ঞান-সংহিতা' নামক গ্রন্থে শিবপূজার যে বিধি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত

বর্তমানকালেও নৃত্যগীত শিবপূজার অপরিহার্য অঙ্গ

রাত্রি ধরিয়া ভক্তিভাবসমন্বিত নৃত্য ও গীতবাদ্য করাই শিবপূজার

প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। যাহা হউক, সেকালেও যে শিবোৎসব উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীত হইত এই মূর্তিগুলিকে তাহার একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই উৎসবের বিবরণ আমরা পাই নাই, কিন্তু ভারতের দক্ষিণপ্রান্তদেশে প্রাচীন দ্রাবিড়জাতির বংশধরদের মধ্যে এখনও যে সকল অতি-প্রাচীন রীতি ও উৎসব প্রচলিত আছে তাহা হইতে মোহেঞ্জোদাড়োতে শিবোৎসব কিরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইত তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর প্রদেশে বৈশাখ মাসে সশাক্ত ভৈরব ও কুমার গণপতির পূজা উপলক্ষে যে অভিনয়াদি হয় তাহা সম্ভবতঃ মোহেঞ্জোদাড়োর শিবোৎসবেরই প্রতিচ্ছায়া।

প্রাচীন শিবোৎসবের ধারা

পূর্ব বলিয়াছি, প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারদের মতে নৃত্তের পর নৃত্য ও তাহার পর নাট্যের উৎপত্তি হয়। মালাবার অঞ্চলে কেরল প্রদেশের 'কূট নৃত্য' দেখিলে বোধ হয় মোহেঞ্জোদাড়োতেও এই প্রথানুসারেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। কূট নৃত্যের মধ্যে 'চাকিয়ার কূট', 'নামিয়ার কূট' ও 'কূটিয়াত্তম' খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'চাকিয়ার কূট' নৃত্য পুরুষেরা করে; ইহাতে হাবভাব বা মুদ্রাদি প্রদর্শন বড় একটা থাকে না, কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে গান ও পৌরাণিক আখ্যান আবৃত্তি করা হয়। 'নামিয়ার কূট' নৃত্য ইহারই অনুরূপ; কিন্তু ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করে। 'কূটিয়াত্তম' নৃত্যে বক্তৃতা, সঙ্গীত, মুদ্রা ও হাবভাবাদি প্রদর্শন প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের প্রায় সকল ব্যাপারই থাকে। এ নৃত্যে অধিকাংশ স্থলে কেবল পুরুষেরা অংশ গ্রহণ করিলেও কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকদিগকেও অভিনয় করিতে দেখা যায়। কেরলের 'কথাকলি' নৃত্যও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ রামায়ণ বা মহাভারতের কোন কাহিনী এই নৃত্যের সাহায্যে অভিনীত হয়। অভিনয়ের সময়ে অভিনেতাদের পশ্চাতে গায়ক ও বাদকেরা

দক্ষিণভারতে প্রচলিত কতিপয় নৃত্য প্রাচীন দ্রাবিড়জাতির নৃত্যাভিনয়ের প্রতিরূপ

উপবিষ্ট থাকে এবং গায়কেরা গান গাহিয়া আখ্যানটি শ্রোতৃবর্গকে অবগত করায়। নর্তকেরা কোন কথা না কহিয়া কেবল মুখ চোখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গিমা এবং হস্তমুদ্রা ও নৃত্যের সাহায্যে গীতের ভাব পরিস্ফুট করিয়া তোলে। মোহেঞ্জোদাড়োর নৃত্যশীল মূর্তিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সেখানেও এইরূপ কলাসম্মত হাবভাব ও রসপূর্ণ নৃত্যের প্রথা প্রচলিত ছিল।

নাট্যবিষয়ে আর্যেরা প্রাচীন অনার্যদের নিকট ঋণী

মোহেঞ্জোদাড়োয় শিবোৎসবে যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাঁহারা যে নাট্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি বড় প্রমাণ এই যে, পরবর্তী কালে ভারতীয় আর্যেরা তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, সংস্কৃত নাটকের ভিত্তিস্থাপন প্রাচীন দ্রাবিড়দের দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা আর্যেরা সাক্ষাৎভাবে স্বীকার না করিলেও পরোক্ষভাবে করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চতুর্বেদ-রচনার পর ব্রহ্মা মহাদেবের অর্থাৎ শিবের নিকট নাট্যশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ববেদ বা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ রচনা করেন এবং ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া তাঁহার বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু সকলেই জানেন, বৈদিক-যুগের প্রথম ভাগে আর্যদের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে অনার্য অসুরদের দেবতা শিবের কোন স্থান ছিল না—তিনি আর্যদের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইতেন না বা যজ্ঞে নিবেদিত ভৃষ্টযব বা সোমরসের কোন অংশ পাইতেন না। অথচ নাট্যশাস্ত্র শিখিবার জন্য ব্রহ্মাকে তাঁহার নিকট ছুটিতে হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নাট্যকলা-বিষয়ে অনার্য দ্রাবিড়েরাই আর্যদের শিক্ষক ছিলেন এবং নাট্যকলার উৎপত্তি হইয়াছিল প্রাচীন দ্রাবিড়দের শিবোৎসবে।

নাট্যশাস্ত্রের জন্মদাতা। মহাদেব বা শিব অনার্যদের দেবতা

বৈদিক যজ্ঞে অবশ্য নাটকীয় ক্রিয়ার অভাব ছিল না। বলিতে কি, যজ্ঞের সকল ব্যাপারই নাটকীয়ভাবে সম্পাদিত হইত। অধ্বর্যুরা সুস্বরে স্তব আবৃত্তি করিতেন এবং সময়ে সময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ

করিয়া তাহা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতেন, উদ্গাতারা সামগান করিতেন এবং হোতারা বংশদণ্ড-হস্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বেদির চতুর্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতেন এবং হোমাগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া ভক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা দেবতাসমীপে আত্মনিবেদন করিতেন। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে যে নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক উপাখ্যানগুলির মধ্যেও নাটকের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু যতদিন বৈদিক যজ্ঞ প্রবহমান ছিল, ততদিন নাটক অঙ্কুর-অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আর্যেরা যখন এ দেশের সেই আদিদেবতাকে সাদরে তাঁহাদের রুদ্রদেবতার আসনে বসাইলেন—এমন কি তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া স্বীকার করিলেন—তখন শিবোৎসব বা কুমারের বিজয়োৎসব-সংক্রান্ত অভিনয়াদিও তাঁহাদের দেবপূজার অঙ্গ হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদের যে নাট্যপ্রতিভা এত দিন ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল তাহাতে সহসা প্রবল বন্যা আসিয়া সমস্ত দেশ রসের ধারায় প্লাবিত করিল।

বৈদিক যজ্ঞে নাটকীয় ক্রিয়া

আর্যগণ-কর্তৃক শিবের দেবত্ব-স্বীকারের পর প্রকৃত আর্য-নাটকের উদ্ভব

কেবল নাট্যাভিনয় নয় নাট্যমঞ্চ-নির্মাণ-বিষয়েও যে আর্যগণ প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির নিকট যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী ছিলেন তাহার প্রমাণ ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে শিবোৎসবের প্রারম্ভে পূর্বোল্লিখিত জীবনবৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ একটি কাষ্ঠদণ্ড প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই দণ্ড সুবিধামত যে কোন কাষ্ঠের হইতে পারিত, কারণ পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষ কর্তন করা ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহার চারাও সর্বত্র সুলভ ছিল না। এইরূপ একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দণ্ড রোপণ করা ভিন্ন, ভক্তেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া নৃত্য করিত। বৈদিকযুগে হোতারা বংশদণ্ড ব্যবহার করিতেন, আর এখনকার গাজনে সন্ন্যাসীরা বেত্রহস্তে নৃত্য

জীবনবৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ দণ্ড-রোপণ-প্রথা

করে। আমাদের চড়ক-গাছ-প্রতিষ্ঠা ও ১লা বৈশাখে ধ্বজারোপণ এবং ইংল্যাণ্ডে ১লা মে তারিখে May-pole-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সেই প্রাচীন দণ্ডরোপণ-প্রথার স্মৃতি এখনও রক্ষা করিতেছে। শিবোৎসবেই নাট্যাভিনয়ের জন্ম, সুতরাং নাট্যাভিনয় যেখানেই হউক সেখানে উক্ত প্রথানুসারে একটি কাষ্ঠদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হইত এবং অভিনয়ের প্রাক্কালে তাহার পূজা করিয়া নটনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হইত।

ভরতের সময়ে এই উদ্দেশ্যে একটি ১০৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ, পঞ্চগ্রন্থিযুক্ত বংশদণ্ড ব্যবহৃত হইত এবং তাহার নাম ছিল জর্জরদণ্ড বা ইন্দ্রধ্বজ। দণ্ডটির পঞ্চগ্রন্থি যথাক্রমে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, কুমার স্কন্দ ও ত্রিনাগের নামে উৎসর্গীকৃত হইত। ত্রিনাগ ছিলেন—শেষ, বাসুকী ও তক্ষক। শিব তখন ত্রিধাবিভক্ত হইয়া

জর্জরদণ্ড

ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং কুমারের বিজয়োৎসব উপলক্ষেই অভিনয় হইত। সুতরাং অভিনয়ের পূর্বে এই চারিজনকে বরণ করা কর্তব্য ছিল। ত্রিনাগের মধ্যে শেষ অনন্তকালের প্রতীক এবং সমুদ্রমন্থনের রজ্জু বাসুকী ঘূর্ণায়মান সংবৎসর কালচক্রের প্রতীক, সুতরাং মহাকালের পূজার্থ প্রতিষ্ঠিত জর্জরদণ্ডের একটি গ্রন্থি তাহাদের নামে উৎসর্গ করিবার কারণ দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু তক্ষকনাগ কে? এবং নাট্যাভিনয়ের সহিত বা তাহার কি সম্পর্ক? মহাভারতকার বলেন,

প্রাচীন দ্রাবিড়দের শিল্প-দক্ষতা

এক তক্ষকনাগ খাণ্ডববনে বাস করিত। সম্ভবত আর্যদের দ্বারা পরাজিত বহু দ্রাবিড়জাতীয় ব্যক্তি এই বনে আশ্রয় লইয়াছিল। পাণ্ডবেরা এই বনটি পুড়াইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করেন এবং সেই সময়ে তাঁহারা ময়দানব-নামক বিখ্যাত অনার্য শিল্পীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা তাঁহাদের রাজসূয়সভা-গৃহটি নির্মাণ করাইয়া লন। অনার্য শিল্পীরা যে সে সময়ে আর্য শিল্পীদের অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। কথিত আছে, 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ-বিষয়ক অতি প্রাচীন শিল্পগ্রন্থ এই অনার্য শিল্পীর দ্বারাই রচিত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ ময়দানব দ্রাবিড় জাতীয় ছিলেন, কারণ তখন আর্যেরা দ্রাবিড়গণকে অসুর, দানব, নাগ প্রভৃতি উপাধি দিয়াছিলেন অথবা তাহারা নিজেরাই এই সকল উপাধি ব্যবহার করিত। তাহারা যে স্থপতির কর্মে বিশেষ পারদর্শী ছিল তাহা মোহেঞ্জোদাড়োর ভগ্ন-স্তূপ দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের বংশধরগণের মধ্যেও যে অনেকে তাহাদের শিল্প-কৌশলের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল তাহার নিদর্শন দক্ষিণভারতে আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়। মাদুরার বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির ইহার দৃষ্টান্ত। এই মন্দিরে কয়েকটি স্তম্ভ আছে তাহার প্রত্যেকটি এক একখণ্ড গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত এবং অতীব সুন্দর কারুকার্যে অলঙ্কৃত। এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া এই সকল স্তম্ভে আঘাত করিলে স্তম্ভের বিভিন্ন অংশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সুর নির্গত হয়। কি উপায়ে শিল্পীরা এইরূপ সুরলয়বিশিষ্ট অদ্ভুত প্রস্তর-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিল তাহা আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ নাগজাতীয় অনার্যেরা আধুনিক চীনা মিস্ত্রিদের ন্যায় তক্ষণশিল্পে বিশেষ নিপুণ ছিল এবং সেই জন্য আর্যেরা মঞ্চনির্মাণ-কার্যে তাহাদের সাহায্য লইতেন। সম্ভবতঃ এই জাতি সর্পকে totem বা জাতিবোধক প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ করাতে ইহারা নাগ নামে পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং বোধ হয় 'তক্ষক নাগ' কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়, ইহার অর্থ নাগজাতীয় তক্ষক বা সূত্রধার। এই তক্ষকেরা কেবল মঞ্চ নির্মাণ করিত না, পরন্তু মঞ্চাধ্যক্ষেরও কার্য করিত। এইরূপে তক্ষক ও সূত্রধারের অর্থ পরে ক্রমশঃ নাট্যাধ্যক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপেও সূত্রধারেরা মঞ্চাধ্যক্ষ ছিল। সকলেই জানেন, অনেক সময়ে নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট পরিবর্তনের সুবিধার জন্য দুই দৃশ্যের মধ্যে অতিরিক্ত দৃশ্য যোজনা করিতে হয় এবং এরূপ দৃশ্যের নাম দেওয়া হয় carpenter scene বা সূত্রধারের দৃশ্য।

অনার্য সূত্রধার তক্ষকনাগ মঞ্চনির্মাতা ও মঞ্চাধ্যক্ষ

অবশ্য 'সূত্রধার'-শব্দের আরও কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক 'সূত্র'-শব্দের বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ ভিন্ন সেই

সকল ব্যাখ্যার অন্য কোন ভিত্তি নাই। প্রথম ব্যাখ্যাকার হইতেছেন কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত। তাঁহারা বলেন, সূত্রধার শব্দের আদিম অর্থ পুতুলনাচওয়ালা। তাঁহাদের মতে, আমাদের দেশে পুতুলনাচ হইতেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি হয় এবং পুতুলনাচওয়ালারাই অবশেষে নাট্যাধ্যক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা 'সূত্র' অর্থাৎ সূতা ধরিয়া পুতুল নাচাইত বলিয়াই তাহাদের নাম সূত্রধার হয়। বলা বাহুল্য, এ অনুমানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পৃথিবীর আর কোথাও এই ভাবে নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তির কথা শোনা যায় না। প্রত্যুত পুতুলনাচ দেখিয়া মানুষ নাচিতে শেখে নাই, মানুষের নাচ অনুকরণ করিয়াই পুতুলনাচের সৃষ্টি হইয়াছিল। সূত্রধার শব্দের আর দুইটি ব্যাখ্যা এই :—(১) যিনি নাটকের 'সূত্র'পাত বা অবতারণা করেন; (২) যিনি নাট্যশাস্ত্রের 'সূত্র'গুলি অবগত আছেন। এই দুই ব্যাখ্যাই নিছক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহাদের সমর্থক বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। তদ্ভিন্ন তক্ষক, সূত্রধার ও নাট্যাধ্যক্ষ কেমন করিয়া একার্থক হইল তাহা এই সকল ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝা যায় না।

'সূত্রধার' শব্দের চলিত ব্যাখ্যাসমূহ যুক্তিসহ নহে

জর্জরদণ্ডে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে কুমার গণপতির স্থান কুমার স্কন্দ বা কার্তিকেয় অধিকার করিয়াছেন। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে কুমারের বিজয়োৎসব করাই ছিল প্রাচীন প্রথা এবং সে কুমার ছিলেন কুমার গণপতি। কিন্তু ভরত মুনি জর্জরদণ্ডের চতুর্থ গ্রন্থি তাহার পরিবর্তে কুমার কার্তিকেয়ের নামে উৎসৃষ্ট করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি 'জর্জর' ও 'ইন্দ্রধ্বজ' নামের যে ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা এই পরিবর্তনের কারণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। তিনি বলেন, অভিনয় কালে অসুরেরা ব্যাঘাত উৎপাদন করিত বলিয়া ইন্দ্রদেব ভক্তদের অনুরোধে অসুরগণকে তাঁহার ধ্বজদণ্ড প্রহারে 'জর্জরিত' করেন এবং সেই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থ তিনি অভিনয়ের প্রাক্কালে তাঁহার ধ্বজদণ্ড প্রতিষ্ঠা ও পূজার

'জর্জর' কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি

ব্যবস্থা করেন। তদবধি দণ্ডটির নাম হয় জর্জর। এই কৌতুকাবহ কাহিনীটি কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। এখন চৈত্রমাসে মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়, কিন্তু বৈদিক যুগে এক সময়ে এই সংক্রান্তি হইত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রারম্ভে। জ্যৈষ্ঠমাস বৃষরাশির মাস এবং সেই সময় শিবোৎসবের কাল নির্ধারিত হওয়াতে শিবঠাকুর পরে বৃষবাহন রূপে কল্পিত হন। তাহার পর ক্রমশঃ মহাবিষুব সংক্রান্তি চৈত্রমাসে সরিয়া আসিলেও তাঁহার সেই উপাধি কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। এই কারণেই আমরা গ্রীসের দিওনুসিওস, মিশরের ওসিরিস প্রভৃতি শিবানুরূপ দেবতাকে বৃষবাহন রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। আর্যেরা যখন শিবকে যজ্ঞেশ্বর বা সংবৎসরের দেবতা রূপে গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহারা দ্রাবিড় প্রথানুসারে শিবোৎসব বা কুমারের বিজয়োৎসব মহাবিষুব সংক্রান্তিতেই করিতেন কিন্তু সে সময়কার ঝড়বৃষ্টি (যাহাকে আমরা 'কালবৈশাখী' বলি) তাঁহাদের অভিনয়কার্যে বড়ই ব্যাঘাত জন্মাইত। বোধ হয় সেইজন্য তাঁহারা উৎসবটি শরৎকালে করাই সমীচীন মনে করিলেন। শারদীয় বা জলবিষুব সংক্রান্তি তখন কার্তিক মাসের শেষে হইত। সুতরাং সেই দিনে উৎসব এবং পরবর্তী মার্গশীর্ষ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ করা স্থির হইল। এইরূপে মার্গশীর্ষ মাস 'অগ্রহায়ণ' অর্থাৎ 'বৎসরের প্রথম মাস' নামে পরিচিত হইল। বৈদিক ঋষিরাও বোধ হয় তদবধি শতবর্ষ বা বর্ষাকাল জীবিত থাকিবার প্রার্থনা করিবার পরিবর্তে কামনা করিতে লাগিলেন—"পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং" (শুক্ল যজুর্বেদ)। পুত্রার্থিনীরাও কার্তিক পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে কুমারের রূপও পরিবর্তিত হইয়া গেল—কুমার গণপতি কুমার কার্তিকেয়ের আকার ধারণ করিলেন। কুমার গণপতি গজানন, কারণ তিনি গজ অর্থাৎ মেঘ মুখে করিয়া আসিতেন। সকলেই জানেন, এদেশে গজ মেঘের প্রতীকরূপে চিরকাল কল্পিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রের বাহন

কুমার গণপতির স্থানে কুমার কার্তিকেয়—বসন্তোৎসবের পরিবর্তে শারদোৎসব

মেঘও বটে, ঐরাবতও বটে। 'ঐরাবত' শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে ইরা অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন। মেঘও জল হইতে উৎপন্ন, সুতরাং উভয় শব্দ একার্থবাচক। কিন্তু কুমার কার্তিকেয় মেঘনির্মুক্ত দীপ্তিমান মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় রূপবান। তিনি বিজয়ী বীর—সহস্র সহস্র তারকা শোভিত নির্মল শারদ আকাশের ন্যায় বিস্তৃত শিখিপুচ্ছ তাঁহার পতাকা। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম শিখিধ্বজ।

অকাল বোধন

বসন্তোৎসবের দেবতাকে এইরূপ শরৎকালে আবাহন করাকেই আমরা নাম দিয়াছি 'অকালবোধন'। এইরূপ অকাল বোধন করিয়াই আমরা বাসন্তী দেবীকে শরৎকালে পূজা করিয়া থাকি, কারণ এই সময় উপরে নির্মল আকাশ ও নিম্নে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহ বঙ্গবাসীর হৃদয় স্বতঃই আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। ফলে যাত্রাগানাদিরও এই সময়ে ধুম লাগিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাসন্তীদেবীকে বা গণপতিকে পরিত্যাগ করি নাই। বিশেষতঃ গণপতিদেব অতি প্রাচীন কাল হইতে দেশের সর্বত্র এমন দৃঢ় এবং ব্যাপকভাবে উপাসকদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন যে, তাঁহাকে স্থানচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব।

কুমার গণপতি লক্ষ্মী আদি দেবতারূপে পূজিত

আজও পর্য্যন্ত তিনি আদিদেবতারূপে সকল দেবতার পূর্বে পূজা পাইয়া থাকেন। উড়িষ্যা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র এখনও গণপতি উৎসব বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেবল ভারতে নয়, এককালে যে সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগে গণেশের পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জাপান, চীন, ইন্দোচীন, চৈনিক তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশে ও যব প্রভৃতি দ্বীপে নানা স্থানে গণেশের মূর্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

গণেশ ও সরস্বতী

গণপতি উৎসব হইতেই যে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাও এখনও আমরা ভুলি নাই। এই জন্য ভাদ্র মাসে ও মাঘ মাসে তাঁহার পূজা করিয়া বীণাপাণি সরস্বতীদেবীর পূজা করা হয়। আর লিপিকাররূপে

গণেশঠাকুরের খ্যাতির কথা সকলেই জানেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত মহাভারত নাকি লেখাই হইত না। আমাদের দেশের মঙ্গল-কাব্যাদি অন্য দেবতার গুণকীর্তন করিবার জন্য রচিত হইলেও অগ্রে গণেশ ও সরস্বতীর বন্দনা না করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হয় না। গণেশই সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশক দেবতা, সুতরাং সকল কার্য্যের প্রারম্ভে তাঁহাকে স্মরণ করিতে হয়। এইজন্য আর্যেরা শারদীয় উৎসব প্রবর্তন করিলেও বসন্ত-উৎসব ত্যাগ করেন নাই। 'শকুন্তলা,' 'রত্নাবলী,' 'মহাবীর চরিত,' 'উত্তররামচরিত,' 'মালতীমাধব' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক বসন্ত-উৎসব উপলক্ষ্যেই প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গণপতি ও কার্তিকেয় একই দেবতা, কেবল গণপতির পূজা প্রাচীনতর বলিয়া তাঁহাকে কার্তিকেয়ের অগ্রজ বলা হইয়া থাকে। ভবতোক্ত বিঘ্নকারী অসুরেরা ঝড়বৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়, আকাশের দেবতা ইন্দ্রদেব কর্তৃক তাহাদিগের দমনের অর্থ শরৎকালে আকাশ পরিষ্কৃত হওয়া।

আর্য নাটকের ভিত্তি যে শিবোৎসব তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের প্রথম নাটকদ্বয়—সমুদ্রমন্থন ও ত্রিপুরদাহ—শিবের লীলা লইয়াই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর

সংস্কৃত নাটকের ক্রমবিকাশ

ক্রমশঃ অন্যান্য দেবতার লীলা তাঁহাদের নাটকের বিষয়ীভূত হয়। দেবলীলার পর তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য হইতে দেবতুল্য মানবগণের এবং ইতিহাসপ্রোক্ত শ্রেষ্ঠ রাজা ও বীরগণের জীবনচরিত লইয়া নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণ সমাজকেও যে তাঁহারা অবহেলা করেন নাই, 'মৃচ্ছকটিক' নাটক তাহার প্রমাণ। বস্তুতঃ নাটক নাটিকা প্রকরণ প্রহসনাদি প্রায় সকল প্রকার নাটকই তাঁহারা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই নাট্যকারগণ যে সকল নাটক লিখিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশই আমরা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতেই আমরা তাঁহাদের অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পাই। এ বিষয়ে এসিয়া মহাদেশের মধ্যে তাঁহাদের স্থান সর্বোচ্চে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহাদেশের

অন্যান্য স্থানে অভিনয়ের উদ্দেশ্য আমোদ করা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না বলিলে অন্যায় হয় না, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা নাট্যাভিনয় উচ্চাঙ্গের কলাবিদ্যা হিসাবে চর্চা করিতেন এবং তাঁহাদের নাট্যশাস্ত্রগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ বিদ্যায় তাঁহারা চরম উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাটককে দশ প্রকার রূপক ও অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকে বিভাগ করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রানুসারে বিচার করিলে এ শ্রেণী-বিভাগকে অবশ্য নির্দোষ বলা যায় না, কারণ আটাশ শ্রেণীর স্থানে পাঁচ ছয় শ্রেণীতে ভাগ করিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু এত সূক্ষ্ম শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টাতেই বোঝা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যেরা নাটকের বৈচিত্র্য সম্পাদনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাটকের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উচ্চ-প্রশংসা করিয়াছেন। বাস্তবিক এই নাটকগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন সুন্দর স্বভাববর্ণনা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, চরিত্র অঙ্কনেও নাট্যকারগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা জটিল সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা লইয়া মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে জীবনযাত্রা এত সরল ছিল যে ঐ সকল সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কেহ অনুভব করেন নাই। তদ্ভিন্ন ঐরূপ সমস্যামূলক নাটক লিখিলেও তাহা নিষ্ফল হইত। যাহা শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য নয় তাহা তাহাদিগকে শুনাইতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। এদেশের দর্শকেরা সীতা বা শকুন্তলার সুখদুঃখ বুঝিতে পারিত—তাহাদের চরিত্রাভিনয় দেখিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া যাইত। কিন্তু ইবসেনের নোরার ন্যায় রমণীর সহিত তাহাদের কোনকালে পরিচয় ছিল না, তাহার প্রাণের কথা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ বা সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারিত না, সুতরাং তাহাদের সম্মুখে Doll's Houseএর ন্যায় নাটক অভিনীত হইলে তাহার বিফলতা যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহা বলা বাহুল্য।

সংস্কৃত নাটকের গুণাগুণ-বিচার

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গবাসীর বৈশিষ্ট্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায়—পাশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস

কিরূপ ভাবে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি হইয়াছিল তাহা দেখিলাম। কিন্তু তাহার সহিত বাংলা নাটকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নাট্য বিষয়েও বাংলা দেশ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল—সংস্কৃত নাটক তাহার উপর কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ—সংস্কৃত নাটকগুলি ছিল সৌখীন বৈঠকী নাটক। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের জন্যই সেগুলি লিখিত হইত এবং যে নাট্যশালায় সেগুলি অভিনীত হইত তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না—থাকিলেও সে সকল নাটক বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। দ্বিতীয় কারণ—বাঙালীর স্বাধীন মনোবৃত্তি।

বঙ্গদেশবাসীর স্বাধীন মনোবৃত্তি

অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙালী তাহার স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে ধর্ম্ম সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা রাজনীতি সমাজ-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙালীর নিজ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বস্তুতঃ বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্রতা এরূপ প্রাচীন ও সুদৃঢ়-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত যে তাহাকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নহে। বঙ্গদেশের

পুরাকালের বাঙ্গালীদের অসমসাহসিকতা—দূরদেশে অভিযান

প্রাচীন অধিবাসীরা প্রধানতঃ দ্রাবিড়জাতীয় ছিল তাহা বলিয়াছি। তাহারা সাধারণতঃ কৃষিজীবী ছিল বটে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে অনেকে তাহাদের সিন্ধুপ্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় অসমসাহসিক বণিক ছিল এবং বাণিজ্যসূত্রে একদিকে মহাসমুদ্রপথে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, অন্য দিকে হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতাদি

দেশে তাহারা যাতায়াত করিত। বাংলা দেশের প্রাচীন কাহিনী-সমূহের অনেকগুলিতেই বণিক বা বণিকপুত্রকে নায়ক রূপে দেখা যায় এবং উপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীর পুত্র, কোটালের পুত্র থাকিলেও সওদাগরের পুত্রকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে পারিতেন না। বাঙালী নৌসেনার পরাক্রমের কথা কবি কালিদাস পর্য্যন্ত তাঁহার রঘুবংশে স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ জাতি স্বভাবতঃই স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত যখন বিজয়ী আর্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতীতীর হইতে সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত আসিয়া নিবিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার পূর্বে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তখন বোধ হয় তাঁহারা "অপ্রাপ্য আঙ্গুরফল মাত্রেই টক" এই নীতি অনুসারে বঙ্গবাসীদের উপর গালিবর্ষণ করিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যক বলেন, বঙ্গবাসীরা অবোধ্য ভাষাভাষী পক্ষিজাতীয়; এবং তাহার ভাষ্যকার তাহার উপর আর একগ্রাম সুর চড়াইয়া তাহাদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি মধুর আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। স্বয়ং মনু পর্যান্ত বিধান দিয়াছেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন এ ম্লেচ্ছ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বিজয়ী আর্যজাতির অগ্রগমনে বাধা দান করিয়াছিল বঙ্গদেশ

অতএব ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা দেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহার শিল্পকলা ও কাব্যাদি স্বাধীনভাবে নিজ পুরাতন ভিত্তিরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাঙালী কোনকালেই সঙ্কীর্ণমনা ছিল না—বাহিরের জিনিস ভাল বোধ হইলে সে তাহা গ্রহণ করিতে কখন

বঙ্গীয় কৃষ্টির প্রাচীনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য

কুণ্ঠিত হয় নাই। তবে সে সকল সময়ে সেটিকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছে এবং তাহার ফলে সেটি তাহার আদিম-রূপ ত্যাগ করিয়া বাঙালীরূপ ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় বাংলা দেশেরও নাট্যকলা প্রাচীন শিবোৎসবের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও আমরা মহাবিষুব সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও গাজনোৎসব করিয়া সেই প্রাচীন শিবোৎসাবের স্মৃতিরক্ষা করিতেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিবোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা নাটক কিরূপভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এই ইতিহাস লিখিবার বহু উপাদানও এরূপভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে সেগুলির পুনরুদ্ধারের আশা নাই। কোন প্রাচীন বাংলা নাটক আমাদের হস্তগত হয় নাই, সম্ভবতঃ তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমরা জানি, পূর্ব্বকালে যে সকল নাটক অভিনীত হইত, সেগুলির অধিকাংশই লিখিত হইত না। সেগুলি হাবভাবনৃত্যগীতপ্রধান ছিল, কেবল মাঝে মাঝে ছড়া আবৃত্তি করা হইত। গীত ও ছড়া অভিনেতাদের মুখস্থই থাকিত, সেগুলি লিখিবার প্রয়োজন হইত না। এখন রসপ্রধান গীতিকাব্য, বর্ণনাত্মক কাব্য ও নাটক পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তখন এক পালাগানের মধ্যে এ সমস্তই মিশ্রিতভাবে থাকিত এবং সেগুলি লিখিত না হইয়া মুখে মুখে গীত হইত। সুতরাং প্রথমে কোন লিখিত নাটক ছিল না। তাহার পর যে সকল নাটক লেখা হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশ নানা কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রথম কারণ,—এ দেশের সর্ব্বধ্বংসী জলবায়ুর কবল হইতে পুঁথিপত্র রক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। দ্বিতীয় কারণ,—সাধারণ গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাবশতঃ যত্নের অভাবে অনেক পুস্তক

প্রাচীন বাংলা নাটক-সমূহের অন্তর্ধান

এই সকল নাটক লোপ পাইবার কারণ

লোপ পাইয়াছে। তৃতীয় কারণ.—নাট্যব্যবসায়ীরা নিজেদের নির্ব্যূঢ় স্বত্বরক্ষার জন্য কাহাকেও তাহাদের নাটকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে দিত না। প্রাচীন যাত্রার পালাগুলি সাধারণতঃ কোন পল্লিকবি কর্তৃক দলবিশেষের জন্য লিখিত হইত, অধিকারী মহাশয় লিখিত রচনাটি নিজের নিকট রাখিয়া স্বদলের গায়কদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, সাধ্যমত রচনাটি হস্তান্তর হইতে দিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্তে গিয়া পড়িত এবং সে উত্তরাধিকারী ব্যবসায় চালাইতে অপারক হইলে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইত। সে সময় 'কপিরাইট' বা 'প্লেরাইট' আইন ছিল না, সুতরাং অধিকারী মহাশয় এইরূপ সঙ্কীর্ণনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। আমার মনে আছে, আমরা যখন বালক ছিলাম তখন যাত্রাদলের এক বালক-গায়কের নিকট হইতে একটি গান আদায় করিতে কত সাধ্যসাধনা করিতে হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, অধিকারী মহাশয় তাহাকে এমন কঠিন শপথ করাইয়া লইয়াছেন যে, গানটি বাহিরের কোন লোককে শিখাইলে তাহার অনন্ত নরকবাস নিশ্চিত। অবশেষে তাহার বিবেককে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসহ প্রচুর জলপান দিতে হইয়াছিল, অধিকন্তু ঠাকুরের নামে আমাদিগকে শপথ করিতে হইয়াছিল যে, গানটি আমরা আর কাহাকেও শিখাইব না। এ ভাবটি প্রাচীনকালে আরও দৃঢ়তররূপে বর্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় গায়ক ও অধিকারী মহাশয়দের তিরোভাবের সহিত যে গানগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের কবিদের গ্রন্থ যে এখনও টিকিয়া আছে তাহার কারণ এই যে, এই সকল কবি ব্যবসাদার ছিলেন না এবং তাঁহাদের কাব্যসমূহের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা হেতু দেশের সর্বত্র তাহাদের বহু প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল পালাগান এইরূপে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, লিপিকরদের দৌরাত্ম্যে তাহাদেরও দুর্দশা কম হয় নাই।

কিন্তু বাংলার পুরাতন নাটকগুলি না পাইলেও আমরা এমন কতকগুলি উপাদান পাইয়াছি যাহা হইতে আমরা আমাদের নাটকের ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারি। একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের দেশটিকে প্রাচীন ইতিহাসের যাদুঘর বলিলে চলে। আমরা নূতন জিনিস আমদানী করিলেও পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করি না। এখানে গোরুর গাড়ী ও মোটর গাড়ী পাশাপাশি চলে, অর্দ্ধ-উলঙ্গ অসভ্য লোক উৎকৃষ্ট বেশধারী সভ্যতম ব্যক্তির সুরম্য প্রাসাদের পার্শ্বেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করে। সাগরের সহিত সমতল ভূমি হইতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশিখর যেমন এ দেশে বিরাজমান, সভ্যতার নিম্নতম হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত সকল স্তরই এখানে অবিরোধী অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এত থিয়েটার সিনেমার ছড়াছড়ি করিয়াও আমরা সেকালের রামায়ণ-গান পাঁচালী যাত্রাদির জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমাইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপে সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসের সকল পৃষ্ঠাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে খোলা রহিয়াছে দেখিতে পাই। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলে এই ইতিহাস সহজেই সঙ্কলন করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, জীব-বিবর্তনের ইতিহাস এই ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে। নিম্নতর জীব ক্রমোন্নত হইয়া উচ্চতর জীবে পরিণত হয় বটে, কিন্তু একজাতিভুক্ত সকল জীবেরই সে সৌভাগ্য হয় না—ফলে অধিকাংশই নিজ স্তরে থাকিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া উচ্চতর জীবের পূর্বাবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারি। কোন বিশেষ শ্রেণীর জীব লুপ্ত হইয়া গেলেও ধরাপৃষ্ঠে তাহারা তাহাদের কঙ্কালাদি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এইরূপে বর্তমান জীবসমূহ ও লুপ্ত জীবের চিহ্নসকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও একটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জীবের ক্রমোন্নতির যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহা সর্বত্র সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সঙ্কলন দুরূহ হইলেও অসাধ্য নহে

আমরা এই প্রণালী অনুসারে রচনা করিতে পারি। আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি, কিন্তু উপাদানের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ আমাকে বহুস্থলেই অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য নাটকের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য নাটক ও আমাদের নাটক যে একই ভাবে জন্মলাভ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং ইউরোপীয় নাটকের ইতিহাসের সাহায্যে আমাদের নাটকের ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলিকে সহজেই উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সে পদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছি এবং তুলনামূলক আলোচনা করিয়া আমার সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের ইতিহাস হইতে কি সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা নাটকের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য যে সকল উপাদান ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ এখানে করিতেছি (১) প্রচলিত প্রাচীন শিবোৎসবসমূহ, যথা,—আদ্যের গম্ভীরা, চড়কের গাজনোৎসব, নেপালের ভৈরব যাত্রা ও মৎস্যেন্দ্রনাথ যাত্রা, দক্ষিণভারতের ভৈরব ও গণপতি উৎসব প্রভৃতি। এগুলির সহিত প্রাচীন গ্রীসের দিওনুসিওস উৎসবের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। (২) আমাদের পুরাতন পালাগানসমূহ। (৩) চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থে উল্লিখিত সপার্ষদ চৈতন্যদেবের অভিনয়ের বিবরণ। (৪) বাংলা দেশে লিখিত সংস্কৃত নাটক, যথা,—বেণীসংহারাদি নাটক ও বৈষ্ণবকবিগণের রচিত ভক্তিমূলক নাটকসমূহ। (৫) নেপাল হইতে সংগৃহীত মধ্যযুগের কতিপয় বাংলা নাটক। (৬) সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত যাত্রার বিবরণ বা যাত্রায় অভিনীত কতিপয় নাটক। (৭) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ছড়া গান প্রভৃতি। (৮) সংস্কৃত নাটকের আদর্শে লিখিত কতিপয় পুরাতন বাংলা নাটক; যথা,—ভারতচন্দ্রের "চণ্ডী"-নাটক, বিদ্যানাথ বাচস্পতির

বাংলা নাটকের ইতিহাস-রচনার কয়েকটি উপাদান

"চিত্রযজ্ঞ" প্রভৃতি। কিন্তু এরূপ বিক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র উপাদানসমূহ লইয়া আমাদের নাট্য-সাহিত্যের একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের অনেকগুলি সংযোগসূত্র অতীতের অন্ধকার গর্ভে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি, ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের আলোকে আমরা সেগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। সেইজন্য প্রথমে পাশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পাশ্চাত্ত্য নাটকের জন্ম হইয়াছিল প্রাচীন গ্রীসে দিওনুসিওস (Dionysios) দেবের মন্দিরে। এই দেবতা আমাদের শিবঠাকুরেরই প্রতিরূপ ছিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শিবের ন্যায় তাঁহারও পূর্ণবিগ্রহ ও লিঙ্গ—এই দুই মূর্তিই ছিল এবং উভয় মূর্তিতেই তিনি পূজিত হইতেন। শিবের ন্যায় তিনিও বৃষভবাহন ছিলেন। তাঁহার আর এক নাম ছিল বাক্‌খস্ (Bacchos)। অনুমান হয়, বৃষভার্থক সংস্কৃত 'উক্ষা' শব্দের সহিত এ নামের সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক, তাঁহাকে আবাহনকালে পূজারিণীরা গাহিত,—

"এসহে দিওনুসিওস, এস হেথা অচিরে,
বৃষপদ ক্ষেপি দেব এস এই মন্দিরে।"

শিবের সহিত দিওনুসিওসের সাদৃশ্য

মোহেঞ্জোদাড়োর শিবমূর্তির ন্যায় তাঁহার বিগ্রহও দীর্ঘকেশ ও শৃঙ্গ-বিশিষ্ট ছিল। তাঁহারও পূজা ও উৎসব বসন্তকালে নববর্ষারম্ভে হইত। সে সময়ে গ্রীসের প্রধান শস্য দ্রাক্ষাফল পাকিয়া উঠিত, সুতরাং আর্য যজ্ঞের সোমরসের ন্যায় এ উৎসবে প্রচুর দ্রাক্ষারস ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিত। দিওনুসিওস Bacchos রূপে সুরার দেবতা ছিলেন এবং Bacchanalia বা সুরোৎসবই ছিল তাঁহার পূজার প্রধান অঙ্গ। এ দেশেও বৌদ্ধজাতকে এক সুরোৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা বসন্তোৎসব ছিল এবং তদুপলক্ষ্যে নরনারীগণ সুরাপানে

মত্ত হইত। শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের সহিত শিবের বিবাদ উপলক্ষ্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত শিবভক্তদের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় তাঁহারাও এ বিষয়ে বাক্‌খস্‌দেবের ভক্তদের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না—তাঁহাদের নিকট 'সুরাসব' নাকি দেববৎ আদরণীয় ছিল। ব্যাখ্যাকার সুরাসবের অর্থ করিয়াছেন—গৌড়ী (গুড়জাত), পৈষ্টী (ধান্যজাত) ও মাধ্বী (মধুজাত) সুরা এবং আসব (তালরসাদিজাত মদ্য)—এক কথায় সেকালে প্রচলিত সকল প্রকার মদ্য। এখন কিন্তু এই জাতীয় শিব-ভক্তেরা সিদ্ধি ও গঞ্জিকারই অধিক পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। অনেকের মতে সিদ্ধি ও আর্যদের প্রিয় পানীয় সোম একই পদার্থ। আর গঞ্জিকা যে সিদ্ধি গাছেরই জটা তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, দিওনুসিওস দেবের উৎসবে এইরূপে প্রগাঢ় দেবভক্তির সহিত তরল আমোদপ্রিয়তা মিশিয়াছিল এবং tragedy ও comedy উভয় প্রকার নাটক-সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

দিওনুসিওস উৎসব

প্রথম অবস্থায় এই উৎসবে আড়ম্বরের বাহুল্য বিশেষ ছিল না। গৃহে উপাসনা সমাপনান্তর গৃহস্থ নৈবেদ্য ও বলির ছাগসহ পল্লীর গম্ভীরা বা দেবস্থানে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেন। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকিত পূজোপকরণ ও বলিসহ গৃহস্থদের কন্যাগণ, তাহার পর থাকিত লিঙ্গ-মূর্তিবাহক ক্রীতদাস, সর্বশেষে কর্তা স্বয়ং দেবমহিমাদ্যোতক গান করিতে করিতে যাইতেন। শোভাযাত্রা দেবস্থানে পৌঁছাইলে দিওনুসিওসের সম্মুখে ছাগ বলি দিয়া উৎসব শেষ করা হইত। কোন কোন স্থানে দিওনুসিওসের পূজার পর তাঁহার বিবাহোৎসব হইত। এ

দিওনুসিওস ও শিবের বিবাহের জনপ্রিয়তা ও তাহার কারণ

দেশেও শিবের বিবাহকাহিনী কিরূপ জনপ্রিয় তাহা সকলেই জানেন। ক্ষুদ্রতম পল্লিকবি হইতে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত যিনিই সুবিধা পাইয়াছেন শিবঠাকুরকে একবার বরবেশে না সাজাইয়া ছাড়েন নাই। এমন কি কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখিতে

বসিয়াও এ লোভ ছাড়িতে পাবেন নাই এবং আর কোথাও স্থান না পাইয়া উত্তরাকাণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে এই কাহিনীটি জুড়িয়া দিয়াছেন। ছেলেদের পুরাতন ছড়ার মধ্যেও শিবঠাকুরের বিয়ের কথা শোনা যায়। এখনও কুমারীরা শিবের ন্যায় স্বামী লাভ করিয়া কুমারের ন্যায় পুত্রের জননী হইবার প্রত্যাশায় শিবের পূজা করিয়া থাকে। বাস্তবিক শিব-শক্তির মিলনই শিবোৎসবের ভিত্তি। এ মিলনের ফলেই সৃষ্টি রক্ষা হয়—সুতরাং শিবের বিবাহ বিশ্ববাসীর পক্ষে একটা মহানন্দেব ব্যাপার। বস্তুতঃ সেকালে বংশরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইত যে, বন্ধ্যাত্ব নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত—এমন কি, ভিখারীরা পর্য্যন্ত বন্ধ্যা নারীর হস্ত হইতে ভিক্ষা গ্রহণ পাপ মনে করিত।

দিওনুসিওসের এই সরল গ্রাম্যপূজা উত্তরকালে মহা আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে শোভাযাত্রার সমারোহও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে পূর্বে দুই একটি বালিকাকে মাত্র নৈবেদ্যবাহকারূপে দেখা যাইত,

দিওনুসিওস উৎসবের ক্রমবিকাশ

কিন্তু এখন একদল সুবেশা পুষ্পাভরণসজ্জিতা কুমারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের পশ্চাতে দিওনুসিওসের একটি পূর্ণবিগ্রহমূর্তি ও একটি শতাধিক হস্ত দীর্ঘ প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্তি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। সে মূর্তিদ্বয়ের পশ্চাতে থাকিত ভক্তের দল। ঐ দলের মধ্যে 'স্যাটার্' (Satyr)-বেশী গায়কের দল সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত। স্যাটার্‌রা আমাদের দেবগায়ক কিন্নবদের ন্যায় দেবযোনি ছিল; প্রভেদের মধ্যে ছিল এই যে, কিন্নবেরা ছিল অর্দ্ধ-অশ্ব অর্দ্ধ-নর, আর স্যাটার্‌রা ছিল অর্দ্ধ-ছাগ অর্দ্ধ-নর। দিওনুসিওসের সঙ্গীতপটু ভক্তেরা ছাগচর্মে দেহ আবৃত করিয়া স্যাটার্ সাজিত এবং উৎসবস্থলে গান করিত। আর এক দল ভক্ত সুরাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া সুরোন্মত্ততার অভিনয় করিতে করিতে যাইত। শোভাযাত্রার সর্বশেষে থাকিত বীভৎস মুখসধারী

প্রেতের দল। দিওনুসিওস যে মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এই প্রেতের দলের দ্বারা তাহাই বিজ্ঞাপিত হইত। আমাদের দেশেও এই কারণে ভূত-প্রেতেরা মৃত্যুঞ্জয় শিবের অনুচর-রূপে কল্পিত হইয়াছে এবং শিবের এক নাম হইয়াছে ভূতনাথ।

পূজাস্থলে শোভাযাত্রা উপস্থিত হইবার পর যখন বলিদানের আয়োজন করা হইত, তখন স্যাটার্ বা কিন্নরের দল বংশীবাদনসহ নৃত্যগীত করিতে করিতে বেদীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিত। এই নর্তকদলের নাম ছিল কোরাস্ (Chorus)। তাহারা দিওনুসিওসের গুণকীর্তন করিয়া যে সকল গান গাহিত সেগুলি ডিথির‍্যাম্ব্ (Dithyramb) নামে অভিহিত হইত। কিন্তু নর্তকেরা ছাগবেশী ছিল বলিয়া জনসাধারণ তাহাদের নাম দিয়াছিল tragos অর্থাৎ ছাগ এবং সেইজন্য তাহাদের গানগুলি tragic নামে আখ্যাত হইত। ইহার পর যখন তাহার সহিত সংলাপ ও অভিনয় মিশিয়া নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন সেই নাটকের নাম হইয়াছিল Tragedy।

কোরাস্ ও ডিথিব্যাম্ব্

ট্র্যাজেডির উৎপত্তি

কোরাস্ গান হইতে নাটকের এই উৎপত্তির ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে Thespis নামে এক বিখ্যাত নট ছিলেন। তিনি স্থানীয় কোরাস্-গণকে নৃত্য ও স্বরচিত গান শিক্ষা দিতেন। কেবল দিওনুসিওসের চরিত নয়, গ্রীক পুরাণোক্ত বীরগণেরও চরিত অবলম্বন করিয়া তিনি পালাগান রচনা করিতেন। এই পালাগানগুলিতে পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিত,—মূল গায়কেরা নানারূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গান গাহিত এবং সহকারী গায়কেরা গানে তাহার প্রত্যুত্তর দিত। মূল গায়কের নিকট কতকগুলি মুখস থাকিত, তিনি ভূমিকা অনুযায়ী মুখস পরিয়া গান গাহিতেন। ইহার পরের শতাব্দীতে Aeschylus কোরাস্ গানের মধ্যে সংলাপ প্রবর্তন করেন এবং তাহার পর Sophocles

থেস্পিস্

গ্রীক পালাগান

ঈস্কাইলাস্ ও সোফোক্লেস্

সংলাপের সহিত নাটকীয় ক্রিয়া যোগ করিয়া দেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত কোরাস্ গানের প্রাধান্য কমে নাই। যাহা হউক, ইহার পর Euripides নাটককে যে ভাবে গড়িয়া তুলিলেন তাহাতে কোরাস্ গান প্রায় অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল—নাট্যকারের প্রতিনিধিরূপে নাটকের ঘটনাবলী বুঝাইয়া দেওয়া বা সমালোচনা করা ভিন্ন আর কোন কাজ তাহার রহিল না। কিন্তু গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডির মধ্যে হাস্য-রস প্রবেশ করান গ্রীকদের মতে অসঙ্গত ও অবৈধ ছিল। অথচ সাধারণ দর্শক স্বভাবতঃ হাস্যকৌতুকপ্রিয় ছিল, উৎসবের মধ্যে এরূপ 'নির্জলা' গাম্ভীর্য্য তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখিত না। সেইজন্য উৎসবকর্তারা যাত্রার সঙের মত প্রহসন অভিনয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রহসনের নাম ছিল "স্যাটার নাটিকা"। কিন্তু এগুলিও পৌরাণিক বিষয় লইয়া রচিত হইত।

এউরিপিদেস্

স্যাটার্ নাটিকা

গ্রীক কমেডিও দিওনুসিওসের উৎসব-উপলক্ষ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত পূজাব্যাপারের সম্পর্ক ছিল না, ধর্মসংক্রান্ত বিষয় লইয়াও সেগুলি রচিত হইত না। যে সময়ে দিওনুসিওসের ভক্তদের শোভাযাত্রা দেবালয়-অভিমুখে গমন করিত, সেই সময়ে আমাদের দেশের হোলির দলের ন্যায় একদল উৎসবোন্মত্ত যুবক রথ বা চলন্ত মঞ্চে চড়িয়া বাহির হইত এবং গান করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিত। তাহারা চতুর্দিকে সমাগত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ বিদ্রূপাদি করিত, জনতাও তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে ত্রুটি করিত না। এই সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি অনেকটা আমাদের হোলিগান বা খেউড়ের মত ছিল এবং বলা বাহুল্য তাহাতে শ্লীলতা-রক্ষার কোন চেষ্টা লক্ষিত হইত না। এই প্রমোদমত্ত যুবকের দল komos নামে অভিহিত হইত এবং তাহাদের ছড়াগান ও কথা-কাটাকাটিকে ভিত্তি করিয়া উত্তরকালে যে নাটকের উদ্ভব হইয়া ছিল তাহাই Comedy নামে পরিচিত হয়। সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের দোষত্রুটির ব্যঙ্গাত্মক

কমেডির উৎপত্তি

সমালোচনা করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আরিস্তোফানেস্

গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক ছিলেন Aristophanes ; তিনি Euripidesএর ৩৫ বৎসর পরে ৪৪৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫৪খানি কমেডি লিখিয়াছিলেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় প্রকার নাটকই পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন যুগে যে ভাবে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি হইয়াছিল, মধ্যযুগে খ্রীষ্টান নাটকও ঠিক সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে ছিল এই যে, মধ্যযুগে দিওনুসিওসের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—খ্রীষ্ট। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, খ্রীষ্টানেরা উৎসবকালের পরিবর্তন করেন নাই। প্রাচীন উৎসবের দিনগুলি প্রাকৃতিক কারণে নির্বাচিত হইয়াছিল এবং এই সকল দিন জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সমান আনন্দজনক ছিল উৎসবগুলি ছিল সেই আনন্দেরই অভিব্যক্তি;—বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন ভাবে সেই সকল উৎসব সম্পন্ন করিত এই মাত্র। সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা—এরূপ সার্বজনীন উৎসব-কালের পরিবর্তনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া সেই সকল দিনেই আপনাদের ধর্মোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের উৎসবগুলিকে প্রাচীন উৎসবসমূহের ন্যায় জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঐসকল দিনে গ্রীকদের ন্যায় নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টান নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস

গ্রীসে যেমন প্রথমে দিওনুসিওসের চরিত অভিনীত হইত, তাঁহারাও তেমনই প্রথমে কেবল যীশুর জীবনী অবলম্বন করিয়া অভিনয় করিতেন। এইরূপে যে সকল নাটকের উদ্ভব হয়, তাহাদের নাম ছিল Mystery এবং যে সকল Mystery নাটক খ্রীষ্টের আত্মবলিদান প্রসঙ্গ লইয়া রচিত

মিস্টারি ও প্যাশান নাটক

হইত সেগুলি Passion Play নামে অভিহিত হইত। ইহার পর বাইবেলে বর্ণিত সাধু ও নবীগণের জীবনী লইয়া নাটক রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এ নাটকগুলি Miracle নামে আখ্যাত হইত। তাহার পর Morality নামক রূপক-নাটকের আবির্ভাব হয়। এই সকল নাটকে আমাদের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ন্যায় রূপকচ্ছলে পাপ-পুণ্যের ফলাফল দেখান হইত। সুতরাং সাধারণ মানুষের ও সমাজের দোষগুণ ইহার বিষয়বস্তু ছিল এবং সেই হেতু এরূপ নাটকে চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে নাটককারের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, নাটক ক্রমান্বয়ে তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমান আকার ধারণের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রথমে কেবল দেবলীলা, তাহার পর দেবোপম মানবচরিত এবং শেষে সাধারণ মানবজীবন নাটকের বিষয়ীভূত হয়। আমাদের দেশেও যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা পরে দেখিব।

মিরাক্‌ল্‌ ও মর‍্যালিটি নাটক

নাটকের অভিনয়ও ক্রমশঃ ধর্মমন্দির হইতে সাধারণ নাট্যশালায় গিয়া পৌঁছাইয়াছিল। প্রথমে Mystery বা Passion নাটকসমূহ খ্রীষ্টের জীবনের একাংশ মাত্র লইয়া রচিত হইত এবং সেগুলি আকারেও ক্ষুদ্র ছিল। দুই চারিজন ধর্মযাজকের দ্বারা মন্দির মধ্যেই তাহার অভিনয় কার্য সহজেই নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু ক্রমে যখন খ্রীষ্টের সমগ্র জীবন-কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইতে লাগিল, তখন মন্দিরমধ্যে সকল দৃশ্য দেখান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মন্দির-প্রাঙ্গণে ঐ নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল এবং বাহির হইতে অতিরিক্ত অভিনেতা আনয়ন করাও আবশ্যক হইল। ইহার ফলে দুইটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, নাটকগুলি সাধারণের অবোধ্য লাটিন ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকদের তৃপ্তির জন্য নাটকে হাস্যরসাত্মক দৃশ্য ও চরিত্র প্রবর্তন করা হইল।

খ্রীষ্টান নাটকের ও তাহার অভিনয়ের ক্রমবিকাশ

ইহার পর যখন ধর্মযাজকেরা ব্যয়বাহুল্যাদি বশতঃ নাট্যাভিনয়ের সমস্ত ভার নগরবাসীদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন নাটকের মধ্যে রঙ্গরসের ও বাস্তবতার পরিমাণ স্বতঃই বাড়িয়া গেল। এমন কি, Mystery ও Miracle নাটকগুলিতে হাস্যরস অবতারণার বিশেষ অবকাশ না থাকিলেও তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যীশুর জন্ম বিষয়ক নাটকে মেষপালকগণের দৃশ্যের ও মহাপ্লাবন নাটকে নুহের সপরিবারে পোতারোহণ দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ উভয় ঘটনাই অবশ্য বাইবেল হইতে গৃহীত হইত, কিন্তু তাহার মধ্যে হাস্যকর ব্যাপার দুইটি ছিল নাটককারের উদ্ভাবিত। মেষপালকের দৃশ্যে মেষ-চোর ম্যাক ও নুহের পোতারোহণ দৃশ্যে নুহের স্ত্রী হাস্যের খোরাক যোগাইত। ম্যাক তাহার অপহৃত মেষটিকে সূতিকাগৃহে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া সেটিকে নিজ সদ্যোজাত পুত্র বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আর নুহের স্ত্রী জাহাজে উঠিতে আপত্তি করিয়া বিষম গণ্ডগোল বাধাইতেন। এই দুইটি গল্পই কাল্পনিক ছিল বটে, কিন্তু শেষোক্ত দৃশ্যটি ছিল সাধারণ ঘরসংসারের নিত্য ঘটনার একটি সজীব চিত্র। দৃশ্যটি এই—মহাপ্লাবনের প্রাক্কালে, ঈশ্বরের আদেশমত নূহ্ জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং জোড়ায় জোড়ায় জীবজন্তু জাহাজে তুলিয়া দিয়াছেন। তারপর তিনি নিজে সপরিবারে জাহাজে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার স্ত্রী বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন—এতকালের ঘর সংসার—বিশেষতঃ তাঁহার গালগল্পের সহচরীদের—ফেলিয়া কোথায় তিনি জলে ভাসিতে যাইবেন! তাঁহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ নূহ্ একেবারে হতভম্ব! তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা বুড়ীকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু বুড়ীর এক কথা—

খ্রীষ্টান কমেডির উৎপত্তি

> "That will not I, for all your call,
> But I have my gossips all."

তথাপি যখন নূহ্ আবার বলিলেন,—

> "Welcome, wife, into this boat

তখন সতী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না—তাঁহার পূজ্যপাদ বৃদ্ধ-স্বামীকে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"Have thou that for thy note."

অবশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে বুড়ীকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া জাহাজে তুলিতেন। বলা বাহুল্য, এ দৃশ্যটি জনতা খুবই উপভোগ করিত।

যীশুর জননী কুমারী মেরীর সহিত জোসেফের বিবাহ-দৃশ্যটিও বিশেষ কৌতুকজনক ছিল। জোসেফ বাতগ্রস্ত বৃদ্ধবেশে এক স্থূল যষ্টি হস্তে দেখা দিতেন এবং যখন সুন্দরী যুবতী মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করা হইত, তখন তিনি শিহরিয়া বলিয়া উঠিতেন, "What should I wed? God forbid!"—কারণ, তাঁহার ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে মেরীর ন্যায় তরুণীকে বিবাহ করা "was neither sport nor game"—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" বড় ভয়ঙ্কর কথা! শেষে যখন তাঁহাকে বোঝান হইত যে এ বিবাহ ঈশ্বরের আদেশমত হইতেছে, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া তিক্ত ঔষধ গেলার মত মুখ-বিকৃতি করিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিতেন।

কিন্তু Mystery ও Miracle নাটকগুলি অপেক্ষা Morality নাটকগুলিতে হাস্যরস অবতারণার অনেক অধিক অবকাশ মিলিত এবং নাটকলেখকগণ তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করিতেন না। বিশেষতঃ এই সকল নাটকের উপনায়ক সপুচ্ছ শয়তান ও তাহার অনুচরগণ আমাদের যাত্রাদলের হনুমানের মত লম্ফঝম্প ও হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করিয়া দর্শকগণকে যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ দিত। ইহা ভিন্ন অনেক সময় Interlude নামক নাচগান রঙ্গরসপূর্ণ চুট্‌কি নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইত। এইরূপে মধ্যযুগে কমেডির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর কতিপয় অসামান্য প্রতিভাশালী নাট্যকারের আবির্ভাব, জনশিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ফলে স্বাধীনচিন্তার প্রসার, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণের সমবায়ে কিরূপ ভাবে পাশ্চাত্ত্য

ইণ্টার্‌লিউড্‌

নাট্যজগতে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার আলোচনা এস্থানে করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা দেখিব, প্রাচীন ও মধ্য যুগে ইউরোপীয় নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাহায্যে আমরা আমাদের নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস কতদূর উদ্ধার করিতে পারি। উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান আছে তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ—মধ্যযুগ

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে কয়েকটি বিশিষ্ট সোপান অতিক্রম করিয়াছিল। প্রথমে দেবতার সম্মুখে কেবল নৃত্যগীত হইত এবং গানগুলি একই দেবতার স্তুতিবাচক হইলেও তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত বা একসূত্রে গ্রথিত হইত না। কিন্তু ইহার পর দেবতার কোন বিশেষ লীলা অবলম্বন করিয়া পালাগান রচিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম পালাগান-রচয়িতাদের মধ্যে থেস্‌পিস্‌ই যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এই সকল পালাগানের মূলগায়ক গান করিবার সময় লীলা-কাহিনীর মুখ্য চরিত্রগুলির কথা ও ভাব আমাদের কথকঠাকুরদের ন্যায় উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও স্বর-পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করিতেন এবং সময়ে সময়ে অভিনয় অধিকতর হৃদয়-গ্রাহী করিবার জন্য চরিত্রোপযোগী মুখস পরিতেন। পালাগানে প্রথমে কেবল গানই থাকিত, পরে তাহার ভিতর মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিবার জন্য ছড়া ও কবিতা সন্নিবিষ্ট করা হইত। এই আবৃত্তির অংশ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের দেশের পাঁচালির ছড়ার মত সে সকল অংশ সুরের সহিত আবৃত্ত হইত। তাহার পর সুরসংযুক্ত ছড়ার পরিবর্তে নাটকীয় ক্রিয়াসহ কথোপকথন ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে পালাগান ক্রমশঃ নাটকে পরিণত হয়। পালাগান ও নাটকের বিষয়বস্তু প্রথমে ছিল কেবল দেবলীলা, তাহার পর ক্রমান্বয়ে পুরাণোক্ত দেবোপম মানবচরিত ও সাধারণ মানবজীবন নাটকের বিষয়ীভূত হয়, তাহা বলিয়াছি।

পালাগান হইতে পাশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তি

প্রথম একজন মূলগায়ক দোহারদের সাহায্যে সমস্ত পালাটি

অভিনয় করিতেন, কিন্তু আখ্যানাংশের দৈর্ঘ্য এবং চরিত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য-বৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কথিত আছে, Aeschylus প্রথমে একজনের স্থানে দুইজন অভিনেতার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার পর Sophocles তিনজন অভিনেতার দ্বারা নিজ নাটক অভিনয় করান। মধ্যযুগেও অভিনেতার সংখ্যা এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলিয়াছি। প্রথমে ধর্মমন্দির মধ্যে দুই একজন ধর্মযাজকের দ্বারা অভিনয়কার্য নিষ্পন্ন হইত, তাহার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত অভিনেতা আনিয়া অভিনয় করান হইত। অবশেষে যখন ধর্মযাজকগণ নাগরিকদের হস্তে অভিনয়ের ভারার্পণ করেন, এবং নাট্যাভিনয় বারোয়ারি ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তখন অভিনেতাদের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য নাট্যাভিনয়ের এইরূপ বিবর্তনের সহিত রঙ্গালয় ও নাট্যমঞ্চও অবশ্য পরিবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা পরে বলিব।

আখ্যানের দৈর্ঘ্য ও অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত নাটকের ও রঙ্গালয়ের ক্রমবিকাশ

আমাদের দেশেও অনেকগুলি পালাগান উপরি-উক্ত ভাবেই যাত্রাগানে পরিবর্তিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বের কোন বাংলা কাব্য বা গীতিকবিতা আমাদের হস্তগত হয় নাই। সর্বাপেক্ষা পুরাতন গীতিকাব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম শূন্যপুরাণ। তাহার লেখক রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে বাঙ্গালীর প্রাচীনধর্ম বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবে এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছিল। তখন শূন্যবাদী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবতা ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিবোৎসব ধর্মঠাকুরের গম্ভীরা উৎসব বা গাজনে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ উৎসবকালের কোন পরিবর্তন করেন নাই—প্রাচীনকালে যখন শিবোৎসব হইত ধর্মোৎসবও সেই সময়ে হইত।

শূন্যপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বাংলা গীতিকাব্য বা পালাগান পাওয়া যায় নাই

শিবের প্রধান গুণগুলিও ধর্মঠাকুরে আরোপ করা হইয়াছিল। সূর্য্য ও শিব প্রাচীনকাল হইতেই প্রজা ও শস্য বর্দ্ধক দেবতারূপে পূজিত হইতেন তাহা বলিয়াছি। ধর্মঠাকুরও পুত্রদাতা দেবতা ছিলেন—তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বন্ধ্যা নারীরা নানা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র সাধনা করিতেন। এই সকল সাধনার চরম সাধনা ছিল—শালে ভব দেওয়া। অনেকগুলি সুতীক্ষ্ণ উর্ধ্বমুখ লৌহশলাকা কাষ্ঠফলকে আঁটিয়া দেওয়া হইত এবং পুত্রার্থিনীকে তাহার উপর পড়িয়া তপস্যা করিতে হইত। বহু ধর্মমঙ্গলের নায়ক সুবিখ্যাত লাউসেনের জননী রঞ্জাবতী এইরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াই লাউসেনের মত সুপুত্র লাভ করিযাছিলেন। কিন্তু ধর্মভক্তগণ চিরপ্রিয় শিবঠাকুরকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই, ধর্মঠাকুরের ঠিক নিম্নেই তাঁহাকে স্থান দিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের একজন প্রধান ভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। শিবঠাকুরের এরূপ পরিবর্ত্তন অনেকবার হইয়াছে। যখন এদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন শিবও পরম বৈষ্ণব হইয়া পঞ্চমুখে হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক শিব যে প্রাচীনকালে শস্যদাতারূপে কৃষকদের দেবতা ছিলেন, তাহা শূন্যপুরাণেও একভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে শিবঠাকুর শস্যোৎপাদক কৃষকরূপে দেখা দিয়াছেন।

ধর্মোৎসব শিবোৎসবেরই রূপান্তরমাত্র

ধর্মান্তর গ্রহণের সহিত এরূপভাবে প্রাচীন উৎসব ও দেবতাকে অদল-বদল করিয়া নিজের করিয়া লওয়া অবশ্য নূতন কথা নহে। খ্রীষ্টানদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমরাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহি। বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হইলে আমরা অনেক বৌদ্ধবিগ্রহ ও উৎসব হিন্দু করিয়া লইয়াছি। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের স্থান এখন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা অধিকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ রথোৎসব জগন্নাথের রথযাত্রারূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ রথোৎসবটি ছিল একটি প্রাচীনতর সৌর উৎসবের প্রতিরূপ। নববর্ষারম্ভে সূর্য্যদেবের বিজয়যাত্রাই ছিল এই উৎসবের ভিত্তি।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে হইয়া থাকে। এই সময় কর্কট-ক্রান্তি হইতে সূর্য্যদেবের দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হয়। এককালে কোন কোন স্থানে ঐ সময় নববর্ষারম্ভ করা হইত। গুজরাটের অনেক স্থানে এখনও বিক্রমসংবতের নববর্ষ আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হয়। বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি-ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্য্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং ইহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম 'যাত্রা' হইয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কেবল সূর্য্য নয়, তাহার সহিত চন্দ্রের গতি অর্থাৎ তিথির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও উৎসবের দিন স্থির করা হইত। এই কারণে, সূর্য্য ও চন্দ্র চলিতে চলিতে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইত, অর্থাৎ যেদিন পূর্ণিমা হইত, সেদিন একটা বিশেষ উৎসবের দিন বলিয়া বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ যখন কোন আনন্দজনক ঋতুতে পূর্ণিমা সংঘটিত হইত তখন সেই উৎসবের ঘটা স্বতঃই বাড়িয়া যাইত, যথা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি। বৈষ্ণবযুগে এই সকল যাত্রা বা উৎসবের দেবতা হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ।

সৌর উৎসবের নানা রূপান্তর

সূর্য্যদেব অতি প্রাচীনকালে শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হইলেও তাহার স্মৃতি এখনও কয়েকটি প্রাচীন গাথায় রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে বরিশাল হইতে প্রাপ্ত একটি গান বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এটি সূর্য্যঠাকুরের লীলাবিষয়ক একটি ছোট পালাগান। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার মূল যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে নানা পরিবর্তনের ফলে যে ইহা বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রাচীন পুঁথি ও পালা-গান মাত্রেরই অল্পবিস্তর এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। যখন যাঁহার হাতে কোন পুঁথি পড়িয়াছে তখনই তিনি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্মমত অনুসারে তাহা পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা বলা যাইতে পারে। আজ যদি কৃত্তিবাস ফিরিয়া আসেন, তাহা

সূর্য্যমঙ্গল গান

হইলে তিনি তাঁহার রামায়ণখানি চিনিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া ইহার ভাষা বারবার পরিমার্জিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদের হাতে পড়িয়া ইহার সর্বাঙ্গ হরিনামের ছাপে ভরিয়া গিয়াছে। রামাই পণ্ডিতের যে পুঁথি আমরা পাইয়াছি তাহাতে মুসলমান আক্রমণের কথা পর্যন্ত দেখা যায়। ইহা যে আদি শূন্য-পুরাণ রচিত হইবার বহু শতাব্দী পরে যোজিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং কেবল ভাষা ও ঘটনাবিশেষের উল্লেখ দেখিয়া কোন প্রাচীন কাব্যের কাল নির্ণয় করা নিরাপদ নয়। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যার অল্পতাবশতঃ অনেক পরিবর্তক পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে সেই সকল কাব্য খিচুড়ি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপস্থলে পরিবর্তকদের কীর্তি সহজেই ধরা পড়ে। যে পালাগানটির কথা বলিতেছি সেটিও একেবারে 'জগাখিচুড়ি'। ইহার নায়ক সূর্য্যদেব গানের আরম্ভে নিজরূপেই দেখা দিয়াছেন, কিন্তু কিছু পরে তিনি সহসা শিবঠাকুর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে "ষোলশত গোপিনী" আসিয়া তাঁহার সহচরী হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় যে, একটি প্রাচীন সূর্য্যমঙ্গল গানকে পরবর্তীকালে নানা সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া লওয়ার ফলেই গানটি এইরূপ অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার ভাষাও বদলাইয়া গিয়াছে।

গানটির আরম্ভ এইরূপ —

"সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে আগুন বর্ণ॥
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে রক্ত বর্ণ॥
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে তাম্বুল বর্ণ।

পূর্বে বলিয়াছি, শিব নামটি প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে ও তাহার মৌলিক অর্থ রক্তবর্ণ। বস্তুতঃ প্রথমে প্রাতঃ-সূর্য্যের বর্ণানুসারেই শিবের বর্ণ কল্পিত হইয়াছিল, পরে তিনি ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় 'রজতগিরিনিভ' হইয়া দাঁড়া'ন। এই জন্যই বোধ হয় শিবকুমার গণপতির বর্ণ রক্তবর্ণ হইলেও স্বয়ং শিব শ্বেতবর্ণরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই গানেও ঠাকুর প্রথমে 'জবাকুসুমসঙ্কাশ-ধ্বান্তারি'রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন এবং তিনি যে 'উদয় দিয়া' অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে "বাওনে"র, "কাঁসারী"র, "মালী"র, "মুনি"র ও "তেলি"র ঘরের কোণ ছুঁইয়া উঠেন ও "বাওনের মাইয়া," "কাঁসারীর মাইয়া," "মালীর মাইয়া," "মুনির মাইয়া" ও "তেলির মাইয়া" তাঁহাকে যথাক্রমে পৈতা, পূজার সাজ, পুষ্প, সন্ধ্যাপূজার উপকরণ ও 'মুখপাখলানী জল' জোগায় কবি তাহাও আমাদিগকে সবিস্তারে জানাইয়া দিয়াছেন। সূর্য্যঠাকুরের এই বর্ণনার পর কবি তাহার নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন—

"উত্তর আলা কদমগাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে ॥
... ... ... ... ... ...
কাঁসা বাজে করতাল বাজে তবু সূর্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গেরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে ॥"

যাহা হউক, এত হাঙ্গামার পর অবশেষে 'ছাওয়াল সূর্যাই'র নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি 'দুগ্ধের পুষ্করণী'তে স্নান করিলেন। ধুতি গামছার কথা ভাবিতে হইল না, কারণ 'স্বর্গে আছে তাঁতীর ছাওয়াল, সূর্যাইর ধুতি গামছা জোগায় সেও রে।' তাহার পর সূর্যাই পূজা খাইলেন— সেজন্য মণ মণ চাউল, চড়াভরা কলা প্রভৃতি দিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপর জলপানের ব্যবস্থা—

"পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্যাই জলপান কল্লা কি ?
হাল্যা বাড়ীর দুগ্ধ দধি গোয়াল বাড়ীর ঘি ॥"

ইহার পর সূর্যাই ঠাকুরের নৌকা-যাত্রা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে দুই কানে ধুতুরা।
ষোলশত গোপিনী লয়ে চলিছে মথুরা॥"

এইরূপে সহসা সূর্যাই ঠাকুর কেবল 'শিবাই'রূপ ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু কোথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের 'ষোলশত গোপিনী' আসিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত নিষ্ঠুর না হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় চলিলেন! তারপর নদী পার হইয়া সূর্যাই ঠাকুর যে দিকে 'সূর্যাই মঙ্গল' গান হইতেছিল সেই দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে দেখিয়া—

"সূর্যাই আইল শিবাই আইল পড্যা গেল সাড়া।
সাযবানা টানাইয়া তারা রৈল কদমতলা।"

এইরূপে কবি অতি সহজে সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া ফেলিলেন!

তাহার পর 'চাওয়াল সূর্যাই' যখন 'ডাঙ্গর' হইলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কবিও সূর্যাইর মাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন,—"ওগো সূর্যাইর মা, তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাওনা।" সুতরাং স্বর্গ হইতে ঘটক আসিলেন এবং তিনি যেভাবে "চন্দ্রমুখা" কন্যার রূপ বর্ণনা করিলেন তাহাতে বিবাহ স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল না। কন্যা অবশ্য আর কেহই নন—স্বয়ং গৌরী। ইহার পর সূর্যাই বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহার পূর্বে, শ্বশুর গৃহে গিয়া তাঁহার কিরূপ আচরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা উপদেশ দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে একটি অমূল্য উপদেশ এই—"শালীরা যে পান দিবে কাপড়ে মুছ্যা খাইও।" ওদিকে গৌরীকে প্রস্তুত হইতে বলা হইল,—

সূর্য্যমঙ্গল গানের মধ্যে নাটকীয় উপাদান

"ও গৌরী না গিয়া। পান্তাভাত খা গিয়া॥
পান্তাভাত শলা শলা। পুঁড়িমাছ চলা চলা॥"

যাহা হউক সূর্য্যাই অবিলম্বে বরবেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেকালের বিবাহ—তখন বরপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হইত। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ গৌরীর মায়ের হাতে হাজার টাকা গণিয়া দিলেন. কিন্তু তাহার ফলে এক বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল—

"গৌরীর মায় কাঁদে কাটে। হাজার টাকা গাইটে বাঁধে॥"

তাহার পর কন্যা-বিদায়ের পালা। গৌরী তখন বালিকামাত্র, সুতরাং দৃশ্যটা খুব করুণ হইয়া উঠিল। কেবল যে কন্যা কাঁদিলেন তাহা নয়, পরন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়সী যে যেখানে ছিলেন সকলে ক্রন্দনের বোল তুলিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে—

"গৌরীর জনক কাদে গামছা মুড়ি দিয়া।
গৌরীর যে ভাই কাঁদে খেলার সাজি লইয়া।
গৌরীর যে মায় কাঁদে শানে পাছার খাইয়া॥"

এত কান্নাকাটি দেখিয়া গৌরীর মনে আশা হইল যে, এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাঁহার বাপ-মা তাঁহাকে বিদায় দিতে আপত্তি করিবেন, তাই তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাওধন বাপধন তোমরা নি রাখ্‌বা মোরে?" কিন্তু তাহার উত্তরে গৌরীর মাতাপিতা যাহা বলিলেন তাহার উপর আর কথা চলেনা—

"সভার মধ্যে লইছি টাকা কেমনে রাখ্‌ব তোরে?"

এত লোকের সম্মুখে আইনসঙ্গত চুক্তি—'না' বলিবার উপায় নাই—সুতরাং গৌরীকে সূর্য্যাইর সহিত নৌকায় উঠিতে হইল। কিন্তু মাতা ও ভ্রাতাভগিনীর সহিত বিচ্ছেদের দুঃখ তাঁহার বুকের মধ্যে গুমরাইতে লাগিল—নৌকা চলিবার সময়েও যেন তিনি তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাই তিনি অনবরত মাঝিকে ধীরে ধীরে বাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—"ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই মায়ের কাঁদন শুনি," "ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই ভাইয়ের কাঁদন

শুনি" ইত্যাদি। এ অবস্থায় অবশ্য সূর্য্যাই তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—বলিলেন, 'তোমার কোন ভাবনা নাই, তোমার সকল অভাব আমি মোচন করিব।' তখন গৌরী তাঁহার যে সকল অভাব হওয়া সম্ভব তাহা একে একে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সূর্য্যাইও সেইগুলি কি ভাবে পূরণ করিবেন তাহা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। নবদম্পতির এই কথোপকথনটি বেশ কৌতুকাবহ। মঙ্গলগীতি বা পালা-গানের মধ্যে এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়াই নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেইজন্য তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর

"গৌরী।—তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু।
সূর্য্যাই।—নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু।
গৌরী।—তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
সূর্য্যাই।—নগরে নগরে আমি শাঁখারি বসামু।
গৌরী।—তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি সিন্দূরে দুঃখ পামু।
সূর্য্যাই।—নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু।

... ... ... ... ... ...

গৌরী।—তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি মা বলিমু কারে?
সূর্য্যাই।—আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে।
গৌরী।—তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি বাপ বলিমু কারে?
সূর্য্যাই।—আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে।" ইত্যাদি।

আশা করি, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই সকল প্রাচীন মঙ্গলগীতির মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব থাকুক, নাটকত্বের অভাব ছিল না। এগুলির বিশেষত্ব এই যে, গ্রাম্য কবিগণ এগুলিতে দেবলীলা বর্ণনচ্ছলে নিজ নিজ সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। এই সূর্য্যমঙ্গলগীতিতে যে সমাজ বর্ণিত হইয়াছে তাহা কোন কাল্পনিক দেবসমাজ নয়, পরন্তু ইহা সেকালের কৃষকসমাজের একটি জীবন্ত

চিত্র। নামে দেবদেবী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্যাই বা শিবাই চাষার ছেলে ও গৌরী চাষার মেয়ে এবং সে কালের সাধারণ চাষার ঘরের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাই এই গীতিকার যথার্থ বিষয়বস্তু। বস্তুতঃ এই ধরণের লোকসঙ্গীতগুলি দেবতাকে সুখদুঃখভোগী সাধারণ মানুষরূপে বর্ণনা করার ফলেই এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ মানবজীবন যে ভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে অলৌকিক দেবলীলার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। এরূপ বিস্ময়কর লীলা আমাদের মনে ভক্তি বা ভয় উৎপাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সাধারণ মানবজীবন চিত্রে আমরা আমাদের জীবন প্রতিফলিত দেখি, অঙ্কিত চরিত্রগুলির বেদনা আমরা নিজের বেদনারূপে অনুভব করি। সেইজন্য সাধারণ মানবজীবনই নাটকের প্রকৃত উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়, অলোকসাধারণ দেবলীলা নয়। দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দ্দিনী গৌরীকে আমরা ভয় করি, ভক্তি করি, পূজা করি, কিন্তু শাঁখাশাড়ীপরিহিতা নিরাভরণা বাংলার পল্লিবধূ গৌরীর সরল স্নেহপূর্ণ হৃদয় আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। আমাদের কবিরা ইহা বুঝিতেন বলিয়াই সর্বত্র তাঁহারা দেবতাকে আমাদের ভিতর টানিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে সুখদুঃখভরা মানবমূর্তিতে দেখাইয়াছেন—ফলে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সব এক হইয়া আমাদের ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিকতার এইরূপ অপূর্ব সমন্বয়সাধন করিয়াই জনসাধারণের হৃদয়ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই শ্রেণীর গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য—দেবলীলা বর্ণনচ্ছলে কবির স্বসমাজের চিত্র অঙ্কন

এই সূর্য্যমঙ্গল গানের মত ছোটবড় অসংখ্য গান রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল পল্লিগীতি অবলম্বন করিয়া পরে অনেকগুলি বৃহত্তর মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অষ্টাদশ

শতাব্দীতে লিখিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিন্দুব্রাহ্মণ হইয়াও শিবকে কৃষক বেশে সাজাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই বোঝা যায় যে, প্রাচীন পল্লিগীতিকেই তিনি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে কায়স্থ কবি রামকৃষ্ণদেব যে বৃহৎ শিবায়ন কাব্য রচনা করেন, তাহা বিবিধ সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং গ্রাম্যকৃষকরূপী শিব তাহাতে স্থান পান নাই। রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, ফলে সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত মহত্তর শিবচরিত্রই তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই-রূপে বাংলার গীতিকাব্য একদিকে নিজস্ব পল্লিগাথাসমূহ হইতে, অন্যদিকে সংস্কৃত পুরাণ ইতিহাস ও কাব্যাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই উভয় উৎসই নাটকায় চরিত্র ও ঘটনায় যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ।

পল্লিগীতি বৃহত্তর মঙ্গল-কাব্যের জনক

শিবায়ন

মধ্যযুগের গীতিকাব্যের উপাদান

বলিয়াছি, শিব ও কুমারের পূজার সহিত শক্তি-পূজাও অতি-প্রাচীন-কাল হইতে প্রচলিত। দেশকালভেদে বিভিন্ন নামে ও রূপে মাতৃদেবী আবহমানকাল হইতে জগতের সর্বত্র পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশেও শক্তি-পূজা খুব প্রাচীন, কিন্তু এ পূজার প্রভাব ও প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগে। ফলে পল্লিতে পল্লিতে মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতি দেবীর পূজার প্রচলন হয় ও তাঁহাদের মহিমা কীর্তন করিয়া মঙ্গলগীতিসমূহ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু শৈবধর্মের প্রতিপত্তি যে তখনও যথেষ্ট ছিল, তাহা এই মঙ্গলগীতিগুলি পড়িলে বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগে অবশ্য ধর্মঠাকুরের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহার উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ছড়া ও গানগুলি

শক্তি-পূজা হইতে বিবিধ মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি

ধর্ম-মঙ্গল

অবলম্বন করিয়া বহু ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন গোরক্ষ-নাথ প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিশালী বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীদের ও তাঁহাদের 'মহাজ্ঞান'সম্পন্ন শিষ্যশিষ্যাদের মহিমা কীর্তন করিয়া অনেকগুলি কাহিনী ও গান রচিত হইয়াছিল। এই সকল গীতিকাব্যের মধ্যে বঙ্গের রাজা মাণিকচন্দ্র ও তাঁহার মহিষী ময়নামতী ও তাঁহাদের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ও ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গান

মাণিকচন্দ্র সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী ময়নামতী ছিলেন মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা—সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্না হইয়াছিলেন যে তিনি "তুড়ু তুড়ু করিয়া হুঙ্কার" ছাড়িলে তেত্রিশ কোটি দেবতা মায় রামলক্ষ্মণ পঞ্চপাণ্ডব মুনিঋষিগণকে পর্য্যন্ত স্বর্গ ছাড়িয়া নামিয়া আসিতে হইত! সাবিত্রী যমকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহার মৃতস্বামীকে ত্যাগ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ময়নামতী সেজন্য 'গোদা' যমের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করিয়া তাঁহাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিলেন। ময়নামতীর গানেও চিরপ্রথামত শিবঠাকুর দেখা দিয়াছেন এবং এখানেও তাঁহার স্থান ধর্মঠাকুরের ঠিক নিম্নে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত ময়নামতীকে ভয় করিয়া চলিতেন! তিনি তখনও কৃষকদের অভিভাবক ছিলেন এবং যখন মাণিকচন্দ্রের "বাঙ্গাল" মন্ত্রী কৃষক প্রজাদের উপর ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গণ্ডা।
লাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥"

তখন কৃষকেরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের প্রধানের পরামর্শ মত তাঁহারই নিকট গিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিল। শিবঠাকুর তাহাদিগকে

আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, আর ছয়মাসকাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিলেই তাহাদের বিপদ কাটিয়া যাইবে, কারণ তাহার অধিক রাজার পরমায়ু ছিলনা। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যেন তাহারা ময়নামতীকে সে কথা না শুনায়, কারণ তাহা হইলে সে "কৈলাস ভুবন মোর কৈর্বে লণ্ড ভণ্ড।"

সাধারণ গীতিকবিতাগুলির তুলনায় ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানের ন্যায় জনপ্রিয় প্রাচীন গাথাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মানুষকে দেবতা অপেক্ষাও শক্তিশালী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মানুষ সাধনা করিলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে ইহাই প্রদর্শন করা এ সকল গানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এরূপ চরিত্র যে নাটকীয় চরিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; তদ্ভিন্ন এই সকল গানে প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যেও নাটকের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া যে কেবল পালাগান নয়, অনেকগুলি নাটকও রচিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, নেপাল হইতে যে সকল পুরাতন বাংলা নাটক সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে একখানি হইতেছে 'গোপীচন্দ্র নাটক'। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিও এইরূপ নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রে পরিপূর্ণ। এই সকল কাব্যের চাঁদসদাগর, বেহুলা, কালকেতু, খুল্লনা, শ্রীমন্ত, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি চরিত্র বহু নাট্যকারের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই সকল কাহিনী ব্যতীত মধ্যযুগের বাঙালী কবি ও নাট্যকারগণকে উপাদান যোগাইয়াছিল—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবিধ পুরাণ-গ্রন্থ। এগুলি হিন্দুদের চির আদরের ধন—কবি ও নাট্যকারগণের অক্ষয় ভাণ্ডার। ইহাদের সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তা

গোপীচন্দ্র নাটক

কিন্তু সেকালের বাঙালী হিন্দু-কবিদের রচিত কাব্য নাটকাদির ভাণ্ডারে একটা মস্ত অভাব ছিল। এই সকল কবি দেবতাকে বাদ দিয়া কোন কাব্য লিখিতেন না, কারণ যে কাব্যে দেবতার কথা

না থাকিত তাহা তখনকার হিন্দুজনসাধারণের মনঃপূত হইত না। এমন কি, এই কারণে বিদ্যাসুন্দরের মত নিছক নরনারীর প্রেমকাহিনীর মধ্যেও দেবতাকে টানিয়া আনা হইয়াছিল। এ দেশের প্রাচীন রূপ-কথাগুলির ভিতর গীতিকাব্য বা নাটকের উপাদানের অভাব ছিল না, কিন্তু সেগুলির সহিত দেবতার সম্পর্ক ছিলনা বলিয়াই বোধ হয় কবি ও নাট্যকারেরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবি

সুখের বিষয়, মধ্যযুগে বাংলায় অনেকগুলি মুসলমান কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা 'রোমাণ্টিক' ঘটনা ও প্রেমকাহিনী লইয়া অনেকগুলি গীতিকাব্য বা পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির সহিত দেবতার সম্পর্ক ছিল না।

দৌলত কাজি ও আলাওল

এই সকল কবির মধ্যে কয়েকজন খুব পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে দৌলত কাজি ও আলাওলের নাম সমধিক বিখ্যাত। এই উভয় কবিই সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দুইজনেই সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের কাব্যগুলি অতি সুন্দর মার্জিত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। যথা, কবি আলাওলের শরৎবর্ণনা—

"আসিল শরৎ ঋতু নির্মল আকাশে।
দোলায় চামর কেশ কুসুম বিকাশে॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড হি কৌতুক।
উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥" ইত্যাদি

দৌলত কাজি তাঁহার নায়িকার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ॥
কাঞ্চন কমল মুখে পূর্ণশশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে॥

চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্কশরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে॥" ইত্যাদি

দৌলত কাজি তাঁহার কাব্যে অনেক পদ ব্রজবুলিতেও লিখিয়াছিলেন। তাহার একটি নমুনা—

"শাওন গগনে সঘনে ঝরে নীর।
তঞি আহুন জুরাএ এ তাপ শরীর॥
মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনু বাসহি বিহি ভেল মোর॥
মদন আসক জিনি বিজুরীর রেহ।
থরকায় রজনী কম্পএ দেহ॥
ন বোল ন বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল॥" ইত্যাদি

আরাকানে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবি কর্তৃক এরূপ ভাষায় রচনা বাস্তবিক বিস্ময়কর। কেবল ভাষার মনোহারিত্বে নয়, দৌলত কাজির "লোরচন্দ্রানী" ও "সতীময়না" এবং আলাওলের "পদ্মাবতী" কবিত্বেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

এই সকল পণ্ডিত-কবি ব্যতীত, পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান পল্লিকবি রাশি রাশি পালাগান রচনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য পালাগানের মধ্যে যেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে "মাণিকতারা", "মাঞ্জুর মা", "কাফনচোরা বা মনসুর ডাকাত", "ভেলুয়া", "নিজাম ডাকাত", "দেওয়ান ফিরোজ শাহ", "আয়না বিবি", "নূরন্নেহা", "দেওয়ানা মদিনা", "সোনাবিবি", "মাছুম খাঁ পল্টন" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যো ও নাটকীয় ভাব-সম্পদে জগতের পল্লিগাথাসমূহের মধ্যে ইহাদের স্থান শিখরদেশে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর

মুসলমান কবি-রচিত পল্লিগীতিকাসমূহ নাটকীয় ভাব-সম্পদে পূর্ণ, কিন্তু দেবতার কথা না থাকাতে সেকালের হিন্দুগণ কর্তৃক উপেক্ষিত

ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ ও হৃদগত প্রগাঢ়-ভাবের স্ফুরণ প্রভৃতি যদি শ্রেষ্ঠ-নাটকের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই সকল পল্লিগাথা যে প্রথমশ্রেণীর নাটকের উপাদানে পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "কাফনচোরা" নামক পালাগানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রেম অপূর্ব স্পর্শমণি—তাহার স্পর্শে কেমন করিয়া লোহা সোনা হইয়া যায়—পশু দেবতায় পরিণত হয়—তাহা এই পল্লিগীতিকায় অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গীতিকার নায়ক মনসুর ছিল তাহার পিতা লুধা গাজির ন্যায়ই ঘোর অত্যাচারী দুর্দান্ত দস্যু—তাহার নির্মম হৃদয়ে দয়া মায়া স্নেহ প্রভৃতি কোমলবৃত্তির লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পাষাণ গলিল—আয়রা-বিবিকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল তাহা নানা নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বর্ধিত হইয়া অবশেষে তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং এইরূপে এক ঘোর নৃশংস নারকী দস্যু দেবোপম সাধুপুরুষে পরিণত হইল! এরূপ বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনা সংবলিত উপাখ্যান যে নাটকের উৎকৃষ্ট উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পালাগানে ব্রাহ্মণ ও ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তির কথা না থাকাতে এবং সাধারণতঃ ইতরজাতীয় নায়কদের প্রসঙ্গ ও স্বাধীন-প্রেমের কাহিনী থাকাতে সেকালের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট এগুলি সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। ফলে এগুলি পূর্ববঙ্গের মুসলমান পল্লিসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এইরূপে আমাদের অন্ধসংস্কারজনিত অবহেলার ফলে কতকগুলি উৎকৃষ্ট রোমান্টিক ও পারিবারিক নাটকের উপাদান মুকুল-অবস্থাতেই বহিয়া গিয়াছে, প্রস্ফুটিত হইবার অবসর পায় নাই। বলিতে কি, আমার মনে হয়, সেই সময়ের কোন প্রতিভাবান্ নাট্যকার যদি এই সকল উপাদান লইয়া নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিতেন তাহা হইলে হয়ত সেকালে আমাদের মধ্যেও একজন সেক্সপিয়ারের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম। রসানুভাবকতায় বা নাট্যকলাজ্ঞানে ষোড়শ-শতাব্দীর বাঙালীরা যে তৎকালীন ইংরেজদের অপেক্ষা হীন

ছিলেননা তাহা প্রমাণ করা দুরূহ নহে। যাহা হউক বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, অনেক হিন্দু-পল্লিগাথারও রচয়িতা ও গায়ক উভয়েই মুসলমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন হিন্দুকবিদের দ্বারা রচিত পালাগানের গায়েনদের মধ্যেও অনেক মুসলমান ছিল এবং এখনও আছে। এমন কি 'মহুয়া' প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুকবিরচিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গাথা এই মুসলমান গায়কদের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে পালা-গান যাত্রা-গানে পরিণত হইয়াছিল। যাত্রাগান সৃষ্টির পূর্বে বাংলা রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি কাব্য এবং মঙ্গলকাব্য ও পালাগানসমূহ পাঁচালী-ছন্দে রচিত হইয়া গীত হইত। পাঁচালী-গানের পাঁচটি অঙ্গ ছিল, বোধ হয় সেইজন্য ইহার নাম পঞ্চালী বা পাঁচালী হইয়াছিল। পাঁচটি অঙ্গ এই—(১) পা চালী অর্থাৎ পাদ-চালনাপূর্বক ঘুরিয়া ফিরিয়া পদ-গান। (২) ভাবকালি অর্থাৎ হাবভাব সুরসহ পদের ব্যাখ্যা। (৩) নাচাড়ি অর্থাৎ নৃত্য করিতে করিতে নাচাড়ি-ছন্দে রচিত পদ্যের আবৃত্তি ও গান। (৪) বৈঠকী অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া উচ্চদরের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতালাপ। (৫) দাঁড়া-কবি অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া দলের সমস্ত লোকের সমবেত-সঙ্গীত। প্রথমে শেষের অঙ্গটি ভিন্ন আর চারিটি অঙ্গের কার্য্যই মূলগায়ককে একা সম্পন্ন করিতে হইত। কিন্তু কেবল ছোট পালাগানেই এ কার্য্য সম্ভব হইত। পরে পালাগানের দৈর্ঘ্য যখন ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল, তখন একজনের পক্ষে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা কঠিন হইয়া পড়িল। ফলে মূলগায়ক বা অধিকারী মহাশয় তাঁহার সহযোগী-গায়কদের উপর কোন কোন কার্য্যের ভার দিতে বাধ্য হইলেন। 'পা-চালী'-অংশে তিনি সহজেই নিজভার লাঘব করিলেন। সমস্ত আসরের চতুর্দিকে নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া না গাহিয়া, তিনি তাঁহার সহকারীদের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং একস্থানে দাঁড়াইয়া

পাঁচালী গানের পঞ্চ অঙ্গ

পাঁচালী-গানের ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রা-গানের উৎপত্তি

তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে জুড়িগানের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ 'নাচাড়ি'-অংশও নৃত্যগীতকুশল অন্য গায়কদের দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল। দলে তেমন সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক থাকিলে 'বৈঠকী'-গানও তাঁহার দ্বারা মাঝে মাঝে গাওয়ান হইতে লাগিল। বাকী রহিল, 'ভাবকালি'। বলা বাহুল্য, এই অংশই ছিল প্রধান অংশ, অন্য অংশগুলি ছিল ইহার আনুষঙ্গিক। এই অংশ সর্বাপেক্ষা দুরূহও ছিল, কারণ এই অংশে গায়ককে কথকঠাকুরের ন্যায় এক সঙ্গে অভিনেতা, ব্যাখ্যাতা ও গায়কের কার্য্য করিতে হইত। এ কার্য্যের ভার অধিকারী মহাশয় সহজে অন্যকে দিতে পারিতেন না, কারণ একটি দলের মধ্যে একাধারে এই ত্রিবিধ-গুণবিশিষ্ট লোক অধিক থাকার সম্ভাবনা ছিল না। অধিকারীর সমকক্ষ কোন গুণী ব্যক্তিকে রাখাও সকল সময়ে নিরাপদ ছিলনা, কারণ স্বতন্ত্রদল বাঁধিবার দিকে এরূপ লোকের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাইত। অথচ একই লোকের দ্বারা বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয় প্রায়ই বিরক্তিজনক হইয়া থাকে। ক্রমাগত সুর-পরিবর্তন করিয়া গাহিলেও তাহা দীর্ঘকাল সহ্য যায় না। ফলে পালাগানের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির সহিত এই সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অধিকারী মহাশয়ের মাঝে মাঝে বিশ্রাম-লাভেরও প্রয়োজন ছিল। এইজন্য তিনি গানের উক্তি-প্রত্যুক্তির অংশে অনেক সময়ে একজন সহকারী গায়কের সাহায্য লইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বোক্ত সূর্য্যমঙ্গল গানের সূর্য্যাই ও গৌরীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থানটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মূলগায়ক সূর্য্যাইএর ভূমিকা এবং আর একজন গায়ক গৌরীর ভূমিকা লইলে এই অংশটি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়, মূলগায়কের কষ্টেরও লাঘব হয়। এইরূপ সুবিধার জন্যই প্রথমে একজন অভিনেতার স্থানে দুইজন অভিনেতার প্রবর্তন হয় এবং পরে বিভিন্ন-প্রকৃতির ভূমিকার সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। পূর্বে বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ হইয়াছিল।

এইরূপে অভিনেতা-বৃদ্ধির সহিত পালা-গান ক্রমশঃ যাত্রা-গানে পরিণত হইয়াছিল এবং গেয-কাব্য নাটকের রূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রথমে এই নাটকগুলি ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন গীতিনাট্য ছিল অর্থাৎ উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্তই গানে চলিত। গিরিশচন্দ্রের 'ব্রজবিহার' নাটক এই প্রকার নাটকের একটি বর্তমান উদাহরণ। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ অবিমিশ্র গানের প্রবাহ সাধারণের রুচিকর হইতনা এবং নাটকের কাহিনীটি পরিচিত না হইলে তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতনা। সেইজন্য গীতিনাট্যের মধ্যে পরে গদ্যপদ্যময় কথোপকথন এবং নাটকীয় ক্রিয়াদি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল এবং এইরূপে ক্রমশঃ যাত্রায় অভিনীত গীতি-নাট্যগুলি প্রায় বর্তমান নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে আর একটি সুবিধা হইয়াছিল। পূর্বে গায়ক ভিন্ন কেহ অভিনেতা হইতে পারিতনা, কিন্তু সুরবিহীন কথোপকথনাংশ প্রবর্তনের পর অনেক সুযোগ্য অথচ সঙ্গীতানভিজ্ঞ অভিনেতা নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার অবসর পাইয়াছিল এবং তাহার ফলে নাট্যকলার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। লোকেরাও এই পরিবর্তন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হেতু সংলাপের অংশ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়াছিল এবং নাটকীয় ক্রিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি, শেষে দীর্ঘচ্ছন্দে বক্তৃতা, লম্ফ-ঝম্প, আস্ফালন, যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার যাত্রাগানের একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার জন্য অবশ্য যাত্রাওয়ালাদিগকে দায়ী করা যায় না, কারণ দর্শকেরা যাহা চাহিত তাহা তাহাদিগকে দিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন।

প্রথমে নিরবচ্ছিন্ন গীতিনাট্য

পরে গদ্যপদ্যময় কথোপকথন ও নাটকীয় ক্রিয়ার সমাবেশের ফলে নাটকের বর্তমান রূপ গ্রহণ

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ যে এইভাবে হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় নেপাল হইতে সংগৃহীত বাংলা নাটকগুলি হইতে। এই সকল নাটকের যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশে গান ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহার কারণ, এগুলির

মধ্যে যে সামান্য গদ্যাংশ ছিল তাহা অভিনেতাদের মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হইত না, তাহারা প্রয়োজনমত মুখে মুখে সে সকল কথা বলিত। কিন্তু গানগুলি মুখস্থ করা ছাড়া উপায় ছিলনা, সুতরাং সেগুলি লিখিয়া রাখা হইত। কিন্তু ক্রমে যখন গদ্যাংশ বাড়িয়া গেল তখন তাহাও লেখা হইতে লাগিল। পূর্বোল্লিখিত 'গোপীচন্দ্র' নাটকখানি এইরূপ নাটক, ইহাতে গদ্যাংশ অনেকটা আছে। এই নাটকটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। নেপালের এই সকল নাটক সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই নাট্যকারেরা সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের 'মিস্টারি' ও 'মিরাক্‌ল্‌' নাটকের ন্যায় এই সকল বিপুলায়তন নাটক কয়েকদিন ধরিয়া অভিনীত হইত। বস্তুতঃ বাঙালী নাট্যকারেরা দীর্ঘ পালা-গানকে নাটকাকারে পরিবর্তিত করিবার কৌশল বেশ জানিতেন এবং গদ্যপদ্য উভয়বিধ রচনাই তাহারা তাহাদের নাটকমধ্যে ব্যবহার করিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে বর্তমানকালের নাটক অভিনবত্ব দাবী করিতে পারেনা। কিন্তু ইউরোপীয় নাটকে যেমন সঙ্গীতাংশ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাদের নাটকে তেমন হয় নাই। যাত্রার নাটকে ঘটনা ও বক্তৃতার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহা গীতপ্রধান রহিয়া গিয়াছিল, কারণ এ দেশের দর্শকগণের সঙ্গীতপ্রিয়তা একেবারে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। যাত্রাওয়ালাদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিচারকালে প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল, "কেমন তারা গায়?"—অভিনয়াদির কথা পরে হইত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবযুগে যখন মধুর-রসে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা 'কানুর-গানে'র জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের নাটকের ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর নেপাল হইতে সংগৃহীত বাংলা নাটকসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়

'মিস্টারি' ও 'মিরাক্‌ল্‌' নাটকে দেবলীলা-প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন হাস্যরসাত্মকাদি চরিত্র সৃষ্টি করা হইত, আমাদের যাত্রার নাটকেও অবশ্য সেইরূপ করা হইত। 'মিস্টারি' নাটকের হেরোদ ও আমাদের

কৃষ্ণযাত্রার কংস সম্পূর্ণ একজাতীয় ছিলেন এবং উভয়েই কর্ণপটহভেদী হুঙ্কার ও গর্জন করিতে সমান পটু ছিলেন। জটিলা কুটিলা কুব্জা রজক প্রভৃতি নূহের স্ত্রী ও মেষপালকগণের ন্যায় দর্শকবৃন্দের মধ্যে হাস্যের তরঙ্গ বহাইত। 'মর‍্যালিটি' নাটকের সপুচ্ছ শয়তান ও তাহার অনুচরেরা এবং রামযাত্রার সপুচ্ছ হনুমান ও বানরেরা বিপরীত-প্রকৃতির ব্যক্তি হইলেও একই রীতিতে অর্থাৎ লম্ফঝম্প মুখভঙ্গী করিয়া দর্শকগণের আনন্দবর্ধন করিত। এতদ্ভিন্ন ইয়ুরোপের 'ইণ্টারলিউড্' নাটিকার ন্যায় যাত্রাভিনয়ের মধ্যে সঙ্ দিয়া সেগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইত। এই সকল সঙের সাহায্যে অনেক সময়ে যে সমস্ত সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইত সেগুলি ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরে প্রহসনাদির সৃষ্টি হয়। আদ্যের গম্ভীরা প্রভৃতি যে সকল উৎসব বর্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন শিবোৎসবের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, অভিনেতারা কেবল ভূতপ্রেত হনুমান প্রভৃতি সাজিয়া দর্শকগণকে আনন্দদান করে না, পরন্তু সাময়িক ব্যাপার লইয়া কিংবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক দোষ সমালোচনা করিয়া তাহারা সঙ্গীতাদি রচনা ও অভিনয় করে। বলা বাহুল্য, এই সকল ব্যঙ্গাত্মক গান ও অভিনয় সাধারণ দর্শকবৃন্দের যেরূপ উপভোগ্য হয়, এরূপ বোধ হয় উৎসবের আর কোন অংশ হয় না।

হাস্যরসাত্মক চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি

বস্তুতঃ এ বিষয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আদিম বৃত্তিটি অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। কেবল পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহা সূক্ষ্ম-শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ফলে সর্বদেশে সর্বকালে আরিস্তোফানেস আবির্ভূত হইয়াছেন এবং লোকের আন্তরিক সমাদর লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে কবি, তরজাওয়ালা প্রভৃতি এই কারণেই এত জনপ্রিয়তা লাভ

প্রহসনজাতীয় লঘু নাটকের জনপ্রিয়তা চিরন্তন ও সার্বদেশিক

করিয়াছিল। আমাদের এই মনোভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গদের রায়বার দৃশ্যটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামলক্ষ্মণের চোখা চোখা অসংখ্য বাণ ছিল, তাঁহাদের কপিসৈন্যও গাছ পাথর প্রভৃতি বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত ছিল। কিন্তু কবি দেখিলেন, সাধারণের চক্ষে রাবণকে বধ করিতে হইলে এ সকল অস্ত্রে কুলাইবে না। তাই তিনি অঙ্গদের দৌত্যের সুযোগে রাবণের প্রতি 'গালাগালি' অস্ত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। অঙ্গদ গিয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বানরোচিতভাবে 'বাপান্তের চূড়ান্ত' করিয়া আসিল এবং তাহার ফলে লঙ্কার দুই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর একসঙ্গে 'ঘায়েল' হইলেন দেখিয়া পাঠকেরা যে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে এদেশের বা সেকালের বৈশিষ্ট্য নয় তাহা সম্প্রতি যে মহাপ্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল তাহাতে উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধে দেখা গেল যে, 'পরমাণবিক-বোমা,' 'খপুপ-বোমা' প্রভৃতি ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী মহাশক্তিশালী সভ্যতম জাতিদের পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে 'কাহিল' করিবার জন্য গালাগালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তবে বর্তমানকালের সুসভ্য রামচন্দ্রের বানর-দূত না পাঠাইয়া নিজেরাই বেতারযোগে বা সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রতিপক্ষদের 'চতুর্দশ-পুরুষান্ত' করিয়া থাকেন এবং সুসভ্য রাবণেরাও সেই সকল সুমিষ্টবাণী চক্রবৃদ্ধি-হিসাবে সুদসহ ফিরাইয়া দিতে অণুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করেননা। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর 'খেউড়' প্রিয় জনসাধারণ কিরূপ আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। এই জন্যই যে সকল সংবাদপত্র গালি দিতে জানে তাহাদের কাটতির কখন অভাব হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ এই রুচি এত সর্বজনীন যে, ভবিষ্যতে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটিবে এরূপ আশা করা যায়না। পক্ষান্তরে ইহার যে উপকারিতা নাই তাহাও বলা যায় না, কারণ সমাজের বহু অনাচারের সংশোধন যে উপযুক্ত বিদ্রূপাস্ত্রের সুনিপুণ প্রয়োগের ফলেই সাধিত হইয়াছে তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## বর্তমান যুগের সূত্রপাত—সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা

পালাগান কিরূপভাবে যাত্রার নাটকে পরিণত হইয়াছিল তাহা দেখিলাম। এইবার যাত্রার নাটকের স্থানে 'থিয়েটারী' নাটকের অভ্যুদয়ের বিষয় আলোচনা করিব। কিন্তু এই ব্যাপার আমাদের নাট্যশালার বিবর্তনের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে প্রথমে সেই বিষয় আলোচনা না করিলে আমরা উভয় প্রকার নাটকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব না। আমি সেইজন্য এখানে আমাদের নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য নাট্যশালার ইতিহাস্ হইতে আরম্ভ করিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হইবে, কারণ আমরা আমাদের বর্তমান নাট্যশালা-নির্মাণে পাশ্চাত্ত্য আদর্শকেই বহুল পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছি।

পাশ্চাত্ত্য ধরণের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সহিত নবযুগের সূত্রপাত

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের শিবোৎসবের ন্যায় দিওনুসিওসের উৎসব ছিল প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় উৎসব এবং নগরে নগরে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এদেশের ন্যায় ওদেশেও নাট্যাভিনয় এই উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহা ধর্মকর্মের অংশ বলিয়া নগরের সমস্ত অধিবাসী অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। সুতরাং রঙ্গভূমি খুব বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। সাধারণতঃ নগরের 'অ্যাক্রপলিস্' (acropolis) বা সর্বোচ্চ-স্থানের পাদদেশস্থ প্রান্তরে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত এবং অ্যাক্রপলিসের ক্রমনিম্নগাত্র দর্শকবৃন্দের বসিবার 'গ্যালারি' রূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রীসের প্রধান নগর এথেন্সের অ্যাক্রপলিস্‌টি ছিল একটি পাঁচশত ফুট উচ্চ পাহাড়। ইহা দক্ষিণদিকে ঢালু ছিল এবং

প্রাচীন গ্রীক্‌দের রঙ্গভূমি

সেইজন্য সেইদিকে দর্শকগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহার সম্মুখের প্রান্তরে কিছু দূরে দিওনুসিওসের বেদীর সন্নিকটে এক টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া মূলগায়ক বা প্রধান অভিনেতা গাহিতেন এবং ভূমিতে অবস্থিত কোরাসের নর্তক ও গায়কদের সহিত তাঁহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত। ইহার পর যখন অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তখন স্বভাবতঃই টেবিলের পরিসর বাড়িয়া ক্রমশঃ তাহা বৃহত্তর কাষ্ঠমঞ্চে পরিণত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অভিনেতাদের সাজ-সজ্জার জন্য একটা স্বতন্ত্র গৃহ বা তাম্বু থাকিত। মঞ্চটি এরূপভাবে নির্মিত হইত যে তাহার নিম্ন হইতে প্রেতদিগকে তুলিতে ও উপর হইতে দেবতাদিগকে নামাইতে পারা যাইত।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান রঙ্গমঞ্চ

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান যাজকেরা প্রথমে ধর্মমন্দিরের মধ্যে অভিনয় করিতেন, পরে নাটকের দৈর্ঘ্য ও চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মন্দির-প্রাঙ্গণে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার পর যখন তাঁহারা নগরবাসীদের হস্তে নাট্যাভিনয়ের ভার দেন এবং তাহা বারোয়ারী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তখন নগরের প্রত্যেকেরই তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার জন্মায়। কিন্তু এই সকল অভিনয় আমাদের যাত্রার ন্যায় কেবল পালপার্বণে হইত এবং নাটকগুলিও ধর্মসংক্রান্ত ছিল, সেইজন্য কোন স্থায়ী-রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না। কর্মকর্তারা সাময়িকভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা মঞ্চ নির্মাণ করিতেন। মঞ্চের চারিদিক্ খোলা থাকিত এবং দর্শকেরা রাস্তায় ও মাঠে ভিড় করিয়া সকল দিক্ হইতে অভিনয় দেখিত। মঞ্চের মধ্যস্থলে অভিনয় হইত এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ছাদ দিয়া দেবদূত নামিত বা তাহার নিম্ন হইতে সানুচর শয়তান উঠিত। অভিনেতারা মঞ্চে উঠিবার পূর্বে বা তাহা হইতে নামিবার পর দর্শকগণের মধ্যেই চলাফেরা করিত—অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মত। দুইটি দৃশ্য একসঙ্গে দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে দুইটি মঞ্চ পাশাপাশি বাঁধা হইত। ক্রমে দর্শকগণের সুবিধার

জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র মঞ্চ নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন স্থানে দেখান হইত। কিন্তু তাহাতেও সকল নগরবাসীর অভিনয় দেখার সুবিধা হইত না বলিয়া চক্রবিশিষ্ট গতিশীল রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা হয়।

পেজ্যাণ্ট্ বা মিছিল

এই মঞ্চগুলিকে অভিনেতাসহ প্রত্যেক রাজপথে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং এইরূপে নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে অভিনয় দেখিবার সুযোগ লাভ করিত। এইরূপ চলন্ত রঙ্গমঞ্চের মিছিলের নাম ছিল 'পেজ্যাণ্ট্' (pageant)। আমাদের চৈত্রের সঙ্, জন্মাষ্টমী, রামলীলা প্রভৃতি মিছিলগুলির সহিত এই সকল মিছিলের তুলনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যজাতিসমূহ আমাদের ন্যায় আধ্যাত্মিক জাতি নয়। ফলে ওদেশে ধর্মসংক্রান্ত নাটকের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং সামাজিক, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক প্রভৃতি লৌকিক নাটক অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। বলিতে গেলে, এখন কেবল জার্মানির ওবার-

ওবার-আম্মারগাও-এর রঙ্গভূমি

আম্মারগাও (Ober-Ammargau) গ্রামের "প্যাশান্ প্লে" সেকালের 'মিস্টারি' নাটকের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ঐ স্থানে দশবৎসর অন্তর এই অভিনয় হয় এবং দেশবিদেশ হইতে সহস্র সহস্র দর্শক সে অভিনয় দেখিতে আসে। চারিপাঁচশত অভিনেতা সহযোগে প্রায় আট ঘণ্টা ধরিয়া এই অভিনয় হয়। ফলে এখানেও প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারের মত এক উচ্চভূমির পাদদেশে সমতল বিস্তীর্ণ ভূমিতে রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয় এবং উচ্চভূমির ক্রমনিম্নগাত্রে গ্যালারি প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুতঃ যেখানে কোন জাতীয় উৎসবের অঙ্গস্বরূপ নাট্যাভিনয় হয় এবং বহু সহস্র দর্শক তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হয়, সেখানে এখনকার থিয়েটার-গৃহের ন্যায় সংকীর্ণ নাট্যশালায় অভিনয় করা চলেনা।

ইংল্যাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রাণী এলিজাবেথের সময়ে নাট্যালয় ও নাটকের নবযুগ আরম্ভ হয় এবং

সেক্সপিয়ার, বেন্ জনসন প্রভৃতি যুগান্তকারী নাট্যকারগণ আবির্ভূত হন। কিন্তু সে সময়েও ইংল্যাণ্ডে কোন সাধারণ স্থায়ী-নাট্যশালা ছিল না। বর্তমান-কালের সার্কাসদলের মত যাযাবর নাটুয়াদল কোন সুবিধামত স্থানে তাঁবু ফেলিয়া বা অস্থায়ী কাঠের চালা-ঘর নির্মাণ করিয়া অথবা কোন সরাইয়ের উঠানে মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের অভিনয় দেখাইত। লণ্ডনে প্রথম স্থায়ী-রঙ্গালয় নির্মিত হইয়াছিল ১৫৭৬ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা কাষ্ঠনির্মিত ছিল। ইহার নাম ছিল The Theatre এবং ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন জেম্‌স্ বার্‌বেজ্ (James Burbage) নামক এক অভিনেতা। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, কিন্তু পর বৎসর বার্‌বেজ্ সেক্সপিয়ারের সহিত মিলিত হইয়া 'গ্লোব' নামক বিখ্যাত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল রঙ্গালয়ের আদর্শ ছিল সরাইয়ের প্রাঙ্গণে রচিত পূর্বোক্ত অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চসমূহ। ঐ রঙ্গমঞ্চগুলি সরাইয়ের চকবন্দি উঠানের মধ্যস্থলে নির্মিত হইত ও তাহার চারিদিকের ঘরের বারান্দায় বিত্তশালী দর্শকবৃন্দের আসন থাকিত। দরিদ্র জনসাধারণ মঞ্চের চারিদিকে উঠানে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিত। মঞ্চের সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম দিক্ খোলা থাকিত এবং পশ্চাৎ দিকে পর্দা থাকিত। পর্দার পশ্চাতে একটি গৃহ সাজঘররূপে এবং একটি বারান্দাসমেত দ্বিতল গৃহ প্রয়োজনমত অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। পিছনের পর্দার দুই পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া অভিনেতারা প্রবেশ ও প্রস্থান করিত। গ্লোব ও তখনকার অন্যান্য থিয়েটার এই প্রণালীতেই গঠিত হইয়াছিল। সরাইয়ের রঙ্গমঞ্চের মত এই সকল থিয়েটারের সম্মুখে কোন যবনিকা থাকিত না। বলা বাহুল্য, এরূপ মঞ্চে দৃশ্যাদি পরিবর্তন করিতে হইলে অনেকসময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

ইংল্যাণ্ডের যাযাবর অভিনেতৃসম্প্রদায়

"দি থিয়েটার"— লণ্ডনের প্রথম স্থায়ী-রঙ্গালয়

গ্লোব থিয়েটার

বাস্তবিক নাট্যমঞ্চের দোষে অনেক সময় নাটকের সুষ্ঠু ও

স্বভাবানুযায়ী অভিনয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এই কারণে মঞ্চ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ সংস্কার সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়ায় এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চের নানা উন্নতির চেষ্টা চলিতে থাকে। বিশেষতঃ এই সময়ে বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কৃত হওয়াতে মঞ্চে আলোক-নিয়ন্ত্রণেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়। অতঃপর ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহারের জন্য কাষ্ঠমঞ্চের অনেক অংশ লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে 'কার্পেণ্টার' বা সূত্রধারের স্থলে ক্রমশঃ 'এঞ্জিনীয়ার' বা যন্ত্রশিল্পী মঞ্চাধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হন। পূর্বে রাজ-প্রাসাদে বা সম্ভ্রান্ত ধনীদের গৃহে সময়ে সময়ে যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত তাহাতে বহুমূল্য দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার যথেষ্ট বাহুল্য দেখা যাইত বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের বালাই ছিলনা বলিলেই হয়। তাহার পর যে কয়েকখানি দৃশ্যপট দেখা দিয়াছিল তাহার অধিকাংশকে প্রকৃতির ব্যঙ্গচিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, মঞ্চসংস্কারের চেষ্টার সঙ্গে দৃশ্যপটের দিকেও সংস্কারকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল এবং এ বিষয়েও প্রথমে অস্ট্রিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল। এমন কি, প্রথম-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই চারি বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়সমূহেও অস্ট্রিয়া হইতে দৃশ্যপট আমদানী করা হইত। অবশ্য এক্ষণে ইংরেজ পটুয়ারা এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্যদেশে রঙ্গমঞ্চের সংস্কার

সূত্রধারের স্থলে যন্ত্রশিল্পী

প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যে নানাবিধ রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইত তাহার বিবরণ আমরা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু সম্ভবতঃ কেবল রাজা ও রাজন্যাদি অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত

সংস্কৃত বা প্রাকৃত নাটকগুলিই এই সকল মঞ্চে অভিনীত হইত।

প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চ

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই সকল উচ্চশ্রেণীর সৌখিন নাট্যাভিনয়ের সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণ যে সকল নাট্যাভিনয় দেখিত বা দেখিতে পাইত সেগুলির জন্য সম্ভবতঃ কোন মঞ্চ নির্মিত হইত না,

যাত্রার আসর ও চলন্ত মঞ্চের মিছিল

আমাদের যাত্রার আসরের মত সমতল ভূমিতেই সেগুলি অনুষ্ঠিত হইত। কোন কোন পর্বে পূর্বোক্ত 'পেজ্যাণ্ট' বা রামলীলাদির মিছিলের ন্যায় চলন্ত রঙ্গমঞ্চশ্রেণীও বোধ হয় বাহির হইত। কিন্তু এই সকল অভিনয় কেবল জাতীয় মহোৎসবসমূহের অঙ্গ ছিল না—এগুলি ছিল আমাদের গণশিক্ষার প্রধান বাহন। এইখানেই ইউরোপের সহিত আমাদের প্রভেদ। ইউরোপের গণশিক্ষার ভিত্তি হইতেছে—অক্ষর-পরিচয় ও হিসাব-জ্ঞান (The three R's)। পাশ্চাত্যেরা নিরক্ষরতা ও মূর্খতা

গণশিক্ষার বাহনরূপে নাট্য ব্যবস্থা

সমার্থক মনে করেন বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজনেতারা অক্ষর-পরিচয়কে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন না। বর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকেও যে জনসাধারণকে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য ধর্মশিক্ষাকে অন্যান্য শিক্ষার উপরে স্থান দিতেন এবং জনসাধারণকে সেই শিক্ষা দিয়া সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করাই ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সরস পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহের সাহায্যে বেদবেদান্তাদিতে নিহিত নীরস ধর্মতত্ত্বগুলি মধুপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গীয় সুধা আবার যখন পালাগান যাত্রা কথকতা প্রভৃতির আকারে পরিবেষিত হইত, তখন গৌড়জন যে তাহা মহানন্দে পান করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আবালবৃদ্ধবনিতাকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ফল হইয়াছে এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা নিরক্ষর হইলেও মূর্খ

নহে। অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মুখেও উচ্চ দার্শনিকতত্ত্বের কথা শুনিতে পাওয়া কেবল এই দেশেই সম্ভব।

বলা বাহুল্য, এরূপ নাট্যাভিনয়—যাহা এক সঙ্গে জাতীয় উৎসবের অঙ্গ ও জনশিক্ষার বাহন ছিল—তাহা বর্তমানকালের নাট্যশালার ন্যায় কোন "বাক্সবন্দি" সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্পন্ন করার উপায় ছিল না।

যাত্রার আসরই যাত্রাভিনয়ের উপযুক্ত রঙ্গভূমি

চতুর্দিকে উন্মুক্ত সুপ্রশস্ত ভূমিই ছিল তাহার উপযুক্ত স্থান। প্রাচীন গ্রীসে বা মধ্যযুগের ইউরোপে যে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রাচীন রোমের 'আমফিথিয়েটার' (amphitheatre) বা রঙ্গভূমিগুলিও ছিল এক বিরাট ব্যাপার। এক প্রকাণ্ড

রোমের আমফিথিয়েটার

অনাচ্ছাদিত চক্রাকার ভূমি উপরি উপরি বহু-সারি আসনযুক্ত গ্যালারির দ্বারা বেষ্টন করিয়া এই সকল রঙ্গালয় নির্মিত হইত। ইহাদের মধ্যে সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vespasian) নির্মিত 'কলিসিয়াম্' (Coliseum)টি ছিল এত বৃহৎ যে

কলিসিয়াম

তাহাতে অর্ধলক্ষ দর্শক স্বচ্ছন্দে বসিয়া অভিনয় দেখিতে পারিত। কিন্তু এই সকল রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় বড় হইত না—পেশাদার মল্লযোদ্ধা (gladiator) ও সিংহাদি পশুর যুদ্ধই অধিকাংশ সময় প্রদর্শিত হইত, কারণ সে সময় এই সকল নিষ্ঠুর আমোদই রোমনগরের দর্শকগণের অধিকতর প্রিয় ছিল।

আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে মঞ্চবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে মনুষ্য বা পশুদের পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ মল্লক্রীড়ার নাম ছিল 'সমাজ'। কিন্তু এজন্য আমফিথিয়েটারের ন্যায় কোন স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মাণের কথা শুনা যায় নাই। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বে কখন অনুভূত হয় নাই। আমাদের দেশ ছিল পল্লিপ্রধান দেশ—দেশের জনসাধারণ গ্রামেই বাস করিত। শহরের মধ্যে ছিল এক রাজধানী, আর দুই চারিটি ব্যবসায়কেন্দ্র। রাজধানীতে রাজা তাঁহার

পারিষদবর্গ, কর্মচারিবৃন্দ ও সৈন্যসামন্ত লইয়া বাস করিতেন আর ব্যবসায়কেন্দ্রসমূহে ব্যবসায়ীরা অবস্থান করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেন,—পল্লিগ্রামের অধিবাসীদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। প্রত্যেক পল্লী নিজ পল্লিসমাজ কর্তৃক শাসিত হইত। খাজনা দেওয়া ছাড়া রাজার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখার প্রয়োজন তাহাদের ছিল না। কোন রাষ্ট্রীয়বিপ্লব ঘটিলে তাহা প্রায় নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত,—তাহার ফলে পল্লীর জীবনধারার বিশেষ ব্যত্যয় হইত না। সুতরাং রোম বা এথেন্স যেমন কৃষ্টি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই স্ব স্ব রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, আমাদের নগরগুলি সেরূপ ছিল না। ফলে রোমে বা এথেন্সে যেরূপভাবে সরকারের সাহায্যে জাতীয় উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হইত, এখানকার নগরগুলিতে সেরূপভাবে হইত না, সুতরাং আমাদের নগরসমূহে স্থায়িভাবে কোন জাতীয়-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হয় নাই। রাজারা ও নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ অবশ্য নিজ নিজ গৃহে উৎসবাদি করিতেন, কিন্তু সেগুলিকে জনসাধারণের উৎসব বলা চলিত না। গ্রামে যে সকল উৎসব হইত সেগুলিই ছিল যথার্থ জনসাধারণের উৎসব। তদুপলক্ষ্যে যে সকল নাট্যাভিনয় হইত তাহার জন্য ব্যয়সাধ্য মঞ্চ দৃশ্যপটাদি বা দর্শকদের আসন নির্মাণ করা আবশ্যক হইত না। যাত্রার আসরই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। আমাদের দেশের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য; এখানে বড় বড় ভোজেও ধনকুবের হইতে দীনতম ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত একসঙ্গে কুশাসনে বসিয়া কদলীপত্রে আহার ও মৃৎপাত্রে জলপান করিতে দেখা যায়। আসন বা ভোজনপাত্রের দীনতা তাঁহাদের মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদ্রেক করে না—তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে কেবল ভোজ্য বস্তুর স্বাদুতা, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দিকে। এদেশের দর্শকেরাও ঠিক এইরূপ মনোভাব লইয়া অভিনয় দেখিতেন। ইংল্যাণ্ডে সেক্সপিয়ারের সময়ে যখন দৃশ্যপটাদির বাহুল্য ছিল না, তখন যেমন সেখানে "the play

যাত্রাভিনয়ের জন্য স্থায়ী রঙ্গালয় বা রঙ্গমঞ্চ অনাবশ্যক

was the thing" ছিল, যাত্রার দর্শকগণের নিকটও তেমনি নাটকের রসই ছিল আসল বস্তু। তাহারা ভূমিতলে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে নাট্যরস উপভোগ করিত। অভিনেতাদের বেশভূষাদি বা অন্যান্য বাহ্য আড়ম্বরের দিকে দৃক্‌পাত করিত না।

*যাত্রার নাটকে রসই ছিল আসল বস্তু*

কিন্তু যাত্রায় কৃত্রিম দৃশ্যপটের ব্যবস্থা না থাকিলেও, অনেক সময় বাস্তবদৃশ্যের সাহায্য লওয়া হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের দানলীলাভিনয়ের কথা বলা যাইতে পারে। এই অভিনয়ে তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার, অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের, নিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ির, শ্রীবাসাদি কতিপয় সখীর, কমলাকান্তাদি কতিপয় সখার, গৌরীদাস সুবলের এবং নরহরি মধুমঙ্গলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভাগীরথীতীরে অভিনয় হয়। সখারা প্রকৃত গাভী লইয়া চরাইতে যান। নদীর ধারে একটি কদম্ববৃক্ষ ছিল, সেটিকেও অভিনয়কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। ভাগীরথীতে জলবিহার করা হয়। দধিদুগ্ধ লুণ্ঠনাদি ব্যাপারও ঠিকমত দেখান হইয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব অভিনয় করিতে করিতে এরূপ ভাবোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অচেতন হইয়া জলে পড়িয়া যান এবং কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিবার পর তাঁহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসে। বর্ত্তমানকালেও (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় যখন তাঁহার বাটীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করান, তখন তিনি বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন স্থানে দেখাইয়াছিলেন এবং কৃত্রিম দৃশ্যপট ব্যতীত তাঁহার বাটীর সংলগ্ন পুষ্করিণী ও উদ্যানের বৃক্ষাদি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে অভিনয় করিলে তাহার স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পায় এবং নাটকীয় ক্রিয়া প্রদর্শনের সুযোগও অনেকটা বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, দর্শকেরা একাসনে বসিয়া অভিনয় দেখিতে পারেন না, অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁহাদিগকেও স্থানত্যাগ করিতে হয়।

*বাস্তবদৃশ্যের সাহায্যে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের অভিনয়*

তবে যেখানে আসনের বালাই নাই, সেখানে এ অসুবিধা তত টা অনুভূত হয় না।

নাট্যশালা সর্বত্রই দেশ-কালোচিত অভিনয়ের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়

এইরূপে বিভিন্ন দেশের নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সবত্রই দেশকাল ও সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়াই নাট্যশালা গঠিত হইয়াছিল। কালের সহিত যেমন অভিনয়ের উদ্দেশ্য ও লোকের রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, নাট্যশালারও তদনুসারে পরিবর্তন করা হইয়াছে। সুতরাং এসকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া কোন নাট্যশালার গুণাগুণের বিচার করা উচিত নয়। আবার, নাট্যশালা ছাড়িয়া নাটকেরও ঠিক বিচার করা যায় না, কারণ নাটক ও নাট্যশালা বহুল পরিমাণে পরস্পরের মুখাপেক্ষা। একটা উদাহরণ দি। প্রাচীন গ্রীসে দর্শকগণের আসন হইতে রঙ্গমঞ্চ অনেকটা দূরে থাকাতে অভি-

নাটকের বৈশিষ্ট্য নাট্যশালার বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে

নেতারা নিজদৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত স্থূলতলযুক্ত পাদুকা এবং অত্যুচ্চ মুখস পরিয়া অভিনয় করিত। এরূপ সাজসজ্জার ভার লইয়া চলাফেরা করা খুবই অসুবিধাকর ছিল—লম্ফঝম্প করা ত একেবারেই চলিতনা; সেরূপ কোন চেষ্টা করিলে পড়িয়া গিয়া মুখস বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং অনেকটা বাধ্য হইয়াই গ্রীক নাট্যশাস্ত্রকারেরা রঙ্গমঞ্চে হত্যা ও পতনের দৃশ্য

ইহার উদাহরণ প্রাচীন গ্রীক নাটক

দেখান নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে যে গম্ভীর বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার বাহুল্য এবং নাটকীয় ক্রিয়ার অপ্রাচুর্য্য দেখা যায় তাহার জন্যও যে তখনকার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের উক্তপ্রকার সাজসজ্জা অনেকটা দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের যাত্রার নাটকের বিশেষত্বও বহুলপরিমাণে আমাদের যাত্রার আসরের বৈশিষ্ট্য হইতে সম্ভূত। যাত্রার আসরে একই সমতল ভূমিতে দর্শক ও অভিনেতারা অবস্থান করে এবং দর্শকেরা

রঙ্গভূমির সকল দিকেই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকে। রঙ্গভূমিতে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকে, সুতরাং বহু দর্শককে স্থান দিবার জন্য তাহাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হয়। ফলে দর্শকবৃন্দের শেষ সারিগুলি অভিনয়-স্থান হইতে অনেকটা দূরে থাকে এবং অভিনেতারা স্বাভাবিকভাবে কথোপকথন করিলে তাহা ঐ সকল দর্শক শুনিতে পায় না। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে-গীত গান বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়। এইজন্য এই সকল আসরে কথোপকথন অপেক্ষা গানই প্রাধান্য লাভ করে। বস্তুতঃ আসরের চারিধারে এই সকল গান ভাল করিয়া শোনাইবার জন্যই যাত্রায় জুড়িগান ও বালকদের সমবেত-সঙ্গীত প্রবর্তিত হয়। জুড়িরা ও বালকেরা আসরের বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া এবং দর্শকগণের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গান করাতে গান শুনিবার পক্ষে আর কাহারও অসুবিধা হইত না। বক্তৃতাগুলিও যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া করা হইত। এই জন্য বক্তৃতার ভাষা যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর করা হইত এবং তাহার দৈর্ঘ্যও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু বলিয়াছি, যাত্রার প্রথম অবস্থায় বক্তৃতাংশ খুবই কম ছিল, নাটকীয় ক্রিয়াদিরও বাহুল্য ছিল না। নাটকগুলি তখন সম্পূর্ণরূপে গীত ও রস প্রধান ছিল,—বিশেষতঃ কৃষ্ণযাত্রায় কেবল এইরূপ নাটকই অভিনীত হইতে দেখা যাইত। বলা বাহুল্য, নূতন ধরণের নাট্যশালার প্রবর্তনের পর যাত্রার নাটকের এই সকল বৈশিষ্ট্যের কতকাংশ স্বভাবতঃই লুপ্ত বা পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং এইরূপে যাত্রার নাটক থিয়েটারী নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

যাত্রার বৈশিষ্ট্যও অনেক পরিমাণে আসরের বৈশিষ্ট্যের ফল

আমাদের নাট্যজগতে এই নূতন যুগের আবির্ভাবের কারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে তৎকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রত্যেক যুগ-পরিবর্তনের মূলে থাকে একটা বিপ্লব এবং সাধারণতঃ বাহির হইতে সহসা একটা প্রবল শক্তি—একটা ঝঞ্ঝা আসিয়া এই বিপ্লব ঘটায়। এই শক্তি

কখন কোন দিক হইতে আসে তাহা বলা যায়না। বাস্তবিক সমস্ত ব্যাপারটা দৈব-ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, "সৃষ্টির গতি চলে আকস্মিকের ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।" আমরা জানি, জীবের বিবর্তনও এইরূপ ভাবে হইয়া থাকে। যদি জীবেরা কেবল কালের প্রভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইত তাহা হইলে এক জাতীয় সকল জীব একই সময়ে উচ্চতর জীবে পরিণত হইত,—কোন বনমানুষ আর বনমানুষ থাকিত না, সকলেই এতদিনে মানুষ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবর্তনবাদীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে কেবল কয়েকটি ভাগ্যবান বনমানুষের মস্তিষ্কে সহসা এক অপূর্ব শক্তিধারা প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে ঘোর আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সেই সকল মস্তিষ্ক বৃহত্তর ও জটিলতর মানব-মস্তিষ্কে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে বনমানুষের যুগের পর মানুষের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনেকের মতে এই বিবর্তনকারী শক্তি বিশ্বরশ্মি (Cosmic rays) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অমিতশক্তিশালী রশ্মিসমূহ পৃথিবীর বাহিরের নানা অজানা স্থান হইতে অবিরত ধরাতলে বর্ষিত হইতেছে এবং জগৎকে ক্রমোন্নতি বা ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষীদের যুগান্তকারী ভাব ও চিন্তাধারা এক হিসাবে এই বিশ্বরশ্মিরই ন্যায় শক্তিমান, কারণ সেই সকল মহাবলশালী ভাব ও চিন্তা সমাজমধ্যে নানা বিপ্লব সংঘটন করিয়া কৃষ্টি ও সভ্যতার বিবর্তনে সহায়তা করে। কিন্তু এরূপ মনীষিগণেরও আবির্ভাব হয় কতকটা আকস্মিকভাবে। দেশবিশেষে দৈবক্রমে শুভযোগ উপস্থিত হইলে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে দেশবাসীদের বহুকালের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাদের প্রাণে নূতন ভাবধারা ছুটিতে থাকে, তাহারা নূতন জীবন লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। সেই সময়ে উক্ত

বিবর্তন আকস্মিক বিপ্লবের ফল

সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রের বিপ্লবও দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে

মহাপুরুষেরা যেন ভগবৎপ্রেরিত হইয়া আবির্ভূত হন এবং নবযুগের পথপ্রদর্শকরূপে সমাজকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যান। বলা বাহুল্য, সমাজের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় জাতীয় রঙ্গালয়ও এই উন্নতির অংশভাগী হয়। ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের যুগকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সে সময়ে সেখানে নানা অনুকূল ঘটনা সংঘটনের ফলে দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, ধর্মাদি বিষয়ে লোকেরা স্বাধীন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির অপরাজেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। দেশের এই নবলব্ধ শক্তি এবং নূতন চিন্তা ও ভাবের ধারা রঙ্গালয়েও প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং সেক্সপিয়ার-প্রমুখ নাট্যকারগণের অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে ইংল্যাণ্ডের নাট্যজগতে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

এলিজাবেথের যুগে রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের সহিত ইংল্যাণ্ডের নাট্যজগতে নবযুগের উদ্ভব

আমাদের রঙ্গালয়ের বর্তমান যুগ আরম্ভ হইবার পূর্বেও এক যুগান্তকারী রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের সমাজে ও চিত্তে ঘোর আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া নানাদিকে সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমাদের নাট্যশালার ও নাটকের সংস্কার তাহারই অন্যতম ফল। প্রধানতঃ দুইটি ঘটনা আমাদের নাট্যজগতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল—(১) কলিকাতায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন; (২) কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা। জগতের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এথেন্স, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ প্রভৃতি যে সকল নগরকে স্ব স্ব দেশের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ বলা যাইতে পারে সেগুলি ঐ সকল দেশের জাতীয় নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি, আমাদের দেশের সেকালের রাজধানীগুলি ঠিক এরূপ ধরণের নগর ছিল না, সেগুলি ছিল রাজার আবাসস্থান মাত্র—সেখানে রাজ-কবিরা সপারিষদ্ রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য-নাটকাদি লিখিতেন

দুইটি ঘটনা আমাদের নাট্যজগতে নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিল

বটে, কিন্তু সেই সকল অভিজাত-কবি অপেক্ষা পল্লিকবিরাই পল্লীস্থ জনসাধারণের অধিকতর সমাদরের পাত্র ছিলেন। পল্লিকবিরা কোন নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য কখন নিজ পল্লী ছাড়িয়া রাজধানীতে যাইত না। তবে যে সকল স্থানে ধর্মোৎসবাদি উপলক্ষ্যে মেলা বসিত সেই সকল স্থান মেলার কয়েকদিন দেশবিদেশ হইতে সমাগত উৎসবনিরত জনগণের দ্বারা মুখরিত থাকিত; এবং এই সকল উৎসবে অনেক নূতন পালাগান ও যাত্রাগান প্রচারের যে বিশেষ সুবিধা হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থস্থানগুলিতে অবশ্য চিরদিনই দেশের সর্বত্র হইতে যথেষ্ট লোকসমাগম হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল পুণ্যার্থী জনগণ দ্বারা যে কৃষ্টির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইত না বা হয় না তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, আমাদের দেশের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্রের এই অভাব অবশেষে কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

তিনটি কারণে কলিকাতা এই মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ, কলিকাতার উপকণ্ঠে অন্যতম পীঠস্থান কালীঘাট থাকাতে এখানে বহুকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হইত। তাহার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যাগার রূপে যখন এই স্থানটিকে নির্বাচিত করিলেন, তখন হইতে ক্রমশঃ ইহা এদেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয় প্রকার বাণিজ্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজরাজ এই নগরে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন ইহা স্বতঃই আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল, কারণ ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেকালের মত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন পল্লিসমাজের অনুকূল নহে। সেকালের পঞ্চায়েৎ ও জমিদারের কাছারির স্থান এখন শহরের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন শহরের উপকণ্ঠে কলকারখানা প্রতিষ্ঠাও পল্লিসমাজের লোপসাধনে যথেষ্ট

প্রথম ঘটনা—কলিকাতা নগরীর অভ্যুদয়

সহায়তা করিয়াছে। ফলে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনী ব্যক্তিগণ—যাঁহারা আমাদের সমাজের নায়ক তাঁহারা—প্রায় সকলেই এখন শহরবাসী হইয়াছেন এবং শহর হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন পল্লি-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। সুতরাং শহরের ফ্যাশান মফস্বলে প্রচারিত হইতে এখন আর অধিক বিলম্ব হয়না। অবশ্য এই সকল শহরের মধ্যে কলিকাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সর্বপ্রকার জাতীয় চিন্তা ও কর্মধারার প্রধান উৎস। এইরূপে কলিকাতানগরী ইউরোপের এথেন্স, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ প্রভৃতির ন্যায়ই আমাদের এখানে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যালয়ের ধারা পরিবর্তনে সমর্থ হয়।

এই নূতন ধারা প্রবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল—হিন্দুকলেজ। সকলেই জানেন, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুবালকগণকে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের জন্য এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার, ঐ বৎসরেই ইংরেজেরা ভারতবর্ষে তাঁহাদের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদের সহিত শেষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং এইরূপে মারাঠা-শক্তির বিলোপসাধন করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হন। ঠিক একই সময়ে এই উভয় ঘটনা ঘটাতে বোধ হইল যেন হিন্দুস্থানের সহিত হিন্দুর কৃষ্টির উপরেও ব্রিটিশ-আধিপত্য বিস্তার হওয়াই বিধাতার ইচ্ছা। সত্য কথা বলিতে কি, হিন্দুকলেজের প্রথম অবস্থায় ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা ও সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ ঘোরনিষ্ঠা সহকারে তাহা আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে উপরিউক্ত আশঙ্কা বাড়িয়া গিয়াছিল বৈ কমে নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, বাঙালীর চিরন্তন স্বাধীন মনোভাব এক্ষেত্রেও পরিশেষে জয়ী হইয়াছিল। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদের পরিপাকশক্তি অসীম—পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ও কৃষ্টির তীব্ররস আকণ্ঠ পান করিয়াও আমরা আমাদের জাতীয়তা হারাই নাই। প্রথমে কয়েকজন যুবক মোহগ্রস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী হয় নাই। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে

দ্বিতীয় ঘটনা—হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা

পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির সহিত সংগ্রামে দেশীয় কৃষ্টির জয়লাভ

আমাদের কৃষ্টির অনুগত করিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছি। আমরা দেখিতে পাইব যে, বর্তমান যুগে নাটক ও নাট্যালয়ের সংস্কার ব্যাপারেও আমরা আমাদের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য প্রথম থিয়েটার
লেবেডেফের থিয়েটার

বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য বিলাতী ধরণের নাট্যশালা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর—কলিকাতায় ভারতের রাজধানী স্থাপিত হইবার মাত্র একুশ বৎসর পরে। কিন্তু ইহা কোন বাঙালীর কল্পনাপ্রসূত ছিলনা। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেরাসিম লেবেডেফ (Lebedeff) নামে এক রাশিয়ান। তিনি এই নব প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। তিনি তাঁহার নাটকের স্ত্রীচরিত্রগুলি অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন এবং নাটকটি Disguise নামক এক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ হইলেও তিনি দেশীয় দর্শকগণের মনোরঞ্জনার্থ সেই সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি জনপ্রিয় গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐকতানবাদনকালে দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় প্রকারের বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল চিত্তাকর্ষক আয়োজনের ফলে নাট্যালয়টি দর্শকে পূর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। প্রথম অভিনয়ের চারিমাস পরে আর একদিন মাত্র অভিনয় করিয়া নাট্যালয়টি বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার পর আর কেহ ইহার অনুবর্তন করেন নাই। বস্তুতঃ জনসাধারণের উপর এ অভিনয় কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথম দিনের অভিনয়ে পিটের টিকিটের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল আট টাকা, গ্যালারির চারি টাকা; এবং দ্বিতীয় দিনে টিকিটের মূল্য এক মোহর করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেকালে টাকার মূল্য এখন হইতে বহুগুণ অধিক ছিল।

নবীন বসুর থিয়েটার

সুতরাং ধনাঢ্যশ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর লোক এ অভিনয় দর্শন করে নাই। ইহার চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসু

মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যে চমকপ্রদ অভিনয় করাইয়াছিলেন তাহার নূতনত্বের মধ্যে ছিল কেবল অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য। সুতরাং এ সকল অভিনয় যে আমাদের নাট্যজগতে নবযুগ আনয়নে বিশেষ সহায়তা করে নাই, তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

নবীন বাবুও লেবেডেফ্ সাহেবের মত ভাড়াকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া অভিনয়কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ আরও দুই চারিটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরেজী নাটক—বিশেষতঃ সেক্সপিয়ারের নাটক—বিশেষ যত্ন সহকারে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা ঐ সকল নাটকের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং পারিতোষিক-বিতরণাদির সভায় তাহাদের দ্বারা পঠিত-নাটকগুলি হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করাইতেন। ফলে এই সকল নাটক পূর্ণভাবে অভিনয় করিবার জন্য তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন কলাবিদ্যানুরাগী উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মনে পাশ্চাত্ত্য ধরণের একটি নাট্যশালা স্থাপনের অভিলাষ জাগিয়া উঠে। এই অভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাগানবাড়ীতে "হিন্দু থিয়েটার" নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই থিয়েটারে কেবল ইংরেজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম নাটকখানি ছিল উইলসন সাহেব কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'। ইহার পর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের "সাঁ-সুসি" (Sans Souci) থিয়েটারে কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে বা অন্য কোন স্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া শিক্ষিত যুবকের দল মাঝে মাঝে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিতেন।

হিন্দুকলেজ ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের অভিনয়

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'

এই সকল অভিনয় নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য-ধরণে নির্মিত তিনটি রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে তিনটি বাংলা নাটক অভিনীত হয়। প্রথম নাটক ছিল নন্দকুমার রায় কৃত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের বাংলা অনুবাদ, দ্বিতীয় নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক এবং তৃতীয় নাটক তর্করত্ন মহাশয়েরই কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের বাংলা অনুবাদ। প্রথম নাটকটি আশুতোষ দেবের বাটীতে, দ্বিতীয় নাটকটি রামজয় বসাকের বাটীতে এবং তৃতীয় নাটকটি কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "ওরিএণ্টাল থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটারটি "ওরিএণ্টাল সেমিনারী" নামক বিদ্যালয়ে ১৮৫৩ কিংবা ১৮৫৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে কেবল ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। অবশেষে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শানুসারে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকখানি মঞ্চস্থ করিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সফল হইবার পূর্বেই রঙ্গালয়টি গতাসু হয়। ইহার পূর্বে 'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী' ('প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ), 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুক সর্ব্বস্ব', 'শকুন্তলা', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক বা প্রহসনের অনুবাদ এবং যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', 'মার্চ্যাণ্ট্ অব্ ভিনিস' অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রভৃতি কতিপয় নাটক রচিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের অভিনয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অতএব উপরিউক্ত তিনখানি নাটককে নবযুগের প্রথম অভিনীত নাটক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের বিশেষত্ব এই যে, ইহা নবযুগের প্রথম সামাজিক নাটক। নাটকের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারের বাঞ্ছা যে তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এ নাটকটির বারংবার অভিনয় তাহারই অন্যতম প্রমাণ।

রামনারায়ণের কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক

নবযুগের প্রথম নাটকাবলী

এই সকল নাট্যাভিনয়ের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কর্তৃক তাঁহাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে বিখ্যাত "বেলগাছিয়া নাট্যশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ স্যর (তখন বাবু) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার বহু ধনী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন, এমন কি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন। রাজারা এই নাট্যশালার জন্য সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি সংগ্রহ করিতে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ফলে, দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব এবং রাজা, রাণী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য দর্শকগণকে একেবারে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিত। বঙ্গের লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সাহেব এবং কলিকাতার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া দর্শকরূপে প্রেক্ষাগৃহের শোভাবর্ধন করিতেন। গীতবাদ্য এবং অভিনয়ও হইত অনবদ্য। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে তর্করত্ন মহাশয়ের 'রত্নাবলী' লইয়া এই নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ইংরেজদর্শকগণের সুবিধার জন্য রাজারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া লন। এই ঘটনাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহারই ফলে মধুসূদন বাংলা নাটক ও কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং 'রত্নাবলী'র পর তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয়। দুঃখের বিষয়, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পরলোকগমন করেন এবং এই নাট্যশালাটিও সেই সঙ্গে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বঙ্গীয় নাট্যালয়ের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি কখনও লোপ পাইবে না। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক পৌরাণিক নাটক হইলেও মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের রীতি ত্যাগ করিয়া তাহা আধুনিক

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

বাংলা কাব্য ও নাট্য জগতে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব

নাট্যশালার উপযোগী করিয়াই লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি নবযুগের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ('কৃষ্ণকুমারী') এবং প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') রচনা করেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া শক্তিশালী নাটকীয় ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপনের সমকালে বা তাহার পরে নানা স্থানে আরও অনেকগুলি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন কি তাহাদের সংখ্যা অবাঞ্ছিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সকল রঙ্গালয়কে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেল মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন, "এক্ষণে এদেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয়না। তথাপি ইহাকে সুলক্ষণ বলিতে হইবে, কারণ ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে নাট্যবিষয়ে আমাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।" কিন্তু নাট্যালয়ের এই সংখ্যাবৃদ্ধি নাট্যানুরাগের প্রাবল্যবশতঃ সকল সময় হইত কিনা তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মধ্যস্থ' নামক পত্রে একজন লেখক এই সকল থিয়েটারের অধিকাংশের যে স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। তিনি লিখিয়াছিলেন যে এই সময়ে "কোন ধনী নিজ ব্যয়ে বা কতিপয় বন্ধুবান্ধব চান্দা সংগ্রহে আত্মীয় সাধারণের পরিতোষার্থ, কেহবা তামাসাচ্ছলে, কেহবা শুদ্ধ আমোদের আশায়, কেহবা স্বার্থমূলক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্মান লাভার্থ, কেহবা প্রতিহিংসার বশে, কেহবা সখের প্রাণের ব্যাকুলতায়, কেহ কেহ বা কেবলই ইয়ার্কি ও মজার অনুরোধে এবং কেহ কেহ বা অন্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিতে স্বল্পকালের নিমিত্ত রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ দ্বারা অভিনয় করিতেন।" সুখের বিষয়, এ তীব্র মন্তব্য সকল নাট্যালয়ের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না। আমরা জানি, এসময়ে অনেক নাট্যালয়ের পরিচালকবর্গ প্রকৃতই নাট্যানুরাগী ছিলেন এবং নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে দেশের রুচির ও নীতির সংস্কারসাধনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই সকল নাট্যালয়ের মধ্যে "পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়,"

বহু অস্থায়ী থিয়েটারের আবির্ভাব

"শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি," "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা," ও "বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়" ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক তাঁহার নিজবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নাট্যশালাটিও সেই বৎসর শোভাবাজার রাজবাটীতে সংস্থাপিত হয়। "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা"ও এই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে স্থাপিত হয়।

পাথুরিয়াঘাটা, শোভাবাজার ও জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা

"বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়"টি প্রথমে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাটীতে অবস্থিত ছিল। সেইখানে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটক লইয়া ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই নাট্যশালা চতুষ্টয় স্থাপিত হইবার পূর্বে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিঁদুরিয়াপটিতে "মেট্রোপলিটান থিয়েটার" নাম দিয়া ভূতপূর্ব 'হিন্দু মেট্রোপলিটান' কলেজের বাটীতে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলস্থ যুবকগণ উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটকের যে অভিনয় করেন তাহা কলিকাতার হিন্দুসমাজে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়—মনোমোহন বসু

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর', 'মালতীমাধব' ও 'রুক্মিণী-হরণ' নাটক এবং 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান' ও 'বুঝলে কিনা' নামক চারিটি প্রহসন অভিনীত হয়। এই নাট্যালয় স্থাপনের চারি বৎসর পূর্বে এই বাটীতে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'রও অভিনয় হয়। ওদিকে শোভাবাজারের থিয়েটারের দল মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। জোড়াসাঁকো নাট্যালয়ের পরিচালকবর্গ রামনারায়ণ তর্করত্নের দ্বারা 'নবনাটক' নামে একখানি বহুবিবাহবিষয়ক নাটক লিখাইয়া অভিনয় করেন। বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে মনোমোহন বাবুর 'রামাভিষেক', 'সতী নাটক' ও 'হরিশচন্দ্র' নাটক অভিনীত হয়। এই

[পাথু]রিয়াঘাটা, শোভাবাজার ও বহুবাজার নাট্যশালায় অভিনীত নাটকাবলী

সকল নাটক ব্যতীত এই সময়ে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং মফস্বলে যে সকল নাটকের অভিনয় হয়, তন্মধ্যে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'জামাইবারিক' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন 'শকুন্তলা', 'মহাশ্বেতা', 'উষানিরুদ্ধ', 'জানকী-বিলাপ', 'নলদময়ন্তী', 'শ্রীবৎসচিন্তা' প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরাণিক বা অর্দ্ধ-পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। নবযুগের যে সকল নাটক কলিকাতার বাহিরে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বোধ হয় বরিশালে অভিনীত ডাক্তার দুর্গাদাস কর প্রণীত "স্বর্ণ-শৃঙ্খল" নাটকই প্রথম। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক ঢাকায় মুদ্রিত হয় এবং তাহার আট বৎসর পূর্বে বরিশালে ইহা রচিত হয়।

অন্যান্য নাটক

উল্লিখিত শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত রঙ্গালয়-গুলিতে যে অভিনয় হইত তাহা সর্ববিষয়ে তৎকালীন যাত্রাদলের অভিনয় অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল সন্দেহ নাই, কারণ এই সময়ে যাত্রাগুলি কতিপয় অশিক্ষিত অভিনেতা ও অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকারীর হস্তে পড়িয়া দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ঐ অধিকারীদের এরূপ অর্থবল ছিলনা যে ভাল ভাল শিক্ষিত অভিনেতা নিযুক্ত করেন বা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সাজসজ্জায় ভূষিত করেন। এ অবস্থায় এই সকল দলের নিকট সুষ্ঠু ও সুরুচি-সঙ্গত অভিনয়ের প্রত্যাশা করা একরূপ অসম্ভব ছিল। সুতরাং ইংরেজদের ঐশ্বর্য্যশালী থিয়েটারের নিকট দরিদ্র যাত্রার আসর সুরম্য হর্ম্ম্যের পার্শ্বে জীর্ণ পর্ণকুটিরের ন্যায় বোধ হইত। সেই জন্যই ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ থিয়েটারী অভিনয়ের দিকে এত অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাহ্যাড়ম্বরের মোহে পড়িয়া তাঁহারা যাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎপ্রেমের পরিবেষকরূপে যাত্রা ছিল আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ

সেকালের সখের থিয়েটার-গুলির সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক ছিলনা

জাতীয়-প্রতিষ্ঠান এবং সেই জন্য যাত্রার আসরে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু অভিজাতসম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবযুগের রঙ্গালয়সমূহে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ দূরে থাকুক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ পর্য্যন্ত সহজে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। সেগুলিতে কেবল পরিচালকবর্গের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ব্যতীত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ ও সাহেবসুবাবা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সাহেবদের প্রশংসা লাভের জন্য তাঁহারা এত ব্যগ্র ছিলেন যে, যে সকল সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদেব থিয়েটার দেখিতে আসিতেন তাঁহাদেব বোধ-সৌকর্য্যার্থ বহুব্যয করিয়া অভিনীত নাটকের ইংবেজী অনুবাদ করাইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই সকল রঙ্গালয়কে আর যাহা হউক বিনা আপত্তিতে জাতীয-নাট্যশালা নামে অভিহিত করা যাইত না।

অতএব এই সকল রঙ্গালয় যে আমাদের চিবপ্রিয যাত্রার লোপ-সাধন করিতে পারে নাই তাহা আশ্চর্য্যেব বিষয নয়। কিন্তু ইহাদেব দৃষ্টান্তে যে যাত্রার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকাব করা যায় না। এই সময়ে অনেক শিক্ষিত নাট্যকলানুরাগী ভদ্রলোক বহুব্যয়সাপেক্ষ 'থিয়েটারী' রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে অক্ষমতা বশতঃ যাত্রার দল গঠন করিয়া আপনাদের সখ মিটাইতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া যাত্রার নাটক ও পরিচ্ছদাদির যে যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা যাত্রায় যতদূর সম্ভব থিয়েটারী অভিনয়-প্রণালী ও পরিচ্ছদাদি প্রবর্তিত করিযাছিলেন, এমন কি, থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটক পর্য্যন্ত তাঁহারা অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' এবং মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' যাত্রায় অভিনীত হয়। এই সকল নাটক যাত্রার উপযোগী করিয়া লইবার জন্য কেবল গানের সংখ্যা বাড়ান ভিন্ন সেগুলির আর কিছু বিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ এক যাত্রার দলেই

যাত্রার সংস্কার সাধন

তাঁহার নটজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দল মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক অভিনয়ার্থ নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত গান রচনা করাইয়া লইতে তাঁহারা তখনকার নামকরা গীতরচক প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের শরণাপন্ন হন, কিন্তু বহু তাগাদা সত্ত্বেও যখন তাঁহার নিকট গান পাওয়া গেলনা তখন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই নাটকের গান রচনা করিয়া ইহাকে যাত্রার উপযোগী করিয়া লন। এই সূত্রে গীতরচয়িতারূপে গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের সূত্রপাত

কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালা ও অন্যান্য কয়েকটি থিয়েটারের অভিনয়ের—বিশেষতঃ তাহাদের সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি ঐশ্বর্য্যের—খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং তাহার ফলে সাধারণের মনে 'থিয়েটার' দেখিবার একটা প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল থিয়েটারের দ্বারা তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ক্যাল্‌কাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে এক সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অথচ এইরূপ নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই প্রবলভাবে অনুভূত হইতেছিল, কারণ যদিও তখন বহু সখের নাট্যশালা 'ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া' উঠিতেছিল, কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতার দৌরাত্ম্যে সে গুলির অধিকাংশেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সৌখীন অভিনেতাদের উপর জোর চলিত না, সুতরাং নাট্যাধ্যক্ষগণকে বাধ্য হইয়া তাহাদের সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। কিন্তু বলা বাহুল্য, সাধারণ নাট্যশালায় কোন বেতনভোগী অভিনেতার এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অধিক দিন চলে না।

সাধারণ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা

যাহা হউক, অবশেষে বাগবাজারের এক মধ্যবিত্ত নাট্যসম্প্রদায়

কর্তৃক এক স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা স্থাপিত হইয়া আমাদের এই অভাব পূর্ণ হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়টি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি বাগবাজারের কয়েকজন যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও অমৃতলাল বসু পরে ইহাতে যোগদান করেন। এই দলের প্রথমে নাম ছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার', পরে ইহার নাম হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' লইয়া ইহারা অভিনয় আরম্ভ করেন। এই নাটকটি সাতবার অভিনয় করিবার পর ইহারা দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাটকের মহলা দিতে আরম্ভ করেন কিন্তু নানা কারণে অভিনয় করিতে বিলম্ব হইতে থাকে। এমন সময় ইহারা সংবাদ পাইলেন যে, চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া 'লীলাবতী' নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছেন। তখন তাঁহারা অধিকতর উদ্যোগী হইয়া চুঁচুড়ায় অভিনয়ের প্রায় দেড়মাস পরেই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে নাটকটি অভিনয় করেন এবং এতদূর সাফল্য লাভ করেন যে, পরবর্তী অভিনয় দেখিবার জন্য "দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার" হয়। 'লীলাবতী' অভিনয়ের পর তাঁহারা দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহাদের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য লোকেরা যেরূপ বিষম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা একটি সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন সহায়সম্পত্তিহীন যুবকের দল; এমন কি পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইবার জন্য তাঁহারা কেবল দীনবন্ধুবাবুর সামাজিক নাটকগুলিই অভিনয়ার্থ নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় একটি স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা নির্মাণ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই

বাগবাজারের নাট্যসম্প্রদায়

দীনবন্ধু মিত্রের কতিপয় নাটকের অভিনয়

চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়

'নীলদর্পণ' নাটক

অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের নিজস্ব কোন নাট্যশালা ছিলনা—পরের বাড়ীতে ষ্টেজ খাটাইয়া তাঁহারা অভিনয় করিতেন।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। নানা আলোচনার পর অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, একটি স্বতন্ত্র বাটী বা বাটীর প্রাঙ্গণ ভাড়া লইয়া সেখানে তাঁহারা একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবেন এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় দেখাইবেন। এই টিকিট-বিক্রয়ের প্রস্তাবটি ছিল অবশ্য নূতন কথা। আমাদের দেশে যাত্রার আসর মাত্রেই পূর্ণমাত্রায় সাধারণ রঙ্গালয় ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা কখন টিকিট বিক্রয় করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আর সখের থিয়েটারের কর্তারা তাঁহাদের রঙ্গালয়ে যে সকল দর্শকগণকে প্রবেশাধিকার দিতেন, তাহাদিগের নিকট হইতে অবশ্য কোনরূপ মূল্য গ্রহণ করিতেন না। বস্তুতঃ আমাদের দেশে পূর্বে কোন সামাজিক ব্যাপারে বা সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানে ব্যবসাদারী বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই। একসময়ে বিদ্যাবিক্রয়, চিকিৎসাবিক্রয়াদি পর্য্যন্ত দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন শিক্ষক চিকিৎসক প্রভৃতির ভরণপোষণাদির ব্যবস্থা সমাজই করিতেন। এখন অবশ্য সে সকল ব্যবস্থা নাই। এখন ব্যবসায় হিসাবে না চালাইলে কোন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা দুষ্কর হয়। এই কারণেই এখানে পেশাদারী নাট্যশালা স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল। স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপন ব্যতীত নাটক বা নাট্যাভিনয়ের উন্নতি হইতে পারেনা ইহা উপলব্ধি করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেক ধনী, শিক্ষিত ও নাট্যানুরাগী ব্যক্তি কখন একক, কখন সংঘবদ্ধভাবে, স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সখ মিটিয়া যাওয়ার দরুণই হউক বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বশতঃই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, প্রতিষ্ঠাতাদের যত্নের শৈথিল্য ঘটিলেই এই সকল সখের নাট্যশালা অন্তর্হিত হইত। তদ্ভিন্ন এ সকল নাট্যশালার সহিত সাধারণের কোন

সাধারণের জন্য স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্ক ছিল না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় একটি স্থায়ী জাতীয়-নাট্যশালা স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। একাজ করিতে পারেন এক সরকার বাহাদুর অথবা মিউনিসিপালিটি, কারণ তাঁহারাই এখন আমাদের প্রাচীন সমাজের স্থান অধিকার করিয়াছেন। অতএব জাতীয়-শিক্ষালয় হিসাবে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপন করা যে তাঁহাদের উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের এ কর্তব্যবুদ্ধি শীঘ্র জাগরিত হইবে এরূপ আশা করা দুরাশা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং এখন বহু দোষত্রুটি সত্ত্বেও ব্যবসাদারী থিয়েটারের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই এবং বাগবাজারের নাট্যসম্প্রদায় যে এরূপ থিয়েটার স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদের নাম আমাদের নাট্যালয়ের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্প অতি শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তাঁহারা চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাটীর প্রাঙ্গণ ভাড়া লইয়া সেই খানেই তাঁহাদের 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা শেষ করেন এবং ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সেখানে তাঁহাদের নব রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। ইহার রঙ্গমঞ্চের নির্মাতা ছিলেন ধর্মদাস সুর। এইরূপে আমাদের নাট্যালয়ের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ইহার কয়েকমাস পূর্বে (১৮৭২ সনের ৩০শে মার্চ তারিখে) ঢাকায় মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের যে অভিনয় হয় তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তৃগণ কোন স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে তাহা করেন নাই। কেবল ঐ ভাবে চাঁদা তুলিয়া উক্ত অভিনয়টি সম্পন্ন করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

প্রথম স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা স্থাপন

উল্লিখিত যুগান্তরকারী নব নাট্যশালাটির নাম দেওয়া হয় "ন্যাশান্যাল থিয়েটার"। কিন্তু এই নামকরণ লইয়া দলের মধ্যে একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র সমস্ত জাতির নাম লইয়া এইরূপ একটি দরিদ্র নাট্যালয় স্থাপনের

'ন্যাশান্যাল থিয়েটার'

পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি বলিলেন, এরূপ নাম দিলে ভিন্ন জাতির চক্ষে বাঙালীজাতি হীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দলের অন্য ব্যক্তিরা যখন তাঁহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি দলের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন এবং নীলদর্পণ নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইহার আড়াই মাস পরে যখন ন্যাশান্যাল থিয়েটার মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন, তখন তিনি বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাতে যোগদান করেন। উক্ত ঐতিহাসিক নাটকটি অভিনয় করিবার পূর্বে এই থিয়েটার দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ব্যতীত, তাঁহার 'জামাইবারিক', 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপাস্বিনী', 'লীলাবতী' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো' এবং শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' অভিনয় করেন। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এ সকল নাটক অভিনয় করিতে তাঁহাদের ব্যয়বহুল পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় নাই। বলিয়াছি, মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার ক্ষমতা তখন তাঁহাদের ছিলনা।

থিয়েটারটির "ন্যাশান্যাল" নাম দিয়াছিলেন,—নবগোপাল মিত্র মহাশয়। নবগোপাল বাবুর সহিত আলাপের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জানেন জাতীয়ভাবে তিনি কিরূপ বিভোর ছিলেন। তাঁহার কাগজের নাম ছিল "ন্যাশান্যাল পেপার" এবং প্রায় সকল ব্যাপারেই তাঁহার মুখে একমাত্র বুলি ছিল, 'ন্যাশান্যাল'। এই জন্য লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল, 'ন্যাশান্যাল নবগোপাল বাবু'। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষভাগে দেশে জাতীয়ভাবোদ্দীপক যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। বাঙালী যুবক ও বালকদের দেহে ও প্রাণে বল সঞ্চার করিবার জন্য তিনিই প্রথম "ন্যাশান্যাল স্কুল" নাম দিয়া একটি রীতিমত ব্যায়াম-শিক্ষাগার স্থাপন করেন, এমন কি "ন্যাশান্যাল সার্কাস্" নাম দিয়া একটি বাঙ্গালী সার্কাস্‌ও খোলেন। প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগেই সেকালের "ন্যাশান্যাল সোসাইটি" বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়ভাব উদ্দীপনার্থ বাৎসরিক "হিন্দুমেলা"

জাতীয়ভাবোদ্দীপক আন্দোলনের অন্যতম নেতা নবগোপাল মিত্র

অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়সভা ও হিন্দুমেলাকে কংগ্রেসের অগ্রদূত বলিলে অন্যায় হয় না। এই মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সভা ও মেলার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু প্রমুখ শিক্ষিতদলের বহু নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত সন্তান", মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানগুলি এই মেলাতেই গাহিবার জন্য প্রথম রচিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ সে বৎসরে রাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "দিল্লীর দরবার" সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তাহার শেষ চরণ এই—

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাবনা,
আমরা গাবনা হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন বসু "দিনের দিন" গানটি তাঁহার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে জুড়িয়া দেন এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রিটিশ' স্থানে 'মোগল' বসাইয়া তাঁহার 'স্বপ্নময়ী' নাটকের নায়ক শুভসিংহের স্বগতোক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশ করেন।

রঙ্গালয়ের দ্বারা এই জাতীয়ভাব প্রচারে কতটা সাহায্য হইতে পারে তাহা নবগোপাল বাবু বেশ জানিতেন। সেইজন্য তিনি থিয়েটারকে কেবল 'ন্যাশান্যাল' নাম দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু যাহাতে জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটকাদি রচিত হইয়া তথায় অভিনীত হয় তাহার জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জাতীয় সভা'র কয়েকটি অধিবেশন 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-গৃহেই হইয়াছিল।

জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটকাবলী

প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া ন্যাশান্যাল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে "ভারতমাতা" নামক রূপক-নাট্যের একটি দৃশ্য তাঁহাদের নাট্যমঞ্চে প্রদর্শন করেন এবং পরদিন হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেলাস্থলে 'ভারত রাজলক্ষ্মী' নাটক অভিনয় করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকাবলী

ইহার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম স্বদেশপ্রেমাত্মক ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' বেঙ্গল থিয়েটারে এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই ধরণের আরও যে সকল নাটক এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহেন্দ্র বসুর 'পদ্মিনী' ও প্রমথ মিত্রের 'জয়পাল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ সে সময়ে দেশভক্তির এক প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের নাট্যজগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। এমন কি, এই সময়ে অভিনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক পারিবারিকনাটক হইলেও উহাদের কলেবর জাতীয়ভাবোদ্দীপক দৃশ্যে, বক্তৃতায় ও গানে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়! ইহার পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'রাণা-প্রতাপ' বিষয়ক 'অশ্রুমতী' নাটক লিখিত ও অভিনীত হয় এবং তাহার তিন বৎসর পরে তিনি শুভসিংহের (বা শোভাসিংহের) বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'স্বপ্নময়ী' নাটক রচনা করেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল।

ইহাই হইল আমাদের বর্তমান যুগের নাট্যশালার ইতিহাসের প্রথম পর্ব। এক্ষণে দেখা যাউক এই যুগপরিবর্তনের ফলে আমাদের পুরাতন নাটকের ধারার কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

---

# পঞ্চম অধ্যায়

## বর্তমান যুগের আদিপর্ব

অনেকে বলেন, এদেশে পাশ্চাত্য-ধরণের নাট্যশালা স্থাপনেব সহিত আমাদের নাট্যসাহিত্যের ধারাও সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে—

নবযুগেব প্রকৃত স্বরূপ

নাট্যশালার ন্যায় আমাদের নাটকও একেবারে বিলাতীভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আমাদের পুরাতন দেশীনাটকের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই, এ মতের ভিত্তি ।বশেষ দৃঢ় নয়। অন্ততঃ যে সময় থিয়েটারী নাটক প্রথম প্রবর্তিত হয় সে সময়ের সমালোচকেরা যে তাহার সহিত যাত্রার নাটকের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাহা তখনকার সংবাদপত্রগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বলিয়াছি, ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু থিয়েটার’ই ছিল বাঙালার প্রথম ‘থিয়েটার’। কিন্তু ইহাতে কেবল ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। এই থিয়েটারের প্রথম নাটক ইংরেজীতে অনূদিত ‘উত্তররামচরিত’ নাটক সম্বন্ধে সেকালের সংবাদপত্র ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, লেখক যাত্রার অভিনয়ের সহিত এই অভিনয়ের তুলনা করিয়া নূতন রঙ্গালয়ের কেবল সাজসজ্জা, এবং অভিনেতাদের বেশভূষা শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিরই প্রশংসা করিয়াছেন। নাটকেব বিলাতী পরিচ্ছদ সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কোন নূতনত্ব দেখিতে পান নাই। নাটকটিকে তিনি ‘রামলীলা নাটক’ এবং তাহার অভিনয়কে ‘রামযাত্রা’ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

“এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানা প্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটকগ্রন্থ সকল বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে কেবল কালীয়দমন

রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায়। এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয়, ইঁহারা ধনীলোকের সন্তান ইঁহাদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না। কালিদমুনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে, তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে, সম্মুখ হইতে যায় না, সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয়। এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই। ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকার বেশভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন একরকম বেশ করিয়া দেয়। (তাহারা) কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। ইঙ্গরেজাধিকারী তাহা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহারা যে যে সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমালোচক মহাশয় এই নাট্যাভিনয়কে কোন অভূতপূর্ব পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই—তাঁহার মতে একটি প্রাচীন প্রথা যাহা "রাঢ়-দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তান"দের হাতে পড়িয়া দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এই অভিনয়ের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিচালকবর্গ তাহাকেই পরিমার্জিত করিয়া নবজীবন দান করিয়াছিলেন মাত্র। প্রভেদ নাট্যবস্তুতে নয়, সাজসজ্জায় ও পরিচালনায়। দরিদ্র ও অশিক্ষিত অধিকারীর পরিবর্তে ধনী ও শিক্ষিত অধিকারীর হস্তে পরিচালনার ভার পড়ার ফলে নাট্যাভিনয়ের যে উন্নতি প্রত্যাশা করা যাইত কেবল তাহাই দেখা গিয়াছিল। সমালোচক "ইঙ্গরেজ অধিকারী"দের প্রশংসা করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের "অবিকল সং" সাজাইবার কৃতিত্বের জন্য। কিন্তু ইহার পর 'সং সাজিবার' জন্যও

নবযুগ পুরাতন ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত

আমাদের অভিনেতাদিগকে কোন "ইঙ্গরেজাধিকারী"র দ্বারস্থ হইতে হয় নাই, তাঁহারা নিজেরাই তাঁহাদের বেশভূষার যথেষ্ট পরিমাণে পারিপাট্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

বাস্তবিক নবযুগের রঙ্গালয়-প্রবর্তকেরা রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপট ভিন্ন আর কোন বিষয়ে যে বিলাতী আদর্শের অনুকরণ করেন নাই, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যাইতে পারে। বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁহারা নাটকের বাহ্যগঠন-প্রণালী বিষয়ে সেক্সপিয়ারাদির রীতি অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বন করিযাছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের ভিতরের বস্তু সম্বন্ধে জাতীয়-আদর্শ গ্রহণ করাই তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেশ জানিতেন, যে নাটকের সহিত জাতির নাড়ীর সংযোগ নাই, তাহা কখন জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেনা। সেই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিলাতী নাটকের পরিবর্তে শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতামাধব, বেণীসংহার প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটক অথবা শর্ম্মিষ্ঠা, রুক্মিণীহরণ, রামাভিষেক, সীতার বনবাস, হরিশ্চন্দ্র, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সতী-নাটক প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক কিংবা কাদম্বরী ও বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অর্ধ-পৌরাণিক নাটক অভিনয় করিতে দেখি। বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লং সাহেব ( Rev. J. Long ) বাংলা সরকারকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লেখেন, "A taste for Dramatic Exhibition has lately revived among educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu Dramas are more valuable than translations from English plays". ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমাদের বঙ্গালয়-সংস্কারকেরা কোন বিলাতী নাটক আমদানী করিতে চাহেন নাই, প্রাচীন নাটকেরই কালোপযোগী সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা নবযুগের ভাবধারা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

নূতন নাটক পুরাতন নাটকেরই নবরূপ

সে সময়ে সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে কোন ভাবপ্রবাহ সঞ্চালিত করিতে হইলে রঙ্গালয়ের অপেক্ষা শক্তিশালী সহায় যে আর নাই তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদের অনুরোধে বা সাহায্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' 'বিধবাবিবাহ' 'নবনাটক' প্রভৃতি কয়েকটি সমাজসংস্কারাত্মক নাটক এবং অষ্টম দশকে 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী' প্রভৃতি কতিপয় জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, এ কথা গত অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এগুলি ছিল সাময়িক নাটক মাত্র—যে সকল আন্দোলনের ফলে উহাদের সৃষ্টি সে সকলের বেগ কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের আদর কমিয়া গিয়াছিল এবং ক্রমশঃ উহারা বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, নিছক বিলাতী নাটক যে এদেশে চলিবেনা তাহা তাঁহারা প্রথমাবধি জানিতেন এবং সেই জন্য হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস', মাইকেলের 'পদ্মাবতী', হরলাল রায়ের 'কঙ্কাল' প্রভৃতির ন্যায় যে সকল নাটক মাঝে মাঝে বিদেশী নাটক বা গল্প অবলম্বনে লিখিত হইত সেগুলিকে দেশী ছাঁচে ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদের রূপ বদলাইয়া দেওয়া হইত। এইজন্যই সেক্সপিয়রের Merry Wives of Windsor-এর Sir John Falstaff দীনবন্ধুর "নবীন তপস্বিনী"তে 'জলধর'রূপ পরিগ্রহ করিয়া পূর্ণমাত্রায় বাঙালী হইয়া গিয়াছেন।

বলিতে কি, ইংরেজী নাটক যে পরিমাণে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট ও রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের নাটকের উপর বিদেশী প্রভাব তদপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এলিজাবেথান্ যুগের নাট্যকারগণের প্লটের খোরাক যোগাইতেন ইতালিয়ান গল্পলেখকগণ। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ফরাসী নাট্যকারগণের নাটক বেমালুম আত্মসাৎ

পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারগণের তুলনায় আমাদের নাট্যকারগণ বিদেশের নিকট অধিকতর ঋণী নহেন

করিয়া ইংল্যাণ্ডের রঙ্গালয় আপন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত। তখন 'কপিরাইট' আইনের বালাই ছিলনা, আর উক্ত নাটকগুলি ঘটনা-প্রধান হওয়াতে সেগুলি অনুবাদ করাও সহজ ছিল, সুতরাং অপহরণ-কার্য্য বিনাবাধাতেই চলিয়াছিল। তথাপি ইংরেজী নাটককে ইংল্যাণ্ডের জাতীয়-নাটক বলা যায়, কারণ ইহার মূলভিত্তি ইংরেজী। বাহির হইতে ঋণগ্রহণের ফলে ইংল্যাণ্ডের নাটক ও রঙ্গালয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অঙ্গটা তাহার আপন। আমাদের দেশের নাটক ও রঙ্গালয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সাহিত্য ও কলাক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে এরূপ ভাবে লোফালুফি চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাহা দ্বারা জাতির মৌলিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় না, বরং তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

বাস্তবিক জাতির চিরন্তন ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে না। পিতৃপুরুষ হইতে আগত ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বনই প্রকৃষ্ট পন্থা, কারণ অন্য ধারা অনুসরণ করিতে গেলে তাহার নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য গীতা 'পরধর্ম' অর্থাৎ স্বায় জন্মগত সংস্কার ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্মকে 'ভয়াবহ' বলিয়াছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়েই এই কথা সমর্থন করে। এপর্য্যন্ত কোথাও অতীতকে ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান গড়িয়া উঠে নাই, কখন উঠিতে পারেনা। নাটকের ইতিহাসের দ্বারাও এই সত্য সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুনরায় এলিজাবেথের সময়ের নাটকগুলির কথা বলা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় যেন এই সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে সেকালের পৌরাণিক-যাত্রার যুগ অর্থাৎ 'মিস্টারি ও মিরাক্‌লের যুগ' অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু এলিজাবেথান্ যুগের নাটক সমূহ যে ঐ গত যুগেরই উত্তরাধিকারী তাহার প্রমাণ এসময়ের রচিত নাটকগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এমন কি, সেক্সপিয়ারও 'মিস্টারি

জাতীয় সংস্কৃতির উপর স্থাপিত না হইলে কোন প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্য স্থায়ী হয় না

যুগে'র প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন চরিত্রের মুখে যে সুদীর্ঘ উপদেশমূলক বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা যে 'মিস্টারি' জাতীয় নাটক হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন সুধী সমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, "Elizabethan stage was made to serve as a pulpit for a sermon, a platform for a lecture and a singing gallery for a ballad." বলা বাহুল্য, এ সকল বৈশিষ্ট্য নাট্যকারগণ পূর্বতন যুগ হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের যাত্রার আসরও ছিল,—একাধারে আচার্য্যের বেদী, বক্তার মঞ্চ ও নাচগানের মজলিস। আর আমাদের বর্তমান রঙ্গমঞ্চ বিদেশী পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও যে তাহারই সন্তান তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক নাটকের ক্রমোন্নতি প্রবাহ সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলিয়াছে—প্রাচীনতম নাটকের সহিত নবীনতম নাটকের সংযোগসূত্র কোথাও ছিন্ন হয় নাই। এই জন্যই উক্ত সমালোচক পাশ্চাত্য নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"We can trace an unbroken chain from the crudest mythological pantomime of primitive man down to the severest problem play of Ibsen, if we can behold all the links." আমাদের নাটক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে।

পুরাতন নাটকের সহিত নূতন নাটকের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন

এই কারণেই আমাদের বঙ্গালয়ের নবযুগ-প্রবর্তকেরা ইংরেজীতে পূর্ণমাত্রায় কৃতবিদ্য হইয়াও পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং পুরাতন দেশীচিত্রকেই তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন—কেবল শিক্ষিতসমাজের রুচি অনুসারে তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য তাহাতে নূতন রং লাগাইয়া বিলাতী ফ্রেমে সেটিকে আঁটিয়া দিয়াছিলেন এবং সেজন্য যেটুকু কাটছাঁট করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তাঁহারা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যায়, কলিকাতার

নবযুগের নাটক বস্তুতঃ বিলাতীফ্রেমে আঁটা দেশী চিত্র

ময়রারা এক শ্রেণীর বাবুদের রুচি বুঝিয়া অন্যান্য আকারের সন্দেশের সহিত 'চপ্' অথবা হংসডিম্বের আকারের সন্দেশও প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফলে সন্দেশ যেমন সন্দেশই থাকে, আকারগত প্রভেদের জন্য তাহার গুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ বিলাতী রঙ্গমঞ্চে চড়িয়াও আমাদের দেশী নাটকের অন্তঃপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয় নাই। মুসলমান আমলে উচ্চশ্রেণীর বাঙালাদের বেশভূষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, ইংরেজ আমলেও আরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ভিতরের প্রাণের কোন ব্যত্যয় হয় নাই— আমাদের নিজস্ব, আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য আমরা কখনও বিসর্জন দিই নাই এবং আশা করি কখনও দিবনা।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য সংস্কৃত নাটক হইতে অনূদিত নাটকগুলির আকার ও গঠন প্রণালী অধিক পরিবর্তন করিতে হয় না, কারণ ঐসকল সংস্কৃত নাটক সেকালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রার নাটককে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করিতে হইলে স্বভাবতই জুড়িগান প্রভৃতি তাহার দুই একটি বৈশিষ্ট্য বর্জন করা আবশ্যক হয় এবং তাহার গীতাংশ যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া তাহার স্থলে সংলাপাংশ ও ক্রিয়াংশ বৃদ্ধি করিয়া দিতে হয়। পক্ষান্তরে থিয়েটারের নাটককে যাত্রার নাটকে পরিণত করিতে হইলে তাহাতে গানের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু উভয় প্রকার নাটকের প্রকৃতিগত প্রভেদ এত অধিক নয় যে, এক প্রকার নাটককে অন্য প্রকার নাটকে পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হয়। আমরা জানি, অনেক যাত্রার নাটক থিয়েটারী নাটকে এবং অনেক থিয়েটারী নাটক যাত্রার নাটকে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে এবং তাহাতে কোন অসঙ্গতি বা অসুবিধা অনুভূত হয় নাই। এই সময় যে সকল শিক্ষিত ভদ্রসন্তান অভিনয়ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং নানা কারণে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিতে অক্ষম হইয়া যাত্রা করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে

থিয়েটারী-নাটক ও যাত্রার নাটকের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান কালে নাই বলিলে চলে

অনেক সময় থিয়েটারের নাটকই অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপে উভয় প্রকার নাটকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে যাত্রায় কেবল ধর্ম্মমূলক নাটক অভিনীত হইত, কিন্তু এখন হইতে সর্ববিধ নাটকই যাত্রার আসরে স্থান পাইতে লাগিল, পূর্ব্বে যাত্রা ছিল ভাব ও রসপ্রধান, কিন্তু এখন অনেকটা দৃশ্য ও ঘটনাপ্রধান হইয়া পড়িল। যাত্রার বৈশিষ্ট্যের এই পরিবর্তনসাধন ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচার এখানে করিব না। কিন্তু সেকালের অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকেরও যে ইহা ভাল লাগে নাই তাহা তৎকালের প্রধান পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' পাঠ করিলে বুঝা যায়। এই নূতনধরণের যাত্রার সমালোচনা করিয়া উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—"ইহাতে শামলা আছে, পেণ্টলুন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার জিনিষ যথেস্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নূতন যাত্রাতে বেশভূষার এত জাক! সঙ্গীত ও কাব্যরসের এত অভাব!"

আমাদের "যাত্রিক" মনোবৃত্তি

এক বিষয়ে এই সকল প্রগতিশীল যাত্রা থিয়েটার অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছিল। অভিনয়োপযোগী ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—যাহা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে প্রসিদ্ধ—তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ সনে। ঐ বৎসর এই ছন্দ প্রথমে রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে, পরে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'রাবণবধ' নাটকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার নয় বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ যাত্রাধিকারী ব্রজমোহন রায় তাঁহার "দানববিজয়" নাটকে সাফল্যের সহিত এই ছন্দ প্রবর্তন করেন। ব্রজমোহন পূর্বে পাঁচালীওয়ালা ছিলেন, পরে পাঁচালী ছাড়িয়া যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পাঁচালী, যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে বাস্তবিক কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিদ্যমান ছিল না। পাঁচালী হইতে যাত্রা এবং যাত্রা হইতে

থিয়েটারের যে ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছিল, ইহা তাহারই একটি সমর্থক প্রমাণ। বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটার যে যাত্রারই পরিমার্জিত সংস্করণ, তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, এখনও থিয়েটার হইতে যাত্রার প্রধান অঙ্গ গান বর্জন করিতে পারা যায় নাই। আমরা চিরকালই গানের পক্ষপাতী এবং এই প্রবৃত্তি আমাদের এত প্রবল যে শ্মশানে মশানে যুদ্ধক্ষেত্রেও আমরা গান শুনিতে চাই। এইজন্য এখানে সাবিত্রী ও বেহুলা স্ব স্ব মৃতপতি কোলে করিয়া গান গায়, মশানে উত্তোলিতখড়েগর নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর গান ধরিয়া আসর জমায়, সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু ভক্তিপূর্ণ গান গাহিয়া কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করে! এই সিনেমা-থিয়েটারের যুগেও যে যাত্রার জনপ্রিয়তা কমে নাই তাহার একটা প্রধান কারণ—আমাদের এই সঙ্গীতপ্রিয়তা।

আমাদের অদম্য সঙ্গীতানুরাগ

এদেশের জনসাধারণের এই মনোভাব থিয়েটার-প্রবর্তকদের অবশ্য অজ্ঞাত ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা প্রত্যেক নাটকে গান দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহারা স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করিতেন না এবং পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে ভাল গায়কের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। সুতরাং তাঁহারা বাহির হইতে স্বতন্ত্র গায়ক আনিয়া নেপথ্যে গান গাওয়াইতেন অথবা তাঁহাকে বাউল, উদাসীন, ভিখারী বা ঐ প্রকার একটা কিছু সাজাইয়া দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। গিরিশ বাবুর বিখ্যাত "লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার" শীর্ষক শ্লেষাত্মক গানে একটি পংক্তি আছে—"অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান"। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়কে নেপথ্যে গান গাহিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল—এই পংক্তিতে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেকালের নাটকগুলির অধিকাংশ গানই গায়ক-অভিনেতার অভাবে নেপথ্যে গীত হইত। অনেক সময় নাটকের বিষয়বস্তুর সহিত এই সকল গানের বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। সুতরাং সেগুলি গাওয়া

না হইলে নাটকের কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু দর্শকদের তৃপ্তির জন্য সেগুলি গাহিতেই হইত। যদি নাট্যকার গীত রচনা করিতে অপারক হইতেন তাহা হইলে অপরকে দিয়া গান লিখাইয়া লওয়া হইত। এখনও তাহা হইয়া থাকে। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়-চন্দ্রের পরিচালনায় 'লীলাবতী' নাটকের যে অভিনয় হয়, তাহাতে সাত আটটা গান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি নাটকের শেষে একটা গান সময়মত রচিত না হওয়াতে উদ্যোক্তারা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ ভোজের শেষে মিষ্টান্নের ন্যায় নাটকের শেষে একটা গান তখন অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক, নাটকটির প্রথম অভিনয়ের দিন একটা প্রাচীন খেমটা গান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গাওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই নাকি "সেদিনের আসর রক্ষা, রস রক্ষা ও মান রক্ষা" হইয়াছিল।

তথাপি সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক দল ছিলেন, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতই হউক অথবা গীতরচক ও গায়কের অভাব বশতই হউক, নাটক হইতে গান বর্জন করা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এই সঙ্গীত-পিপাসু দেশে যে গীতহীন নাটক চলিতে পারেনা তাহা সেকালের অন্যতম প্রধান নাট্যকার মনোমোহন বাবু তাহাদিগকে এক সভায় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে এই সভা হইয়াছিল। তাহাতে মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন,—"আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের একরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান

নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা, যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারেনা বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢব, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন— অধিক কি, যে দেশে দিনভিখারী ও রাতভিখারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায়না—সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং বং ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহার কারণ কেবল গান ভিন্ন আর কিছুই না। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে যাত্রাওয়ালা যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকও তদ্রূপ হউক। আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।” থিয়েটার-প্রবর্ত্তকেরা যে প্রারম্ভ হইতেই এই মতানুসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যাত্রার নাটকে থাকিত কথায় কথায় গান—কথাগুলি বলা হইত যেন কেবল গানগুলিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য—কিন্তু থিয়েটারী নাটকে কথোপকথন ও নাটকীয় ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, গানগুলি দেওয়া হইত কেবল সঙ্গীতপিপাসুদের তৃপ্তিসাধনার্থ।

গীতহীন নাটক এদেশে চলে না

কিন্তু মনোমোহন বাবুর উল্লিখিত উপদেশমূলক বক্তৃতার মধ্যে দেখা যায় যে, যাত্রাওয়ালাদের গানের প্রশংসার সঙ্গে তিনি তাহাদের “সং রং ঢং ইত্যাদি তামাসা” প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট নিন্দা

করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ন্যাশান্যাল থিয়েটারও এই বিষয়ে কম অপরাধী ছিলেন না। থিয়েটার খুলিবার মাত্র এক মাস পরেই আমরা দেখি যে, দীনবন্ধু বাবুর হাস্যরসাত্মক নাটক "বিয়ে পাগলা বুড়ো"র অভিনয়ের সহিত তাঁহারা 'কুড়োর কুঘটন' 'নববিদ্যালয়' 'মুস্তফি সাহেবের পাকা তামাসা' 'পরীস্থান' প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল 'প্যাণ্টোমাইম' ও যাত্রাদলের 'সং রং ঢং' একই জাতিভুক্ত ছিল। আসল কথা এই যে, জনসাধারণ চিরকালই রঙ্গরস ভালবাসে এবং সেই জন্য ভোজের সঙ্গে চাটনির মত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে ঐরূপ রঙ্গরসের পরিবেষণ একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ রসকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তথাপি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া এ কার্য্য করিতে হয়, কারণ অনেক নেসাখোর যেমন অন্ন ফেলিয়া নেসার দ্রব্যে আসক্ত হয়, তেমনই একশ্রেণীর দর্শক ভাল নাটকের পরিবর্তে রঙ্গরস নাচ গান প্রভৃতিরই বেশী আদর করে। এ প্রবৃত্তি কেবল আমাদের দেশেই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশেও ইহার প্রাবল্য আমাদের দেশ অপেক্ষা কম নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ডের বড় বড় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দর্শকগণের তুষ্টিবিধানার্থ বহুব্যয়ে ইতালিয়ান গায়ক ও ফরাসী নর্তকগণকে পোষণ করিতে বাধ্য হইতেন, নতুবা তাঁহাদের প্রেক্ষাগৃহ দর্শকশূন্য হইত। এইরূপে তাঁহাদের লাভের অধিকাংশই এই বিদেশী শিল্পীরা খাইয়া ফেলিত। একবার এইরূপ একজন শিল্পী দশহাজার গিনি উপার্জন করিয়াছিলেন, অথচ বড় বড় ইংরেজ অভিনেতাকে সে সময় অর্ধাহারে থাকিতে হইত। কিন্তু প্রতিকারের উপায় ছিল না, কারণ দর্শকেরা তাহাদিগকে চাহিত।

লোকশিক্ষার নামে সং রং-এর প্রদর্শন আমাদের বৈশিষ্ট্য নয়—ইহা সার্বদেশিক ও সার্বকালিক

এই সকল বিদেশী গায়ক ও নর্তক ব্যতীত প্যাণ্টোমাইম্ এবং 'পাঞ্চিনেলো' (punchinello) বা পুতুলনাচও খুব জনপ্রিয় ছিল।

এগুলিও ইতালি হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। এই পুতুলনাচ-গুলিই ছিল সেকালের চলচ্চিত্র; এবং এখনকার সিনেমার মতই সেগুলি তখনকার থিয়েটার সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্যাণ্টোমাইম্ ও পুতুলনাচগুলি কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তাহার পরিচয় আমরা সেক্সপিয়ার ও বেন্ জনসন্ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অনেক নাট্যকারের মুখে শুনিতে পাই। ফলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বাধ্য হইয়া স্ব স্ব থিয়েটারে প্যাণ্টোমাইম দেখাইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল বড় অভিনেতা তাঁহাদের এই সব প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে রঙ্গালয় হইতে অপসারণ করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেন, তাঁহারাই আবার যখন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া বসিতেন তখন সেই সকল পুরাতন শত্রুকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। যখন Cibber ড্রুরি লেন্ থিয়েটারে অভিনেতামাত্র ছিলেন, তখন তিনি সেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ Rich-কে অর্থলোভে ঐ সকল তামাসা দেখানর জন্য কত গালাগালিই না দিয়াছিলেন, কিন্তু বহু বৎসর পরে তিনি যখন বৃদ্ধ Rich-এর হস্ত হইতে থিয়েটারের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি প্যাণ্টোমাইম্ ভাল করিয়াই চালাইলেন এবং অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বিবেক ইহার বিরোধী বটে, কিন্তু কি করিব? জনমতের বিরুদ্ধে চলিয়া অনাহারে মরিবার মত দৃঢ় ধর্ম্মজ্ঞান আমার নাই।" তাঁহার সহযোগী বিখ্যাত অভিনেতা Booth এই কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, "A thin audience is a much greater indignity to the stage." ইহার শতাধিক বৎসর পরে যখন নটশ্রেষ্ঠ গ্যারিক ড্রুরি লেনের অধ্যক্ষ হন, তখন তিনিও ইতালীয় প্যাণ্টোমাইম ও ফরাসী নর্ত্তকদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; এমন কি, সময়ে সময়ে সেক্সপিয়ারের নাটক—যাহা অভিনয় করিয়া তিনি অতুল যশ লাভ করিয়াছিলেন—তাহারও অভিনয় বন্ধ করিয়া ঐ সকল বিজাতীয় তামাসাকে স্থান দিতে তিনি বাধ্য হইতেন। তাঁহার পর সুবিখ্যাত

প্যাণ্টোমাইম্ প্রভৃতির আক্রমণের ফলে ইংল্যাণ্ডের নাট্যালয়ের দুর্দশা

শেরিডান উক্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হন, কিন্তু তাঁহাকেও ঐরূপ বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

শেরিডানের পর প্রায় দেড়শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে—থিয়েটারের দর্শকবৃন্দের শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এই সকল তামাসা দেখিবার প্রবৃত্তি তাহাদের কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেকালের একজন সমালোচক (James Ralph) দুঃখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক—"Such is the depravity of human nature, that if we are not pleased, we will not be instructed; therefore all the additional ornaments to stage-entertainments are highly necessary to entice us in, else we should never sit out a tedious lecture of morality......The generality of mankind are...in a state of infancy the greatest part of their lives." বাস্তবিক বয়োবৃদ্ধির সহিত মানুষের শিশুমন যে একেবারে চলিয়া যায় না, ইহা আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং সেই মনকে তুষ্ট করিবার জন্য রঙ্গীন খেলনা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখিতেই হয়। এ ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষা বা উপদেশ দিতে গেলে বিদ্রোহী মন তাহা গ্রহণ করিবে না। সেই জন্যই রঙ্গালয়ে এই সকল "সং বং ঢং ইত্যাদি তামাসা" দেখাইতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, সেই শিশুসুলভ মনের তলায় থাকে ভাবগ্রাহী ও চিন্তাশীল আর একটা মন—সে যে রসপ্রার্থী তাহা প্যাণ্টোমাইমওয়ালারা দিতে পারে না—পারেন কেবল রসজ্ঞ, ভাবুক ও মননশীল মহাজনেরা। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা এইরূপ মহাজন, সুতরাং রঙ্গালয়ে তাঁহাদের প্রভাব কোন কালেই বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক থেলার (Thaler) তাই বলিয়াছেন,—"The popularity of musical extravaganza need discourage no lover of the legitimate drama and no honest fancier of what is best

রঙ্গালয়ে উচ্চশ্রেণীর নাটকের আধিপত্য লুপ্ত হইতে পারে না

in that jolly jingling kind need be ashamed of his predilection. On the other hand, good comedy and good tragedy are not dead. Pinero, Jones and Barrie, Stephen Phillips, Galsworthy, Masefield, Synge, Bernard Shaw and a lot of others hold the stage in the flesh or in the spirit." অধ্যাপক ফেলার ইংল্যাণ্ডের রঙ্গনাট্যগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের রঙ্গনাট্যগুলির সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। এ সকল চুটকী নাটিকা যতই জনপ্রিয় হউক না কেন, প্রকৃত নাটকের আদর বা মর্য্যাদা ইহারা কখন হ্রাস করিতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর নাটকের লেখকগণ রঙ্গালয়ে চিরদিন আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। সুতরাং রঙ্গালয়ে হাস্য-কৌতুকময় তরল রঙ্গনাট্যের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া হতাশ হইবার বা সেগুলি উপভোগ করিতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

যাহা হউক, উক্ত দোষ সত্ত্বেও ন্যাশান্যাল থিয়েটারের দল যে আমাদের নাট্যজগতে একটা নূতনধারা আনিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের উন্নতিও প্রথমে বেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের অভিনয়ের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দর্শকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহাদের অর্থাগমও আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অর্থাগম হইতেই অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছিল। অবিলম্বে টাকাকড়ির হিসাবপত্র ভাগ বাটোয়ারা লইয়া কর্তাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল এবং থিয়েটার প্রতিষ্ঠার তিনমাস পরেই দলটি ভাঙ্গিয়া দুইটি দলে পরিণত হইল। একটির 'ন্যাশান্যাল' নামই বজায় রহিল, অপরটি প্রথমে "হিন্দুন্যাশান্যাল," পরে 'গ্রেট ন্যাশান্যাল' নাম ধারণ করিল। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'ন্যাশান্যাল' দল "গ্রেট ন্যাশান্যালে"র সহিত মিলিত হইয়া এই সকল বিবাদের অবসান করেন। ইহার পূর্বে শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক "বেঙ্গল

ন্যাশান্যাল থিয়েটারে দলাদলি

থিয়েটার” নামে আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক লইয়া ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ইহা ভিন্ন 'ন্যাশান্যাল' থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাস পরে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' নামে আরও একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, বিশেষ সফলতাও লাভ করিতে পারে নাই। বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শ মত স্ত্রীলোকের অংশ অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা একেবারে নূতন ছিল না, কারণ লেবেডেফ সাহেব ও নবীন বসু উভয়েই তাঁহাদের রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং অনেক যাত্রাতেও অভিনেত্রী দেখা যাইত, কিন্তু নবযুগের প্রবর্ত্তকেরা সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই। বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রী গ্রহণ করাতেও প্রথমে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে সকল সাধারণ থিয়েটারই তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটার

বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যমঞ্চ বিডন ষ্ট্রীটে তাহার নিজস্ব গৃহেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সে সৌভাগ্য হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলা বাহুল্য পরের আঙ্গিনায় থিয়েটার করার অসুবিধা ছিল অনেক। বর্ষাকালে ত সেখানে অভিনয় করাই চলিত না। তাহার পর যখন পরস্পরের বিবাদের ফলে তাঁহারা সে গৃহ ছাড়িলেন, তখন দুই দলই আজ এখানে, কাল ওখানে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে ভুবনমোহন নিয়োগী নামে এক ধনীর অর্থানুকূল্যে এবং ধর্ম্মদাস সুরের উদ্যোগে বিডন ষ্ট্রীটে যেখানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত সেইখানে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের বাটী নির্ম্মিত হইল। কলিকাতার গড়ের মাঠে ইংরেজদের যে 'লিউইস থিয়েটার' স্থাপিত হইয়াছিল, ধর্ম্মদাসবাবু তাহারই অনুকরণে বাটীটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার জন্য তিনি কোন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কেবল দুই চারিখানি দৃশ্যপট

গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার

গ্যাবিক নামে এক সাহেব চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইয়াছিলেন। বাটীটির ভিত্তিপ্রস্তর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক স্থাপিত হয়। সাধারণ বঙ্গালয় কর্তৃক এই দুইটি নিজস্ব নাট্যশালা নির্মাণ বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহারই ফলে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী হয়। এতদিন ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু কেবল বাটী হইলেই থিয়েটার চলে না, তাহার জন্য নাটক চাই এবং সে নাটক এমন হওযা চাই যাহা দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতে পাবে। ন্যাশান্যাল থিয়েটার দীনবন্ধুর ও বেঙ্গল থিযেটাব মাইকেলেব নাটক লইয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাবা উভযেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পবলোক গমন করেন। ফলে যে কয়খানি নাটক তাঁহাবা লিখিয়া গিযাছিলেন সেইগুলির উপবেই কিছুদিনেব জন্য এই থিযেটাবদ্বয়কে নির্ভব করিতে হইযাছিল। এতদ্ভিন্ন হবলাল বাযের 'হেমলতা,' 'রুদ্রপাল' ( 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে লিখিত ) 'শত্রু-সংহাব' ( 'বেণীসংহাব' অবলম্বনে লিখিত ) প্রভৃতি বীববসপ্রধান নাটক, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুবের জাতীয ভাবোদ্দীপক 'পুরু বিক্রম,' 'সবোজিনী' ও 'অশ্রুমতী' নামক ঐতিহাসিক নাটকত্রয়, উপেন্দ্র নাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নামক জাতীয়-ভাবগন্ধী পারিবারিক নাটকদ্বয়, শিশির কুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেযা', রামনারায়ণের 'নবনাটক' প্রভৃতি দুই তিনখানি সমাজ-সংস্কারাত্মক নাটক, প্রমথ মিত্রের 'নগনলিনী', 'জয়পাল', 'শুম্ভসংহার' প্রভৃতি নাটক, 'রত্নাবলী,' 'মালতীমাধব,' 'কাদম্বরী,' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি দুই চাবি খানি পুরাতন নাটক এবং কতিপয় গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনীত নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মাঝে মাঝে 'মোহন্তেব এই কি কাজ,' 'বাজারে লড়াই,' 'গজদানন্দ,' 'গাইকোয়াড়' প্রভৃতি সাময়িক হুজুগ অবলম্বনে লিখিত নাটিকা বা প্রহসন থিয়েটারের উন্নতিতে না হউক, অর্থাগমে সহায়তা করিয়াছিল।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পবলোক গমনের ফলে রঙ্গালয়সমূহের দুর্দশা

এই সকল নাটক নাটিকা ও প্রহসন পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর নাটক ক্রমশই অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। নাট্যবিষয়ে আমাদের এই সময়কার অবস্থা সেক্সপিয়ারের মৃত্যুর প. ইংল্যাণ্ডের অবস্থার সহিত তুলনীয়। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে সেক্সপিয়ারের মৃত্যু হইলে ইংল্যাণ্ডের নাট্যক্ষেত্রে যেরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় পিউরিটানেরা তখানকার নাট্যালয়গুলিকে বন্ধ করিবাব চেষ্টা করিয়া ভাল কাজই করিয়াছিলেন। তখন প্রকৃত নাটক দেখিবার জন্য লোকেদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না—তাহারা চাহিত কেবল উত্তেজনা। সুতবাং অদ্ভুত ভয়ানক বীভৎসাদি-রসাত্মক চমকপ্রদ-দৃশ্যসম্বলিত মেলোড্রামাই ছিল তাহাদের আদরেব জিনিষ। রঙ্গালয়েব অধ্যক্ষ ও নাট্যকারেরাও তাহাদের এই বিকৃত রুচিব তৃপ্তিসাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মাইকেল ও দীনবন্ধুর তিরোধানের পর আমাদেব নাট্যালয়েরও অবস্থা অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল। জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টায় এমন সব ব্যাপার নাটকের মধ্যে প্রবেশ করান হইত যে প্রায়ই সেই সকল নাটক কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থে পরিণত হইত। ঘটনার অসামঞ্জস্য ও অসম্ভাব্যতা, চরিত্রের অসঙ্গতি, বিপবীত রসের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, স্থানকালাদি নির্বিচারে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ দোষ এই সকল নাটকের অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক সময় চমৎকারজনক দৃশ্যপটাদি দ্বারা নাট্যবস্তুর দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করা হইত।

দর্শক ভুলাইবার জন্য কিরূপ মালমশলা সহযোগে এই সকল নাটক প্রস্তুত করা হইত তাহাব একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, উপেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে। সে-সময়কার জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে এখানি ছিল অন্যতম। ইহার বিষয়বস্তু ছিল তখনকার একটি শান্তশিষ্ট বাঙালী পরিবারের কাহিনী। অতি ক্ষুদ্র পরিবার—ছিল তাহাতে মাত্র তিনটি প্রাণী—একটি শিক্ষিত যুবক, তাহার ভগিনী ও এক পালিতা কুমারী। কিন্তু ইহাদিগকেই

"শরৎ-সরোজিনী" নাটক

কেন্দ্র করিয়া নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্যে এরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা, রক্তারক্তি কাণ্ড ও দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন যে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর থাকে না। ইহাতে স্বাধীনতা ও স্বদেশ-হিতৈষিতা বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, সাহেবদিগকে গালাগাল, সার্জ্জন ঠেঙ্গান ও গোরাকে গুলি করা, জাল, প্রতারণা, সশস্ত্র ডাকাতি, রাশি রাশি খুন, আত্মহত্যা, বিপ্লবী ষড়যন্ত্র, ভূগর্ভস্থ কারাগার, মানুষ চুরি, অত্যাচারী লম্পটের কবল হইতে বন্দিনী ও বিপন্না যুবতীর উদ্ধার, বাঙালী যুবতী কর্ত্তৃক পিস্তল ছোঁড়া, পুরুষের ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পুরুষ, রোমান্টিক প্রণয়, অশ্বারোহণে নায়ক, নদীগর্ভে নৌকায় সঙ্গীত, পাহারাওলার বাঁদর নাচ, মাতালদের গান প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। বীররস, আদিরস, করুণরস, হাস্যরস, অদ্ভুতরস প্রভৃতি সকল রসেরই একসঙ্গে সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানার পরেও নাট্যকার তৃপ্তিলাভ করেন নাই—তিনি গ্রন্থশেষে নায়কনায়িকাদের মিলনের সময় 'পরীস্থান' না দেখাইয়া ছাড়েন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী গৃহস্থের ঘরে হঠাৎ একদল পরীর আবির্ভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকার করিবেন কি—উপসংহারকালে এইরকম একটা নাচগানের ব্যবস্থা না থাকিলে দর্শকগণ যে ক্ষুণ্ণ হইবেন! সুতরাং পরীরা আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং দর্শকবৃন্দকে আরও সন্তুষ্ট করিবার জন্য সময়োচিত মিলন-সঙ্গীতের পরিবর্তে গাহিল ভারত-উদ্ধারের গান! এইরূপে সঙ্গীতপিপাসু ও দেশপ্রেমিক উভয় প্রকার দর্শককেই একসঙ্গে তৃপ্তিদান করিয়া নাট্যকার ধন্য হইলেন।

বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে দেশপ্রেমের এক প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেকগুলি জাতীয় ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটক লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু আদ্যন্ত কঠোর বীররস আশ্রয় করিয়া নাটক জমান কঠিন বিবেচনা করিয়া নাট্যকারগণ এই সকল

নাটকে স্বরচিত মধুর প্রণয়কাহিনী ঢুকাইয়া দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল প্রণয়কাহিনীকে অতিবিক্তরূপে 'রোমাণ্টিক' করিতে গিয়া তাঁহারা ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অশ্রুমতী" এই শ্রেণীর নাটকের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এ নাটকটিও তৎকালে "শরৎ-সরোজিনী"র ন্যায় বিলক্ষণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সে সময় দেশপ্রেমাত্মক নাটক লিখিতে হইলে সাধারণতঃ চিতোরের ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইত। 'অশ্রুমতী' নাটকটিও চিতোরের রাণা প্রতাপের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। নাট্যকার নাটকের নায়িকা অশ্রুমতীকে রাণা প্রতাপের কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। রাজকন্যা যখন নিদ্রিতা ছিলেন, সেই সময় মহারাজ মানসিংহের চক্রান্তে তিনি এক মুসলমান সেনানায়ক কর্তৃক অপহৃতা হইয়া মোগল শিবিরে আনীতা হন। মানসিংহের ইচ্ছা ছিল ঐ সেনানায়কের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু রাজকন্যা সেখানে যুবরাজ সেলিমকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন! ইহার পর যখন প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ কোনক্রমে তাহাকে উদ্ধার করিয়া চিতোরে ফিরাইয়া আনিলেন তখন তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করা হইল। কিন্তু যোগিনী হইয়াও যে রাজকন্যা সেলিমকে ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার কথাবার্তা হইতে বেশ বুঝা যায়। যে প্রতাপ মোগলের স্পর্শ হইতে বংশগৌরব রক্ষার জন্য তাহার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ ভাবে সেই মোগলেরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী করিয়া নাট্যকারের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু ইহার ছাব্বিশ বৎসর পরে (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপের এই অপমানের দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার 'রাণা প্রতাপে' সম্রাট আকবরের কন্যা ও ভাগিনেয়ী উভয়কেই একসঙ্গে শক্তসিংহের প্রেমে ফেলিয়া দেন! শ্রদ্ধেয় নাট্যকারদ্বয়ের কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এই সকল নাটককে 'ঐতিহাসিক' নাটক বলিয়া

"অশ্রুমতী" নাটক

নাম না দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। ইঁহারা উভয়েই শক্তিমান জনপ্রিয় লেখক, সেইজন্য আশঙ্কা হয় ইঁহারা যাহা ইতিহাস বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, অজ্ঞ জনসাধারণ অবিসংবাদে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

যাহা হউক, এইরূপ ভাবে লোক ভুলাইতে গিয়া নাটক ও অভিনয়ের অবস্থা সে সময় কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছিলেন রসরাজ অমৃতলাল তাঁহার 'তিল-তর্পণ নাটক' নামক প্রহসনে। প্রহসনটি শেরিডানের Critic-এর অনুকরণে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। নাটকটির প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, কোন রঙ্গালয়ে এক নাট্যকার উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষগণের নিকট তিনি নিজ নাটকের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে কিরূপ ধরণের নাটক তখন বাজারে চল্‌তি হইয়াছিল তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।—

অমৃতলালের "তিল-তর্পণ নাটক" তৎকালিক নাটকের ও অভিনয়ের সুন্দর ব্যঙ্গচিত্র

"নাট্যকার।—এ ড্রামাখানি মহাশয় নূতন জিনিস—এতে Worldএর আহার ঔষধ দুই হবে।

দেবেন্দ্র।—ওখানা Tragedy না Comedy মহাশয় ?

নাট্য।—আজ্ঞে, Tragedy'ও না Comedy'ও না।...এখানি হোচ্চে Farcical-tragi-comedy de pantomimic operatta.

জনৈক অভিনেতা।—এ যে নূতন নাম, এর Plot কি মহাশয় ?

নাট্য।—Plot যদি বোল্লেন, তবে Plot এর বড় একটা নেই। Plot নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গম্ভীর, এতে wit আছে, humour আছে, blank verse আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালি ওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, সাহেবমারা সব আছে—অশ্লীল নেই।

দেবেন্দ্র।—চিতোরের সঙ্গে সাহেব ! সে কি রকম কোরে হোলো ?

নাট্য।—মহাশয় নাটক লিখ্‌লেই হয় না, চিন্তে হবে। ওই তো তারিপ, audienceকে খুসি করতে হবে, নাচের জায়গা পাই না—মল্লিকদের মেজবউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।

অপেরা মাষ্টার।—গেরস্তর বউ নাচবে ?

নাট্য।—নাচবে বৈকি !…নাচলে সে তোড়া পাবে, ক্ল্যাপ্ পাবে, handbillএ লিখে দিতে পারবেন—Singing and Dancing throughout—তাই নাচবে।

দেবেন্দ্র।—ড্রামাখানির নাম কি দিয়েচেন ?

নাট্য।—তিল-তর্পণ।…অনেক ভেবে ও নামটা বের করা গেছে। লোকে শুনেই ভাববে এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধুবাবুকে গাল দিয়েচে—আজকালকার audience গাল শুন্তে ভালবাসে—তাতে আবার মরা মানুষকে গালাগাল। দ্বিতীয়তঃ তিল-তর্পণের আর একটি ভাব আছে, যেমন চাড্ডিখানি তিল দিয়ে চোদ্দপুরুষকে খুসি করা যায়, তেমনি আমার এই একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিষ আছে যে, সব audienceকে খুসি করা যাবে।”

এই কথাবার্তার পর নাটকটি অভিনয় করা স্থির হইল, এবং handbill লেখা হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে রহিল—Zoological show in the stage, Singing, Dancing, Climbing, Jumping throughout, Goblins, Witches, Fairies, Demons ইত্যাদি।

পরের দৃশ্যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহাতে দেখা গেল—চিতোরের রাণা বাপ্পারাও বাংলার নবাব আলিবর্দির সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন এবং তাঁহার ভীরুস্বভাবা মহিষী তাঁহাকে রণক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। মহিষীর কাপুরুষোচিত বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাণা যখন বলিলেন,—“কি ! ধরিয়া রহিব আমি অপদার্থ নবাবের ভয়ে ?” তখন মহিষী বলিলেন, তিনি ‘কায়মনোবাক্যে’ বিদ্যাসাগরের “বোধোদয়” পড়িয়া দেখিয়াছেন যে, আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে ‘পদার্থ’ বলে—সুতরাং অনুপস্থিত

নবাব তখন 'অপদার্থ' হইলেও যখন তিনি রণক্ষেত্রে রাণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন তখন তিনি নিশ্চয়ই 'পদার্থ' হইবেন। তর্কে এই-রূপে পরাস্ত হইয়া রাণা অবশেষে রাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা তিনি কলিকাতা হইতে 'মার্টিনী হেনরী রাইফেল' আনিতে পাঠাইয়াছেন—তাহা আসিলা পৌঁছাইলেই তাঁহার জয়লাভ নিশ্চিত।

ইহার পরের দৃশ্যে দেখা গেল, রাণার কন্যা হেমাঙ্গিনী অন্য প্রণয়পাত্রের অভাবে হঠাৎ তাঁহাদের বাগানের মালী অজুর প্রেমে পড়িয়াছেন! তাহার পর উভয়ের পলায়ন, কন্যার অদর্শনে রাণা ও রাণীর দস্তুরমত পাগল হওন এবং অবশেষে রাণাহস্তে গান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদের আগমন। দেবর্ষি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, অজু মালী শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র। সর্বশেষে 'পরীস্থান'। পরীরা আসিয়া গাহিল, "আমরা সব পরী, সুরসুন্দরী, ডানা ঝোরে গেছে উড়তে না পারি···উড়তে না পেরে এখন অপেরা করি"। যখন সমালোচক নাটকের ঐতিহাসিক অসংলগ্নতাদি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, তখন নাট্যকার তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—"নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে,—ন + আটক = নাটক, অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নাই।"

সুখের বিষয় এই যে, নাটকের এই দৈন্য রঙ্গালয়ের পরিচালকগণও অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ রোগ অনুভূত না হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হয় না। নাট্যাধ্যক্ষগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, লোকের হীন রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া বা সাময়িক হুজুগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া নাটক লিখিলে তাহা আপাত আয়বৃদ্ধিকর হইলেও, পরিণামে তাহা দ্বারা অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। তাহার ফলে রঙ্গালয়ের যশ অচিরে বিনষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ আয়ের পথও বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাঁহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি গিয়া পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসগুলির উপর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হয় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। তাহার পর দশ বৎসরের

মধ্যে তাঁহার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর প্রকাশিত হয়। এই সকল উপন্যাস বাহির হইয়াই দেশে নরনারীর চিত্তের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। সেগুলি নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়া অভিনয় করিলে যে সেগুলির আকর্ষণী শক্তি বাড়িবে বই কমিবে না তাহা তখনকার রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাসগুলি নাটকীয় ভাব ভাষা ঘটনা চরিত্র ও সংলাপে এরূপ সমৃদ্ধ যে সেগুলিকে নাটকে পরিবর্তন করা খুব সহজ ছিল। অতএব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকট হইতে নূতন নাটক পাইবার আশা আর রহিল না, তখন 'ন্যাশান্যাল' ও 'বেঙ্গল' উভয় থিয়েটারই বঙ্কিমের প্রকাশিত উপন্যাসগুলি লইয়া আপনাদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর ন্যাশান্যাল অভিনয় করিলেন 'কপালকুণ্ডলা' এবং বেঙ্গল অভিনয় করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'।

নাট্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর অসাধারণ প্রভাব

বলা বাহুল্য, দুইখানি গ্রন্থই রঙ্গালয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার পর সত্তর বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে, পর পর বঙ্কিমের সকল উপন্যাসই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বঙ্কিমের গ্রন্থের অভিনয় দেখিবার জন্য লোকের আগ্রহ কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখনও ভাল নাটকের অভাব হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অনেক সময় বঙ্কিমকে স্মরণ করেন। বাস্তবিক এরূপ জনপ্রিয়তা অতি অল্প নাটকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। পরবর্তী বহু নাটকেই বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্য কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বহু নাটকে দর্শন দিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলিই আমাদের রঙ্গালয়ে পৌরুষ-সম্পন্ন রোমান্স ও দেশাত্মবোধের ধারা প্রবাহিত করিয়া এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বহু নাট্যকারকে তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ

করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Balzac-এর উপন্যাসগুলি ফরাসী নাট্যক্ষেত্রে কিরূপ নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের নাট্যজগতে বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ তাহার অপেক্ষাও অধিক কাজ করিয়াছে। আজকাল বহু উপন্যাস ও কাব্যই আমাদের রঙ্গালয়ে নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইতেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের অভিনয় সাফল্যই ইহার পথ দেখাইয়াছিল। বঙ্কিমের উপন্যাস অভিনয়ের পরেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলের "মেঘনাদবধ", হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার", নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" ও রমেশচন্দ্রের "বঙ্গবিজেতা" নাটকাকারে অভিনীত হয় এবং এই প্রথা ক্রমশঃ অধিকতর প্রসার লাভ করিতে থাকে। আর একটি কথা—বঙ্কিমের দুই তিনখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়াই নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্রের 'হাতে-খড়ি' হয়। তাহা ভিন্ন, গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের উপন্যাসের বহু ভূমিকা বহুবার অভিনয় করিয়া তাঁহার অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটার যখন প্রথম 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় করেন তখন গিরিশচন্দ্রই তাহা নাটকাকারে পরিবর্তন করেন। বহু বৎসর পরে যখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য 'সীতারাম' উপন্যাসটি নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন, তখন তিনি হ্যাণ্ডবিলে লেখেন, "Quarter of a century ago, I tried my prentice hand to dramatise the books of this immortal author." এইরূপে তিনি বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং নাটক-রচনায় তাঁহার 'হাতে-খড়ি' যে বঙ্কিমের উপন্যাস লইয়াই হয় তাহা স্বীকার করেন।

কিন্তু সে সময় একখানি নাটক লইয়া অধিকদিন অভিনয় করা চলিত না। তখন দর্শকের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে অল্প লোকই তখন থিয়েটার দেখিত এবং শিক্ষিতের সংখ্যাও এখনকার মত এত বেশী ছিল না। সুতরাং বারকয়েক অভিনীত হইলেই নাটক পুরাতন হইয়া পড়িত—যাঁহারা দেখিবার তাঁহারা

দেখিয়া ফেলিতেন। তখন নূতন নাটকের খোঁজ পড়িত। ভাল নাটক হইলে তাহার পরমায়ু একটু বেশী হইত এই মাত্র। এই কারণে বঙ্কিমবাবুর যে দু'তিন খানি গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা চলিত না—বারবার অভিনীত হওয়া সেগুলির আকর্ষণীশক্তি তখনকার মত কমিয়া গিয়াছিল। ফলে থিয়েটারের অবস্থা আবার শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য নাটকের সংখ্যা তখন যে নিতান্ত কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ছিল "ন-আটক" জাতীয় নাটক, কারণ নাট্যক্ষেত্রের অরাজকতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রায় সকলেই নাট্যকার হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সকল নাটক রঙ্গালয়ের অধঃপতনের বেগ বৃদ্ধি করিয়াছিল বই হ্রাস করে নাই। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে যেন নটনাথেরই প্রেরণায় গিরিশচন্দ্র নাট্যকাররূপে লেখনী ধারণ করিলেন। সে সময় আমাদের ধ্বংসোন্মুখ রঙ্গালয়কে জীবনপথে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য একমাত্র তাঁহারই ছিল, কারণ সফল নাট্যকার হইতে হইলে যে সকল গুণ আবশ্যক, তিনি সে সকলেরই পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন। বলা বাহুল্য, কেবল নাটক রচনার পদ্ধতি জানিলেই সফল নাট্যকার হওয়া যায় না, পরন্তু নাট্যকারকে নানা দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এই বিষয়গুলি কি তাহা না জানিলে আমরা গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের কারণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব না। আমি সেইজন্য প্রথমে ঐ সকল বিষয়ের একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

দুর্দশাগ্রস্ত রঙ্গালয়কে রক্ষা করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র

অন্যান্য কাব্যের সহিত নাটকের প্রভেদ এই যে, নাটক মুখ্যতঃ দৃশ্যকাব্য—পাঠ্যকাব্য নয়। নটগণকর্তৃক দর্শকগণের সম্মুখে অভিনীত হইবার জন্য ইহা রচিত হয় বলিয়াই ইহার নাম 'নাটক'। সুতরাং ইংরেজীতে যাহাকে closet drama বলে—যাহা পড়িবার জন্য লিখিত হয়, অভিনয়ের জন্য নয়—তাহা কাব্যাংশে যতই উৎকৃষ্ট

অন্যান্য কাব্যের সহিত নাটকের প্রভেদ

হউক তাহাকে নাটক বা দৃশ্যকাব্য বলা চলে না। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যরসজ্ঞ অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডার ম্যাথিউজ (Brander Mathews) ঠিকই বলিয়াছেন, "A play which is not intended to be played is a contradiction in terms; it is an overt absurdity." বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক ডার্লিংটন (W. A. Darlington)ও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "No man is justified in describing any composition as 'a great play' unless it has been proved great in action on the stage." বাস্তবিক নাট্যালয়ই নাটকের কষ্টিপাথর, সেইখানেই তাহার প্রকৃত গুণাগুণ পরীক্ষিত হয়। অনভিনেয় নাটক আর সোনার পাথরবাটি একই কথা। অতএব সফল নাটক রচনা করিতে হইলে নাট্যকারকে প্রধানতঃ রঙ্গালয়, অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবৃন্দ—এই তিনদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই প্রকার দৃষ্টির অভাবে অনেক ভাল নাট্যকারের নাটকও এরূপ দোষযুক্ত হইয়া পড়ে যে, তাহা বিশেষ-রূপে সংশোধিত ও পরিবর্তিত না হইলে অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে। রঙ্গালয়, অভিনেতা ও দর্শক পরিবর্তনশীল বলিয়া এক যুগের সফল নাটক অপরিবর্তিত অবস্থায় অন্য যুগে চালান দুষ্কর হয়—এমন কি, সেক্সপিয়ারের নাটকও এখন অভিনয় করিতে হইলে অনেক কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে হয়। রঙ্গালয়াদিকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামত নাটক লিখিলে কি দোষ হইতে পারে তাহাই এক্ষণে আমি একে একে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রঙ্গালয়, অভিনেতা ও দর্শকের সহিত নাটকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

প্রথম,—রঙ্গালয়। বলিয়াছি, এদেশে যখন বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তথায় অভিনয় করিবার জন্য যাত্রার নাটককে তদুপযোগী ভাবে গঠিত করিয়া লইতে হইয়াছিল। আবার থিয়েটারী নাটক লইয়া যাত্রা করিতে হইলে তাহাকে যাত্রার আসরের উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ রঙ্গালয়ের আয়তন, গঠন,

নাটকের উপর রঙ্গালয়ের প্রভাব

দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নাটক লিখিলে নানা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুই একটি উদাহরণ দিই। উপেন্দ্র দাসের 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক নাটকে তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে একটি কারাগারে বন্দি-বিদ্রোহের দৃশ্য দেখান হইত। এই বিদ্রোহের ফলে দশ বার জন ব্যক্তি হত হইত। কিন্তু ইহার পরের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের দৃশ্যটি এমন ছিল যে, মঞ্চ হইতে মৃতদেহগুলি না সরাইলে তাহা দেখাইবার উপায় ছিল না। অগত্যা কারাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কয়েকটি ভৃত্যের সাহায্যে সেই দেহগুলিকে দর্শকগণের সম্মুখেই বহন করিয়া বা টানিয়া লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নাটককারের ঈপ্সিত tragedy হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইত। ইংল্যাণ্ডে সেক্সপিয়রের সময় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং দর্শকগণের সম্মুখেই প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে পরের দৃশ্য দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত। ফলে সেখানেও সময়ে সময়ে এইরূপ অসুবিধা হইত। এই কারণে পলোনিয়াসকে হত্যা করিবার পর হ্যামলেটকে পলোনিয়াসের মৃতদেহ হাস্যজনক ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু হ্যামলেট সে সময় পাগল হইয়াছিলেন বা পাগলামীর ভান করিতেন, সুতরাং দর্শকগণের চক্ষে এই কার্য্য তত অশোভন বোধ হইত না।

বাস্তবিক নাটক পড়িবার সময় যে দৃশ্যের বিসদৃশতা আমরা দেখিতে পাই না, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠে। কোন দীর্ঘ বক্তৃতা বা পদ্যে কথোপকথন পড়িতে হয়ত ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তাহার আবৃত্তি বিরক্তিজনক হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "লীলাবতী"র অভিনয় দেখিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" বন্ধুভাবে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি সেই সমালোচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"লীলাবতী নাটক।—ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতৃগণ সুন্দর-

রূপে শিক্ষিত হইয়াছেন। নাটকোল্লিখিত অংশগুলি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অতি চমৎকার অভিনয় করিযাছিলেন, কিন্তু তথাপি গত শনিবারে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই কেন? লীলাবতী নাটকেব উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ—সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ কবেন কেন? আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করি। একখানি পাঠোপযোগী নাটক সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থলে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া লই, অনেক স্থানে একটি ভাবে নানা ভাবের উদয হয়। অভিনযেব সময় আমরা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিযা জীবনের কার্যাগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা করি—সুতরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখ বোধ করিতে পারি না, প্রত্যুত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এইজন্য প্রধান প্রধান লেখকদের নাটকও অভিনযোপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। ......

অভিনযোপযোগী কবিবাব জন্য নাটকের সংস্কাব সাধন

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতাবা যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যদি নাটকগুলি স্বভাব ও রুচিসঙ্গত করিবার জন্য পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় কবেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন।”

কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন করাও সকল সময় সহজ নয়। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, “খোল নল্‌চে” দুই-ই না বদলাইলে নাটককে অভিনয়যোগ্য করা যায় না। ইহার উপর থাকে নাটককারের বিরাগভাজন হইবার ভয়,—বিশেষতঃ তিনি যদি একজন বড় নাট্যকার হন তাহা হইলে বিপদের মাত্রা অনেক বাড়িয়া যায়। চুঁচুড়ায় যখন বঙ্কিমবাবু ও অক্ষয়বাবুর পরিচালনায় ‘লীলাবতী’র অভিনয় হয়, তখন তাঁহারা নাটকখানির নানা পরিবর্তন করেন। দীনবন্ধু তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর

অক্ষম ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই মনোভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে নানা রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের অনুরোধে বহু বৎসর ধরিয়া আমাকে এই অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইয়াছে। আমি একার্য্য নিঃস্বার্থভাবেই করিয়াছি এবং কিছু পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তাহার কারণ গ্রন্থকারকে বুঝাইয়া দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি তাঁহাদের অভিমানাদি হইতে সকল সময় নিস্তার পাই নাই। যাহা হউক, পরিবর্ত্তনের ফলে যখন তাঁহাদের নাটক সাফল্য লাভ করিয়াছে তখন তাঁহারা যে আমাকে আশীর্বাদ করিতেও ত্রুটি করেন নাই, তাহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি। ইহা সকল সময় মনে রাখা উচিত যে, উপযুক্ত কারিকরের দ্বারা হীরকখণ্ড কাটা হইলে তাহার ওজন কমিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ঔজ্জ্বল্য ও মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নাটক লিখিতে হইলে গল্পের কোন্ কোন্ অংশ বর্জন করা উচিত, কোন্ কোন অংশ দৃশ্যে পরিণত করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কোথায় কিরূপ ভাষা ব্যবহার করা উচিত, কোন কোন্ স্থলে সাধারণ গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয় ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যে রঙ্গালয়ের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ভিন্ন অর্জন করা দুরূহ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তাহার পর অভিনেতৃবৃন্দ। রঙ্গালয়ের ন্যায় অভিনেতাদের উপরেও নাট্যকারকে যথেষ্ট নির্ভর করিতে হয়। যদি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করিবার জন্য উপযুক্ত অভিনেতা না পাওয়া যায় তাহা হইলে নাটকের সফলতা লাভ কঠিন হইয়া উঠে।

অভিনেতাদের উপর নাটকের নির্ভরতা

কিন্তু উপযুক্ত অভিনেতার অভাব হইলে নাট্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার তাহার কি করিতে পারেন? হয় তিনি রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদিগকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নাটকের উপযোগী অভিনেতা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, নয় যে রঙ্গালয়ে সেরূপ অভিনেতা পাওয়া যায় সেখানে তাঁহার নাটকটি অভিনয়

করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই দুই উপায়ের কোনটিই সুসাধ্য নয়। থিয়েটারের ভিতরের লোক যদি নাট্যকার হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপ অভিনেতা পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিয়া নাটক লেখেন। তিনি সকল অভিনেতারই বৈশিষ্ট্যের বিষয় অবগত আছেন এবং সেইজন্য সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে সহজেই কাজে লাগাইতে পারেন। কথিত আছে, সেক্স্‌পিয়ার যখন Comedy of Errors লেখেন, তখন তাঁহার থিয়েটারে ভাগ্যক্রমে এক জোড়া Antipholus এবং এক জোড়া Dromio পাওয়া গিয়াছিল, নতুবা তাঁহার এরূপ নাটক লেখা বৃথা হইত। তিনি প্রায়ই তাঁহার নায়িকাগণকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরাইয়া নাটকের প্লটের জটিলতা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতেন এবং তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইত না, কারণ সে সময় পুরুষের দ্বারাই স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করান হইত। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যখন 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে রূপান্তরিত করেন, তখন তিনি তাহাতে কাপালিকের মুখে গান দেন নাই। কাজটা অবশ্য ঠিকই হইয়াছিল, কারণ কাপালিকের মত ভয়ঙ্কর ব্যক্তির মুখে গান সাধারণতঃ শোভা পায় না। কিন্তু ইহার বহুবৎসর পরে (১৯০১ সনে) যখন 'কপালকুণ্ডলা' ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়, তখন গিরিশচন্দ্রই কাপালিকের জন্য দুইটি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কারণ, ক্ল্যাসিকে কাপালিক সাজিয়াছিলেন, সুগায়ক অঘোরনাথ পাঠক। অঘোরনাথের চেহারাতে কাপালিক বেশ মানাইত, অথচ দর্শকেরা তাঁহার দর্শন পাইলে তাঁহার গান শুনিবার জন্য লোলুপ হইত। সুতরাং গিরিশচন্দ্র এমন গান তাঁহার মুখে বসাইয়া দিয়াছিলেন, যে তাহাতে দুই দিক রক্ষা হইয়াছিল। বাস্তবিক কাপালিক যখন নবকুমারকে বধ্যভূমি দেখাইয়া গম্ভীর সুরে গাহিত,—"নররুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে"—তখন সমস্ত দর্শক শিহরিয়া উঠিত, ফলে কাপালিকের ভয়ঙ্করত্ব যেন আরও ফুটি। উঠিত। অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাটে'র ঝি একটি সামান্য গৌণ

অভিনেতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচনা বা তাহার পরিবর্তনের আবশ্যকতা

চরিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু অভিনেত্রীর গুণে তাহাই একটি মুখ্য চরিত্রে পরিণত হইয়াছিল—অমৃতলালও তাঁহার গুণ বুঝিয়া নাটকে তদনুরূপ কথা বসাইয়াছিলেন। ঐ অভিনেত্রীর বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাইবার জন্যই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'গয়লা বৌ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সে ভূমিকা অতি ক্ষুদ্র হইলেও অভিনেত্রীর গুণে তাহা অসম্ভব সফলতা লাভ করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'ছায়া'র চরিত্র প্রধানতঃ একজন সুগায়িকার গান শুনাইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা আসল নাটকের সহিত এই চরিত্রের সম্বন্ধ খুবই অল্প। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে বাহিরের নাট্যকার অপেক্ষা নাট্যালয়-সংশ্লিষ্ট নাট্যকারের সুবিধা যে অনেক বেশী তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ নাট্যকার যদি স্বয়ং নাট্যাধ্যক্ষ হন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে অনেক সময় উপযুক্ত অভিনেতা নিযুক্ত করিয়া নিজ নাটকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারেন। তবে এমন কতকগুলি নাটক আছে যেগুলি লেখার গুণে আপনা হইতেই জমিয়া যায়—তাহার জন্য উৎকৃষ্ট অভিনেতার প্রয়োজন হয় না। এরূপ নাটককে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক নাম দিয়াছেন,—"actor-proof"।

বঙ্গালয় ও অভিনেতাদের উপর নাট্যকারকে কতটা নির্ভর করিতে হয় তাহার আভাস উপরে দিলাম। কিন্তু দর্শকদের উপর তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক নির্ভর করিতে হয়। সুবিখ্যাত ফরাসী নাট্যশাস্ত্রকার Sarcey ঠিকই বলিয়াছেন, "দর্শকগণকে বাদ দিয়া নাট্যাভিনয়ের কথা আমরা ভাবিতেই পারি না।" বাস্তবিক দৃশ্য-পট, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি অভিনয়ের বিবিধ অঙ্গ না থাকিলেও অভিনয় করা যাইতে পারে, কিন্তু দর্শক ছাড়া দৃশ্যকাব্যের অভিনয় ধারণা করা যায় না। রঙ্গালয় বা অভিনেতাদের কথা না ভাবিয়া নাটক লেখা যাইতে পারে

দর্শকদের সংস্কৃতি ও মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে নাটক লেখা হয় তাহার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অল্প

এবং সেজন্য যদি কোন দোষ হয় তাহার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য নয়; কিন্তু যে নাটক দর্শকগণের প্রবৃত্তি ও রুচির বিরোধী হয় তাহা একেবারে অচল। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাধারণের চিন্তা ও ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতে পারেন এবং যাইয়াও থাকেন, কিন্তু নাট্যকার তাঁহার দর্শকবৃন্দকে ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন না। "Those who live to please must please to live"—জনসমাজকে আনন্দ দানের জন্য যাঁহাদের জীবন ধারণ তাঁহারা যদি বাঁচিতে চান তাহা হইলে লোকে যাহা চায় তাহা তাঁহারা সরবরাহ করিতে বাধ্য। সুতরাং নাট্যকারকে সাধারণের সংস্কৃতি ও প্রবৃত্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। অবশ্য তিনি তাহাদের সম্মুখে উৎকৃষ্টতর আদর্শ স্থাপন করিয়া তাহাদের বিকৃত রুচি সংশোধনের চেষ্টা করিতে পারেন এবং তাহা করাও উচিত। কিন্তু এই রুচি-বিকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কারণ 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। সুতরাং আমার রুচির সহিত অন্যের রুচি না মিলিলেই যে তাহা মন্দ এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য যে রুচি অশ্লীল—যাহা হীনপ্রবৃত্তিসঞ্জাত বা বিধ্বংসাদি বৃত্তির উদ্দীপক তাহাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষীরই অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এরূপ কুরুচি বা পশুসুলভ প্রবৃত্তির সহিত জাতীয় কৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। কুশিক্ষা, বিলাসিতাবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে সময়ে সময়ে লোকের রুচির এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া সামাজিক আবহাওয়াকে দূষিত করে। কেবল আমাদের সমাজ নয়, পৃথিবীর সকল সমাজই মাঝে মাঝে এইরূপ গ্লানিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশেই এক সময়ে কি নাটকে, কি অভিনয়ে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখা যাইত। এখনও যে ঐ সকল দেশ এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এ সামাজিক রোগের প্রতিকার করিতে যে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যে রুচি জাতীয়-সংস্কৃতির অভিব্যক্তি সে রুচি যদি

নাট্যকার না মানিয়া চলেন তাহা হইলে তাঁহার স্থায়ী সাফল্য লাভের আশা করা যায় না।

কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সর্বকালে সর্বজাতির প্রিয়, যেমন নাচগান, রঙ্গরস, রোমান্স্ প্রভৃতি। আবার কতকগুলি বিষয়ের জনপ্রিয়তা জাতিবিশেষের চিরন্তন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। মানুষের হৃদয় ও জীবন সমস্যা লইয়া নাটকের কারবার, কিন্তু প্রত্যেক সমাজে চিরপ্রচলিত শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে মানুষের হৃদয় গঠিত ও জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়। সুতরাং একটা ঘোর সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া লোকের জীবনের গতি একেবারে বদলাইয়া না গেলে নাটকের ধারা পরিবর্তনের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় না। যাঁহারা মনে করেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজে সেইরূপ বিপ্লবই ঘটিয়াছে, আমার বিশ্বাস তাঁহারা ভুল ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের সমাজের ন্যায় রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে এরূপ আমূল বিপর্যস্ত করা গোটা কয়েক ইংরেজী স্কুলকলেজের কর্ম নয়। মহাসাগর তুল্য আমাদের এই সমাজ। উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটা প্রবল বাত্যা আসিয়া প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ইহাকে আন্দোলিত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে ইহার উপরিভাগ সংক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইলেও ইহার অন্তস্তলের চিরপ্রবাহমান স্রোতের গতি অবরুদ্ধ বা ভিন্নাভিমুখী হয় নাই। এই স্রোত আধ্যাত্মিকতার স্রোত—ভক্তিরসে ইহা পুষ্ট। পশ্চিম হইতে লৌকিক বুদ্ধির হিমস্রোত আসিয়া ইহার উষ্ণতা কিছুমাত্র কমাইতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সমাজের রক্ষণশীলতা

এই দেশব্যাপী আধ্যাত্মিকতা যাহা সমগ্র জাতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়াছে তাহার উৎস কোথায় তাহা আমি পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সমাজনেতারা ধর্মশিক্ষাকেই সর্বোচ্চ শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন এবং সে শিক্ষা কেবল ধর্মযাজকের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া পালাগানাদির ভিতর দিয়া সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং

এদেশে ধর্মের প্রভাব

তাহার ফলে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় মধ্যে ভক্তিরস এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা শেষে "কানু ছাড়া" গান শুনিতে চাহিত না। এখনও পর্যান্ত এই ভাবের বিশেষ ব্যত্যয় হইযাছে বলিয়া বোধ হয় না। আপাতদৃষ্টে মনে হয় যেন পাশ্চাত্তা শিক্ষার গুণে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভক্তিস্রোত শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় তাহা সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে, কেবল বিদ্যাভিমানাদিরূপ আবরণ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে মাত্র। ধর্মশাস্ত্রাদি আলোচনা, সাধুসংসর্গ বা অন্য কোন কারণে সেই কৃত্রিম আবরণ সরিয়া গেলেই অন্তরস্থ ভক্তিধারা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন মাইকেল "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখিতে বসেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন, কেশব-চন্দ্র একতারা হাতে হরিগুণ গাহিয়া দেশের নরনারীকে মাতাইয়া তোলেন। এইরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন দর্শকগণের নিকট যে ধর্মমূলক নাটক অন্য নাটক অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হয় তাহা বলা বাহুল্য।

সেকালের 'কৃষ্ণযাত্রা'র কথা স্মরণ করুন। প্রেক্ষাগৃহ বলিয়া কোন বালাই নাই—একটা খোলা মাঠে বা প্রাঙ্গণে যাত্রার আসর প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে সহস্রাধিক দর্শক—কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া—আছে। তাহাদের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্য্যন্ত, ধনকুবের হইতে দীনতম ভিক্ষুক পর্য্যন্ত, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই বিরাজমান। চারিদিকে ভীষণ হট্টগোল হইতেছে এবং গোল থামাইবার চেষ্টার ফলে গোলযোগ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। অভিনেতাদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন শোচনীয়, তাহাদের উচ্চারণভঙ্গিও তেমনই হাস্যকর। কিন্তু এই ঘোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাধিকা যেমন গান ধরিল, "মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব," অমনই কি এক অপূর্ব মোহনমন্ত্র বলে সমস্ত গল্পগুজব গোলমাল থামিয়া গেল, আর সেই বিরাট

সেকালের কৃষ্ণযাত্রার একটি চিত্র

জনমণ্ডলী মহাভাবে বিভোর হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই মধুবর্ষী সঙ্গীতসুধা পানে মত্ত হইল এবং অজস্রধারায় তাহাদের প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল!

এই স্বর্গীয় দৃশ্য বর্তমানকালের তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত, মনোহর দৃশ্যপটবিভূষিত, বহুমূল্যবেশধারী সুদর্শন অভিনেতৃবৃন্দ-সমন্বিত রঙ্গালয়ে দেখিবার প্রত্যাশা করা যায় কি? বাস্তবিক যে অভিনয়ের সহিত দর্শক-গণের প্রাণের যোগ থাকে না তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিলেও হৃদয়ে স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে না। এই কারণে যখন এদেশে থিয়েটার প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য সাধারণ দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তথায় অভিনীত নাটকসমূহ যাত্রার নাটকের ন্যায় তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র বলেন, "আমার স্মরণ আছে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলীর অভিনয় দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে,—'কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা সাগরিকাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত ভয়েতে তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি সে বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমনি মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না'। কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় হৃদয় কিরূপ দ্রব হইয়াছিল তাহা নাই,.........কেবল মুক্তার মালা, সাজসরঞ্জামের প্রশংসা"! আমার বোধ হয়, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যে কাব্যের সহিত দর্শকের হৃদয়ের যোগ নাই—যাহার অভিনয় তাহার অন্তরে সমবেদনা সৃষ্টি করে না, তাহা দ্বারা তাহার হৃদয় দ্রব হইবে কি প্রকারে? যাত্রার যে মোহন বাঁশীর সুর শ্রোতৃবর্গের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-ধারা বহাইয়া দিত—তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, ঘরসংসার ভুলাইয়া দিত—এই সকল থিয়েটারওয়ালা তাহা ফেলিয়া বিজাতীয় ক্ল্যারিয়নেট ধরিয়াছিলেন। তাহা এদেশের দর্শকগণের

নবযুগের প্রথমাংশে অভিনীত নাটকগুলি জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই

চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মরমে পশিয়া তাহাদের প্রাণ আকুল করিতে পারে নাই। তাহা শুনিয়া বদন অধিকারীর বৃন্দাদূতীর ন্যায় তাহাদের প্রাণ স্বতঃ বলিয়া উঠিয়াছিল—

"তেমন বাঁশী বাজেনা হেথায়!
তোদের মথুরায়!
যে বাঁশী শুনে আকুল প্রাণে
কুল ত্যজেছে গোপিকায়!"

যাহা হউক সুখের বিষয়, দর্শকগণের এই প্রাণের আকুলতা সে যুগের থিয়েটারের পরিচালকবর্গ শীঘ্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে শ্যামের বাঁশী শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "লীলাবতী" নাটকের কথা বলিয়াছি। এখানি পুরাদস্তুর পারিবারিক নাটক—সেকালের এক বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু- ইহার নায়িকা লীলাবতী সেই পরিবারের কন্যা। সে যুগে তাহার মুখে কীর্তনগান একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু চুঁচুড়ায় যখন বঙ্কিমবাবুর দল কর্তৃক নাটকটির অভিনয় হয়, তখন তাঁহারা তাহাকে দিয়া কীর্তন গাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ইহার ফল সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সহযোগী অক্ষয়বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

থিয়েটারের পরিচালকবর্গ ক্রমশঃ তাঁহাদের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন

"খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে কীর্তন প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম—

"কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু ঝুণু বাজে, তোরা শোন গো সবাই॥"

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজ (দুর্গাচরণ লাহা)কে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে পায়ের ধূলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম।"

একটি ক্ষুদ্র গান এত শক্তি কোথা হইতে পাইল তাহা বলিতে হইবে কি? বহিরাবরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেখানকার ধনকুবের বণিক হইতে নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রোতা ছিলেন একই ভাবের ভাবুক—একই রসের রসিক—এবং সেই রস ঐ গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। গানটি তাঁহাদেরই প্রাণের কথা মধুর সুরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, অমনই তাঁহাদের হৃদয়স্থিত রস উছলিয়া পড়িয়াছিল, শুষ্ক হিসাবের খাতা বা শুষ্ক ন্যায়ের তর্ক তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। বাস্তবিক ভগবৎপ্রেম আমাদের জাতির অস্থি-মজ্জায় এমন নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে জাতিকে ধ্বংস না করিয়া তাহার বিলোপ সাধন করা যায় না। কুশিক্ষা কুপ্রবৃত্তি নীচ-সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে ইহা কিছু কালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে কোন শুভ ঘটনার সংযোগে তাহা পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া উঠা বিচিত্র নয়। তখন চিরলম্পট বিল্বমঙ্গল উন্মত্ত হইয়া পরম প্রেমময়ের সন্ধানে ছোটে, ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাই ঊর্ধ্ববাহু হইয়া হরিনাম কীর্তনে মত্ত হয়।

ভগবৎ প্রেম আমাদের জাতির মজ্জাগত

কিন্তু আমাদের এই চিরন্তন সংস্কারবশতঃ ধর্মমূলক নাটক আমাদের এত প্রিয় হইলেও অনেকে ইহাকে প্রকৃত নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রদর্শন করাই নাটকের কাজ। মানুষ নিত্য নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতেছে—তাহার প্রতিবেশী বা প্রতিপক্ষের সহিত দ্বন্দ্ব, তাহার নিজ সমাজের সহিত

দ্বন্দ্ব, তাহার আপন অন্তরের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—এইরূপ নানা দ্বন্দ্ব তাহার জীবনযাত্রাকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। নাট্যকার এই সকল দ্বন্দ্ব ও সমস্যার উজ্জ্বল চিত্র দর্শকগণের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করেন। কতকগুলি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়ার সাহায্যে এই চিত্র প্রদর্শন করাই নাট্যকারের 'আর্ট'। কিন্তু ধর্মমূলক নাটকে দেবতা বা অতিমানবের লীলা প্রদর্শিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য দর্শকগণের হৃদয়ে ভক্তিরস প্রবাহিত করা। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা ধর্মমূলক নাটককে বর্তমান নাটকের জনক বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাকে উচ্চশ্রেণীর নাটক বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এদেশে পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য তাঁহাদের শিষ্যের অভাব নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর ন্যায়ই পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটককে বর্বর-যুগের নাটক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পাশ্চাত্ত্যদের জীবনধারা ও আমাদের জীবনধারা এক নহে। পাশ্চাত্ত্যেরা ইহজীবনকে যত বড় করিয়া দেখেন আমরা তাহা দেখি না। আমরা এ জীবনকে অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করি এবং সেই বৃহত্তর জীবনের সহিত বিচ্ছেদই আমাদের সকল দুঃখের কারণ বলিয়া অনুমান করি। সুতরাং সেই বৃহত্তর জীবনের কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া যিনি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন সেই ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পরিবারভুক্ত হইতে আমরা সততই ব্যাকুল। এই মিলন-পথ আবিষ্কার করাই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ সমস্যা। পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটক এই সমাধানে সহায়তা করে বলিয়াই এদেশের জনসাধারণের নিকট তাহার এত আদর। ক্ষুদ্রতর সামাজিক সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান তাহারা তত আবশ্যক মনে করে না।

পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকের নাটকত্ব

এরূপ স্থলে পশ্চিম হইতে আমদানী তথাকথিত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যামূলক নাটকগুলি যে এদেশে সহজে জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। আর আমাদের পৌরাণিক

নাটকগুলিকে ঠিক দেবলীলাত্মক নাটক বলা যায় না, সে কথা পূর্বে বলিযাছি। সেগুলিতে মাঝে মাঝে অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাব প্রদর্শিত হইলেও দেবতারা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ন্যায় সুখদুঃখাভিভূত মানবরূপেই দেখা দেন। এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত আমাদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত সেবক সখা পুত্র দয়িত প্রভৃতি সকল প্রকার প্রেমের সম্বন্ধ পাতান। ফলে তিনি ঐতিহাসিক বীর বা সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিতে সতত আগ্রহশীল রোমান্টিক নায়ক নায়িকা অপেক্ষা আমাদের অধিক আপনার জন হইয়া পড়েন। সুতরাং স্বভাবতই উক্ত বীর ও নায়ক নায়িকাদের লীলাকাহিনী অপেক্ষা তাঁহার লীলাকাহিনী এদেশের জনসাধারণের প্রাণে অধিকতর আনন্দ সঞ্চার করে—তাহারা তন্ময় হইয়া সেই সুধারস পান করে। বস্তুতঃ আমাদের পৌরাণিক নাটক ও ইউরোপীয় পৌরাণিক নাটক এক জাতীয় নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইউরোপীয় পৌরাণিক নাটক এখন যাদুঘরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর আমাদের পৌরাণিক নাটক হইতেছে স্বর্গীয় প্রেমরসের সঞ্জাব প্রস্রবণ। বর্ত্তমানকালে ইউরোপের একমাত্র পূর্বোল্লিখিত ওবার আম্মারগাওয়ের "প্যাশান প্লে"র সহিত আমাদের পৌরাণিক নাটকের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জনসমাজের উপর প্রভাবের কথা বিবেচনা করিলে সেই "প্যাশানপ্লে"ও আমাদের পৌরাণিক নাটকের পার্শ্বে অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, কারণ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সেই ভাবপ্রবণ প্রেমিক প্রাণ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

পৌরাণিক নাটক ও তাহার অভিনয় উচ্চশ্রেণীর 'আর্ট' বলিয়া দাবী করিতে পারে

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, 'আর্ট' হিসাবে পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের স্থান কোথায়? আমি এ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ না করিয়া সুবিখ্যাত নাট্যসমালোচক ডালিংটন সাহেবের মত উদ্ধৃত করা সমীচীন বোধ করিতেছি, কারণ ইঁহাকে পৌরাণিক নাটকের 'স্বভাবতঃ বা সংস্কারবশতঃ' পক্ষপাতী বলিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারিবেন না।

ওবার আম্মারগাওয়ের "প্যাশান প্লে"র অভিনয় দেখিয়া ইনি প্রথমে লিখিয়াছেন,—"The moving force behind it—the thing which kept the audience silent and spell-bound on hard seats for eight hours, unmindful of cramped limbs and aching bones—was the force of tradition rather than dramatic virtuosity, of emotion rather than judgment, of religious awe rather than artistic appreciation" অর্থাৎ 'প্যাশান প্লে'র যে শক্তি সহস্র সহস্র দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আট ঘণ্টা কাল কঠিন আসনে বিষম শারীরিক ক্লেশ সত্ত্বেও নিস্তব্ধভাবে বসাইয়া রাখে তাহা একটা চিরাগত প্রথার শক্তি মাত্র—তাহাতে কলাজ্ঞান অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই অধিক প্রকাশ পায়—সুতরাং এ অভিনয়কে উৎকৃষ্ট নাট্যকলার নিদর্শন না বলিয়া গভীর ধর্মভাবের অভিব্যক্তি বলাই উচিত।' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরক্ষণেই লেখক তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া বলিতেছেন, "Even as I write, my mind misgives me; the dividing line between religion and art is so narrow and so easily crossed that I feel I am overbold to attempt to draw it so firmly. 'Art,' says Goethe, 'rests upon a kind of religious sense; it is deeply and ineradicably in earnest.' ......The Passion Play, certainly, is a work of art, because it is a story in effective dramatic form, and confirms to Goethe's requirements by being deeply and ineradicably in earnest." ডার্লিংটন সাহেব 'প্যাশান প্লে' সম্বন্ধে প্রথমে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেকেই সে মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে ধর্মের ও আর্টের ভিত্তি এক নহে—সুতরাং যাহা ধর্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আর্ট হইতে পারে না। ডার্লিংটনও প্রথমে পূর্বসংস্কার বশতঃ এই মতই সমর্থন

করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "প্যাশান প্লে"র অভিনয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়মধ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াই তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং গেটের মত অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া "প্যাশান প্লে"র ন্যায় ধর্ম্মমূলক নাটকের রচনা বা অভিনয় যে একটা বিশিষ্ট আর্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গেটে ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও বিবিধ কলাজ্ঞ। সুতরাং তিনি আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সমাদরের সহিত গ্রহণযোগ্য। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম ও আর্টের মধ্যে কোন অনতিক্রমনীয় ব্যবধান নাই, বরং এক প্রকার ধর্ম্মভাবই আর্টের ভিত্তি, কারণ গভীর ও অটল আন্তরিকতাই ইহার প্রাণ। বাস্তবিক চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি সর্ববিধ কলার যে সকল নিদর্শন এখনও পর্যন্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয় সেগুলির অধিকাংশই ধর্ম্মভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে অবিনশ্বর ধর্ম্ম-ভাব বিরাজ করিতেছে, আমাদের পৌরাণিক বা ধর্ম্মমূলক নাটকগুলি তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং গেটের সংজ্ঞানুসারে সেগুলি যে উচ্চ শ্রেণীর আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সকল স্থায়ী ভাব ব্যতীত, মধ্যে মধ্যে কোন নূতন ভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ উৎপন্ন করে। বুদ্ধিমান রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং অবিলম্বে সেই ভাবের পরিপোষক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ "ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা"র ফলে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবানও হইয়া থাকেন। এমন কি, একজন লিখিয়াছেন, নাটক লিখিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে সকল সময়েই কালের মেজাজ বুঝিয়া লেখা উচিত—"A drama to be successful should be suited to the temper of the times." ইংল্যাণ্ডের নাট্যশালার ইতিহাস লেখক জেনেষ্ট (Genest)ও বলিয়াছেন, "Every theatrical work should (if possible) be written according to the seasons."

অর্থাৎ যতদূর সম্ভব মর্ম্ম বুঝিয়া নাটক লেখাই কর্তব্য। অবশ্য কেবল থিয়েটারে অর্থাগম দেখিয়া যদি নাটকের সাফল্য বিচার করা হয়, তাহা হইলে এই উক্তি এক হিসাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। বলিয়াছি, বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক লইয়া অভিনয় আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আয়ের দিক দিয়া তাহাতে বড় সুবিধা হয় নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সময় তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা সে সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের পরেই "মোহন্তের এই কি কাজ?" নামে একটি নাটিকা অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের কপাল একেবারে ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং টিকিটঘরের কষ্টি পাথর অনুসারে এই 'হুজুগে' নাটিকাকে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র উপরে স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় কেহই অনুমোদন করিবেন না। বস্তুতঃ এই সাময়িক নাটকগুলি স্বল্পায়ু হইয়া থাকে—যতদিন আন্দোলনের জোর থাকে, ততদিন ইহা জীবিত থাকে—তাহার পরে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যায়। এমন কি এইরূপ সাময়িক আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট নাটকসমূহও এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "নীলদর্পণ" নাটকের নাম করা যাইতে পারে। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে ন্যাশান্যাল থিয়েটার এই নাটক লইয়াই অভিনয় আরম্ভ করেন এবং এই নাটক সে সময়ে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু নীলকরদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি চমৎকার নাটকও রঙ্গালয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। একথা সত্য যে, নবীনমাধব ও তোরাব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের ন্যায় ইহার দুই চারিটি দৃশ্য পরে রূপান্তরিত হইয়া অনেক নাট্যকারের সফলতা অর্জনে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, যে সকল ব্যাপার চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে তাহার চিত্র কখন পুরাতন

"মর্ম্মী" ও "হুজুগে" নাটক জনপ্রিয় হইলেও স্বল্পায়ু

হয় না। সুতরাং আর্থিক সাফল্যকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া ধরিলেও দেখা যাইবে যে, অস্থায়ী সাময়িক নাটকগুলি অপেক্ষা যে সকল নাটক চিরপ্রিয় বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত হয় সেগুলি পরিণামে অধিকতর আয়প্রদ হয়।

ভিক্টর হিউগোর মতে দর্শকেরা তিন শ্রেণীভুক্ত

সাধারণতঃ কিরূপ নাটক জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় উপরে তাহার আলোচনা করিলাম। কিন্তু সকল দর্শকের শিক্ষাদীক্ষা রুচি প্রকৃতি এক প্রকার নহে এবং নাট্যকারকে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর দর্শককেই তুষ্ট করিতে হয়। সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) দর্শকগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) সাধারণ দর্শক যাহারা নাটকীয় ক্রিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক। নাটকের ভাব রস চরিত্রের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি থাকে না। ঘটনার পর ঘটনা, ক্রিয়ার পর ক্রিয়া দেখিতে পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয় এবং সেগুলি যত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, ততই তাহাদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া যায়, সুতরাং এইরূপ ঘটনাবহুল নাটকই তাহাদের নিকট প্রিয়। (২) স্ত্রীলোক বা তদ্রূপ ভাবপ্রবণ দর্শকবৃন্দ। এই জাতীয় দর্শকগণের রসপিপাসু হৃদয় অগাধ সহানুভূতিতে ভরপুর। প্রেম ও ভাবের উচ্ছ্বাস দর্শনে সহজেই তাহা বিগলিত হয়। এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশী। এই কারণেই যাত্রার নাটক সাধারণতঃ ঘটনাপ্রধান না হইয়া রসপ্রধান হইত। (৩) চিন্তাশীল দর্শকবৃন্দ— যাঁহারা তাহাদের চিন্তার আহার্য পাইবার প্রত্যাশায় অভিনয় দেখিতে আসেন। নাটকের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও দার্শনিক গভীরভাব সন্ধান পাইলে তাহারা আনন্দিত হন এবং সর্বদা তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশের প্রতি। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা সর্বত্রই খুব অল্প।

যে সকল প্রতিভাবান নাট্যকারের নাটক এই তিন শ্রেণীর দর্শককেই এককালে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক

সফলতা লাভ করিতে পারেন। সেক্সপিয়ারের "হ্যামলেট" নাটক এইরূপ নাটকের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কবিবর গেটের সুবিখ্যাত "ফাউস্ট্" নাটকের রস কেবল তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ চিন্তাশীল দর্শকগণই উপভোগ করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার খ্যাতি শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গেটের সহিত সেক্সপিয়ারের প্রভেদ এই খানেই। উভয়েই অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন,

গেটে ও সেক্সপিয়ারের মধ্যে প্রভেদ

কিন্তু সেক্সপিয়ার ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও অভিনেতা, সর্বশ্রেণীর দর্শকগণের রুচি প্রকৃতির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে নাটক লিখিতে হইত, নতুবা থিয়েটার চালান দুর্ঘট হইত। তদ্ভিন্ন তিনি ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সেখানকার অভিনেতাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি ভালরূপেই জানিতেন এবং নাটক লিখিবার সময় সেই জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতেন। পক্ষান্তরে গেটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ন্যায় 'সৌখীন' নাট্যকার। যদিও Duke of Saxe-Weimar-এর সচিবরূপে তিনি কিছুদিন রাজবাটীর নাট্যালয় পরিচালনা করিয়াছিলেন, সাধারণ দর্শকগণের কথা কখন তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি ছিলেন জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি— সাধারণতঃ উচ্চ কল্পনারাজ্যেই তিনি বাস করিতেন। তিনি তাঁহার 'ফাউস্ট্' নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তরুণ বয়সে, আর তাহা শেষ করিয়াছিলেন যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয় সেই বৎসরে— ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স তিরাশী বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল নাটকখানি দার্শনিক কবির মানস রাজ্যে বাস করিয়া অবিরত তাঁহার উচ্চ চিন্তাধারা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল, ভূমিষ্ঠ হইবার অবসর পায় নাই, সুতরাং স্থূলজগতের রঙ্গভূমির সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল না। বলা বাহুল্য এরূপ নাটক সাধারণ দর্শককে কখন আকৃষ্ট করিতে পারে না।

বস্তুতঃ সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে গেটের ন্যায় নাট্যকার হইলে চলে না, চাই সেক্সপিয়ারের ন্যায় নাট্যকার।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন সেক্সপিয়রজাতীয় নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর নাট্যকার। সেক্সপিয়ারের ন্যায় তিনি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও অভিনেতা ছিলেন, এবং সাধারণ দর্শকগণের শিক্ষা দক্ষতা রুচি ও মনোভাবের সহিত পূর্ণভাবে পরিচিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর দর্শকগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাহাদের তুষ্টি ও শিক্ষার জন্য নাটক লিখিতেন এবং সেই জন্যই তিনি আমাদের মরণাপন্ন রঙ্গালয়কে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের নাট্যসাহিত্যকে তিনি কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পরবর্তী অধ্যায়ে দিবার চেষ্টা করিব।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## গিরিশযুগ

### বাংলার রঙ্গালয়ে ও নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের দান।

গিরিশচন্দ্রের জন্মগত প্রতিভা শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল

যে সকল গুণ থাকিলে নাট্যজগতের অধিনায়ক হওয়া যায়, গিরিশচন্দ্র তৎসমুদয়ের প্রচুর পরিমাণে অধিকারী ছিলেন, তাহা আমি গত অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু রীতিমত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে এই অধিকার অর্জন করিতে হইয়াছিল। অসামান্য নাট্যপ্রতিভা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকসমক্ষে নাট্যকাররূপে প্রকট হইবার পূর্বে বহুবৎসরব্যাপী শিক্ষা, সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি এই সকল ঈশ্বরদত্ত গুণের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং সেই জন্যই তিনি এত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভা ভগবানের দান সন্দেহ নাই, আর জন্মগত প্রতিভা না থাকিলে কেহ কেবল ছন্দঃশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া কবি হইতে পারে না তাহাও সত্য—কিন্তু এ কথাও সত্য যে, প্রতিভাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুইই আবশ্যক। অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডার ম্যাথিউজ্ ঠিকই বলিয়াছেন, "It is true that the poet is born, not made; but it is also true that after he is born he has to be made." প্রতিভা জন্ম হইতে লব্ধ হইলেও প্রয়োগকৌশল শিক্ষা ব্যতীত তাহাকে রূপদান করা যায় না। তাহার পর চাই তাহা প্রকাশের সুযোগ। মাইকেল অসাধারণ কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশ-বিদেশের কবিদের কাব্য লিখিবার ধারা অনুশীলন করিয়া তাহার প্রয়োগকৌশলও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তথাপি আমরা

তাঁহাকে পাইতাম না, যদি না বেলগাছিয়া থিয়েটারের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটিত। সাধক রামপ্রসাদের প্রভু গুণগ্রাহী না হইলে তাঁহার প্রতিভা বোধ হয় হিসাবের খাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। জীবিকা অর্জনের জন্য গিরিশচন্দ্রকেও সওদাগরী আফিসের নীরস হিসাবপত্রের আবর্তে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার আজন্ম রসপিপাসু হৃদয় তাঁহাকে জোর করিয়া সেখান হইতে টানিয়া আনিয়া রঙ্গালয়ে ফেলিয়া দিয়াছিল, নতুবা হয়ত আমরা তাঁহাকে হারাইতাম।

যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র নিজ প্রতিভা প্রকাশের প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, চিন্তাশীল ও ভাবুক ছিলেন—যাহা কিছু দেখিতেন ও শুনিতেন গভীরভাবে তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেন। কোন বিষয়ে কিছু সন্দেহ জন্মিলে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন স্থির থাকিতে পারিত না, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসাবাদ ও অধ্যয়নের সাহায্যে তিনি তাহা নিরাকরণের চেষ্টা করিতেন। এ কার্য্যে তাঁহার ছোট বড় জ্ঞান ছিল না। বহুবৎসর পূর্বের কথা—একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, উত্তমাঙ্গের রোগ ও নিম্নাঙ্গের রোগ রোগীর মনের উপর বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া করে; যেমন কাহারও উদরের পীড়া হইলে সে যেরূপ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, যক্ষ্মাদির ন্যায় বক্ষঃপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সেরূপ হয় না—এমন কি শেষোক্ত পীড়া যত অগ্রসর হয় রোগী যেন ততই আপনাকে সুস্থ মনে করে। ইহার কারণ কি বলিতে পারেন? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা কি বলেন?" আমি সে সময় অন্যান্য বিষয়ের সহিত শারীরবিজ্ঞানেরও অধ্যাপনা করিতাম, বোধ হয় সেই জন্যই তিনি আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি ইহার সদুত্তর দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার অধীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এ প্রশ্নের আলোচনা আমি দেখিতে

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা ও সাধনার রীতি

পাই নাই। তিনি তখন দেহসম্পর্কী-মনস্তত্ত্ব (Physiological Psychology) বিষয়ে সেকালে প্রচলিত যে দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ আমার নিকট ছিল তাহা চাহিয়া লইলেন এবং তাহাতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না মিলিলেও মনোনিবেশ সহকারে কিছুদিন ধরিয়া তাহা পাঠ করিলেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে আমি যে কেবল তাঁহার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা নয়, তিনি যে কিরূপ ভাবে পরীক্ষিত মনস্তাত্ত্বিক সত্যের উপর তাঁহার নাটকগুলি গড়িয়া তুলিতেন তাহারও আভাস পাইয়াছিলাম।

এইরূপে সারাজীবন পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন প্রভৃতির সাহায্যে গিরিশচন্দ্র বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অর্জিত তত্ত্বের দ্বারা তিনি তাঁহার নাটকসমূহের সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নয়, তাহা তাহাদিগকে আনন্দ দান করিতে পারে না। সেগুলিকে উপভোগ করিতে পারেন কেবল ভিক্টর হিউগো-বর্ণিত তৃতীয়-শ্রেণীর দর্শকেরা। কিন্তু অতি নীরস তত্ত্বও কেমন করিয়া সরস ও সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় গিরিশচন্দ্র তাহা জানিতেন। ফলে তাঁহার মস্তিষ্কলব্ধ জ্ঞান তাঁহার দরদভরা হৃদয়রাগে রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত। তিনি যে অগাধ সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুধী ও সাধুগণের সংসর্গে ক্রমশই প্রশস্ততর হইয়াছিল। তিনি উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের প্রাণের দুঃখ তিনি নিজের প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন, তাহারা কি চায় ও কেন তাহা চায় তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত ও পতিতাদের মধ্যেও যে উচ্চ হৃদয় থাকিতে পারে এবং পক্ষান্তরে অতি শিক্ষিতের মধ্যেও যে ঘোর স্বার্থপর পিশাচের অধিষ্ঠান বিরল নয় তাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আবার ঘটনাচক্রে বা সংসর্গগুণে অতি মন্দ চরিত্রও কেমনা করিয়া

গিরিশচন্দ্রের বহুদর্শিতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতি

দেবোপম নির্মূল হইয়া যায় তাহাও তিনি অনেক দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই এ সকল চরিত্র আঁকিয়াছিলেন। তবে কোন কোন চিত্র তিনি সাধারণ দর্শকগণের মানসপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটককারগণের মধ্যে দীনবন্ধু বাবুকেই তাঁহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বলিতে গেলে, দীনবন্ধু বাবুই প্রথমে এইরূপ প্রত্যক্ষ চরিত্র লইয়া নাটকলেখার পথ প্রদর্শন করেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব অভিজ্ঞতা এবং তীব্র ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই তিনি এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রেও এই সকল গুণ সমভাবে বর্তমান ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত হইত।

কিন্তু এ সকল সামাজিক নাটক সাধারণতঃ অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপার লইয়া লিখিত হইত, সুতরাং তাহারা সমাজের উপরিতলে আলোড়ন সৃষ্টি করিলেও নিম্নতলে যে তাহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে। যে নাটক সমগ্র জাতির হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারে না বা তাহার স্পন্দন যে নাটকের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে না তাহাকে পূর্ণভাবে 'জাতীয় নাটক' নাম দেওয়া অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের সমাজ এখনও পর্য্যন্ত তাহার পোচীন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এ সমাজে যে শীঘ্র ধর্ম্মমূলক নাটকের পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্যাদর্শে লিখিত আধুনিক সামাজিক নাটকসমূহ অধিকতর আদৃত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ভুল। গিরিশচন্দ্র এ কথা বুঝিতেন, কারণ তিনি নিজেও আজন্ম অনুরূপ রসের রসিক ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে প্রেম ও ভক্তিভাব নানা রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের বাটীতে শ্রীধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার নিত্যপূজা হইত। সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার খুল্ল-পিতামহীর নিকট

পৌরাণিক নাটকের প্রতি গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক অনুরাগ

বসিয়া রামায়ণ মহাভারতের কথা ও ভাগবতাদি পুরাণের কাহিনা শুনিতেন—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন—নায়ক নায়িকাদের সুখে দুঃখে তাঁহার হৃদয় আনন্দে বিষাদে পূর্ণ হইয়া যাইত। এমন কি শুনা যায়, বৃন্দাবনের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত গোপগোপীগণের বিরহব্যথা তাঁহার মর্মস্থলে এরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, যে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও মাথুরলীলাকীর্তন শুনিতে পারিতেন না। বাল্য ও কৈশোর কালে তিনি যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবি ও হাফ আখড়াই গান সর্বদাই শুনিতেন এবং সেই বয়সেই সে সকলের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন। যাত্রা কথকতাদি শুনিবার সময় তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি-করুণার্দ্রহৃদয় সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—কথায় কথায় চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইত। তাহার পর যৌবনকালে তিনি নিজেই যাত্রার দল গঠন করিয়া তাঁহার নটজীবন আরম্ভ করেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। নাট্যকাররূপেও তিনি প্রথমে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করেন। পৌরাণিক গীতিনাট্য "আগমনী"ই তাঁহার প্রথম নিজস্ব নাটক বা নাটিকা; এবং তাঁহার শেষ নাটক—"তপোবল"।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র 'গ্রেট ন্যাশান্যাল' থিয়েটারে যোগদান করেন এবং বিশেষ কারণে তাহার 'গ্রেট' বিশেষণ বর্জন করিয়া তাহার নাম দেন, 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার'। সেই বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সেখানে তাঁহার "আগমনী" নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয়। তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স ৩৩ বৎসর। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারা আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তিনি কখন শিক্ষার্থীর আসন ত্যাগ করেন নাই—সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। এই জন্য দেখিতে পাই যে, যখন তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যকল্প ব্যক্তিরা নাট্যকাররূপে সগর্বে রঙ্গালয়ে বিরাজ করিতেছেন, তখনও তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে শিক্ষানবিশরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, মাইকেলের "মেঘনাদ বধ", নবীনের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া নাট্যরচনায়

গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা

হাত পাকাইতেছেন। তাহার পর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সহসা ''আগমনী''র ন্যায় একটি ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও আত্ম-প্রকাশে সম্মত হন নাই—"মুকুটাচরণ মিত্র" এই ছদ্মনাম দিয়া নাটিকাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি "অকাল বোধন" ও "দোল লীলা" নামক আরও দুইখানি অনুরূপ ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন, কিন্তু তাহার পরেই পুনরায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। "দোল লীলা" ১৮৭৮ সনে দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অভিনীত হয় এবং তাহার তিন বৎসর পরে ১৮৮১ সনে তিনি তাঁহার প্রথম প্রতীক (Symbolic) গীতিনাট্য "মায়াতরু" রচনা করেন। এইরূপে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকার জীবন আরম্ভ হয়। এই বৎসরই তিনি তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক "আনন্দ রহো" রচনা করেন। এই নাটকটি ১২৮৮ সালে (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ২৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে উক্ত ন্যাশান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার পর তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার লেখনী হইতে অবিরল ধারায় নাটকের স্রোত প্রবাহিত হইয়া বঙ্গের বিবিধ রঙ্গালয়কে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। তাঁহার শেষ নাটক ''তপোবল'' অভিনীত হয় ১৯১১ সনের নভেম্বর মাসে এবং পরবৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই তিনটি নাটক অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া যান। তাহার মধ্যে একটি পারিবারিক নাটক তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ করিয়া ''গৃহলক্ষ্মী'' নামে অভিনয় করা হয়।

গিরিশচন্দ্রের এইরূপ পুরাদস্তুর নাট্যকাররূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর রঙ্গালয়ের কিরূপ দুর্দশা হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বঙ্কিমের উপন্যাস লইয়া কিছুদিন চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও ক্রমশঃ পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। নূতন নাটকের জন্য পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন দিয়াও কোন ফল হয় নাই। ফলে ১৮৭৯ সনে গ্রেট ন্যাশান্যাল (ওরফে ন্যাশান্যাল) থিয়েটার নিলামে উঠিল এবং প্রতাপচাঁদ জহুরী

নামে এক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার তাহার স্বত্বাধিকার ক্রয় করিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নতির জন্য বা সখ মিটাইবার জন্য তিনি থিয়েটারটি ক্রয় করেন নাই, ব্যবসায় হিসাবেই কিনিয়াছিলেন। উহা থিয়েটারের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছিল। ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবেই থিয়েটারটি এত দিন ভালরূপ চলে নাই এবং তাহার ফলে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকের পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবে তাঁহারাও নিষ্ফল হইয়াছিলেন। এমন কি, একবার গিরিশচন্দ্র স্বয়ং থিয়েটারটি ভাড়া লইয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনিও হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রতাপচাদ থিয়েটারটি হাতে লইয়াই সেটিকে একটা রীতি-মত ব্যবসায়-কেন্দ্রে পরিণত করিতে মনস্থ

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণভাবে রঙ্গালয়ে যোগদান

করিলেন এবং সেইজন্য তিনি থিয়েটারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সকল প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গিরিশচন্দ্রের উপর। তিনি "জহুরী" ছিলেন, জহর চিনিতেন—তিনি বুঝিয়াছিলেন, এক গিরিশচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ তাঁহার থিয়েটার রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যতদিন গিরিশচন্দ্র দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবেন, ততদিন তাঁহার নিকট মনোমত কাজ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তিনি গিরিশচন্দ্রকে অফিসের কাজ ছাড়িয়া পূর্ণমাত্রায় থিয়েটারে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানিতে দেড় শত টাকা মাহিনার চাকুরি করিতেন এবং আশু উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কারণ তিনি সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন স্থলে কম মাহিনায় থিয়েটারে অনিশ্চিত চাকুরী গ্রহণ অবশ্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই অনুমোদন করিলেন না। তাহার উপর ছিল সংসারের চিন্তা। কিন্তু অবশেষে রঙ্গালয়ের আকর্ষণই তাঁহার নিকট প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইল—তিনি আফিসের চাকুরি ছাড়িয়া, মাত্র একশত টাকা বেতনে থিয়েটারের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন।

তার পর আসিল নাটকের চিন্তা। নাটকের প্রকৃত গুণাগুণের বিচার জহুরী মহাশয় করিতেন না—করিতে পারিতেনও না—খরিদদারদের সন্তোষবিধানই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিছুকাল পরে যখন তাঁহার থিয়েটারে গিরিশ-চন্দ্রের "সীতার বনবাসে"র অভিনয় হয়, তখন লবকুশের গান দর্শক-গণের প্রাণে আনন্দের ধারা বহাইয়া দিয়াছিল। তিনি অমনই গিরিশ-চন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন, যেন তিনি তাঁহার পরবর্তী নাটকে এক জোড়ার স্থলে দুই জোড়া ঐরূপ বালক ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করেন! যে বৎসর (১৮৮০ সনে) গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের ন্যাশান্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন, সে বৎসর তিনি কোন নাটক লেখেন নাই, অভিনয় মাত্র করিয়াছিলেন। তখন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ঐতিহাসিক নাটক "হামির" অভিনয়ার্থ নির্বাচিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাতে রাণা হামিরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবৎসর তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রথমে "মায়াতরু" ও "মোহিনী প্রতিমা" নামক গীতিনাট্যদ্বয় ও "আলাদিন" নামক একটি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য রচনা করেন, কারণ তখনও বোধ হয় তাঁহার স্বশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায় নাই। কিন্তু ঐরূপ গীতিনাট্য বা রঙ্গনাট্য গৌণভাবে থিয়েটারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিলেও মুখ্যতঃ উচ্চশ্রেণীর নাটক অভিনয়ের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করে। বিশেষতঃ "মায়াতরু" বা "মোহিনী প্রতিমা"র ন্যায় প্রতীকজাতীয় গীতিনাট্য সাধারণের দুর্বোধ্য ছিল। সুতরাং গিরিশ-চন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বৃহত্তর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সে সময়ে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে "অশ্রুমতী" ও "হামির" নাটক যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, সুতরাং জহুরী মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে ঐরূপ একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ফলে "আনন্দ রহো" রচিত হইল। "অশ্রুমতী" নাটকের ন্যায় "আনন্দ

"হামির" নাটক

গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা কতিপয় গীতিনাট্য

'রহো"র‌ও বিষয়বস্তু রাণা প্রতাপের কাহিনী হইতে গৃহীত হয় এবং "দুর্গেশনন্দিনী"র ন্যায় ইহাতেও একটা অদ্ভুত প্রেমকাহিনী ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এবার বেচারা প্রতাপের কন্যাকে রেহাই দিয়া মানসিংহের কন্যাকে লইয়া নাস্তানাবুদ করা হইয়াছিল। দর্শকেরা সবিস্ময়ে দেখিত— মহারাজ মানসিংহের কন্যা নিজ প্রণয়পাত্রকে না পাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার মানসে যুবরাজ সেলিমকে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে সেলিমের পিতা বৃদ্ধ আকবরকে পর্যান্ত প্রেম নিবেদন করিতেছে! যাহা হউক, এরূপ নাটকেও গিরিশচন্দ্র তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ "বেতাল" চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া। বেতালের "আনন্দরহো" বাণী শুনিয়া মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত পাষণ্ডও ভয়ে কম্পান্বিত হইত—মানবশক্তির তুচ্ছতা অনুভব করিত। গিরিশচন্দ্র নিজেই এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক "ঐতিহাসিক" নাটকের মধ্যে এরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ অলৌকিক চরিত্রের সহসা আবির্ভাব কতকটা 'বেতালা' বলিয়াই দর্শকগণের মনে হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা ইহাকে বড় সদয় চক্ষে দেখে নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক "আনন্দ রহো'

সুখের বিষয়, ইহার পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি এতদিন অনেকটা সাময়িক আবহাওয়া ও কর্তৃপক্ষের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, যে নাটকের সহিত জনসাধারণের হৃদয়ের সংযোগ নাই, সে নাটক অভিনয় করিয়া রঙ্গালয় বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। 'আনন্দরহো'র মধ্যে যে সুন্দর ভক্তিপূর্ণ গানগুলি দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি সকল শ্রেণীর দর্শকেই কিরূপ আনন্দ সহকারে শুনিয়াছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এত বিপ্লবের মধ্যেও আমাদের জাতি তাহার আধ্যাত্মিক হৃদয় হারায় নাই। বলিয়াছি, তাঁহার হৃদয়ও শৈশব হইতে সেই ভাবেই গঠিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক—"রাবণ বধ"

সুতরাং ভবিষ্যৎ পথ বাছিয়া লইতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। তিনি আমাদের চিরন্তন রসভাণ্ডার—আমাদের জাতীয় কবিদের অনুপ্রেরণার সেই আদিম উৎস—রামায়ণ মহাভারতের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং "আনন্দ রহো" অভিনয়ের দুই মাস পরেই তিনি "রাবণ বধ" নাটক লইয়া দর্শকগণের সম্মুখীন হইলেন। ফল হইল চমৎকার—মরা গাঙে বান ডাকিল—দলে দলে উচ্চ নিম্ন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর দর্শকগণের আগমনে রঙ্গালয়ের শ্রী একেবারে ফিরিয়া গেল! এইরূপে প্রকৃত জাতির সহিত রঙ্গালয়ের সংযোগ স্থাপিত হওয়াতে থিয়েটারের "ন্যাশান্যাল" নাম এতদিন পরে সার্থক হইল।

পৌরাণিক নাটকের অবিরল ধারা

ইহার পর গিরিশচন্দ্র অবিরল ধারায় পৌরাণিক নাটক লিখিতে লাগিলেন। "রাবণ বধ" প্রথম অভিনীত হয় ১৮৮১ সনের ৩০শে জুলাই তারিখে, তাহার দেড়মাস পরেই "সীতার বনবাস," তাহার দুইমাস পরে "অভিমন্যু বধ" এবং তাহার একমাস পরে "লক্ষ্মণ-বর্জন" নাটক অভিনীত হইল। লক্ষ্মণ-বর্জনের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮১ সন। ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে "সীতার বিবাহ," "রামের বনবাস" ও "সীতাহরণ" অভিনীত হয়। মাঝে একবার গিরিশচন্দ্র "ব্রজবিহার" নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি গীতিনাট্য লেখেন। এই গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—এখানি ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল গানে পূর্ণ—কথা নাই, সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর গানেই দেওয়া হইয়াছে।

১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গিরিশচন্দ্রের "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাহার পরেই তিনি সেখানকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া গুর্মুখ রায় নামে এক শিখ যুবকের অর্থসাহায্যে "ষ্টার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক "দক্ষযজ্ঞ" লইয়া ১৮৮৪ সনের জুলাই মাসে এই থিয়েটারের

উদ্বোধন হয়। এই অভিনয় প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু গুর্মুখ রায় আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় থিয়েটারটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্র, রসরাজ অমৃত বসু প্রভৃতি চারিজনে ইহার স্বত্বাধিকারী হন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকারিত্বের ঝঞ্ঝাট পোহান অপেক্ষা পূর্বের ন্যায় বেতনভোগী অধ্যক্ষ হইয়া থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এই স্থানে দক্ষযজ্ঞের পর গিরিশচন্দ্রের "ধ্রুবচরিত্র," "নল-দময়ন্তী," "কমলে কামিনী," "বৃষকেতু" ও "শ্রীবৎস-চিন্তা"র অভিনয় হয়।

"চৈতন্যলীলা" নাটক

ইহার পরেই তিনি ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব চিত্র "চৈতন্যলীলা" নাটক লইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। ফল হইল আশাতীত, ধারণাতীত! দেখিতে দেখিতে রঙ্গালয় যেন চৈতন্যযুগের নবদ্বীপে পরিণত হইল—যে প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে" গিয়াছিল তাহাই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়া প্রেক্ষাগৃহের সহিত সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিল! স্বয়ং পরমহংস রামকৃষ্ণদেব রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিলেন, মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত পর্য্যন্ত আসিয়া নটনটীগণকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কত জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল—কত নৈয়ায়িক সার্বভৌম কূটতর্ক ছাড়িয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন! স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও এইরূপে পরমহংসদেবের কৃপার পরশ পাইয়া নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। তাহার ফলে তাঁহার পরবর্তী ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটকগুলি—এমন কি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক পর্য্যন্ত—পরমহংসদেবের উপদিষ্ট বিশ্বপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সেবাধর্মের কথা ও দৃষ্টান্তে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অবশ্য ইহার পূর্বে "মায়াতরু" হইতে আরম্ভ করিয়া বহু গীতিনাট্য ও নাটকেই তিনি নিঃস্বার্থ প্রেমের মোহিনীশক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু "চৈতন্যলীলা"র সময় হইতে সেই লৌকিক প্রেম বহুলপরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়াছিল।

"চৈতন্যলীলা"র পর গিরিশচন্দ্র ক্রমান্বয়ে "প্রহ্লাদচরিত্র," "নিমাই সন্ন্যাস," "প্রভাস যজ্ঞ," "বুদ্ধদেব চরিত," "বিল্বমঙ্গল" ও "রূপসনাতন" লিখিলেন। ফলে ভগবৎপ্রেমের যে মহাতরঙ্গ "চৈতন্যলীলা" তুলিয়াছিল তাহা প্রবলতর হইয়া দেশের নরনারীর প্রাণ আকুল করিয়া দিল। "বুদ্ধদেব চরিতে"র শেষগান,—"চল যাই দেশ বিদেশে, ঘরে ঘরে করি গান। কে কোথায় আয়রে ত্বরা, নিবি যদি নূতন প্রাণ"—যেন মূর্তি ধরিয়া দেশবিদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ভগবৎপ্রেমের সঞ্জীবনী সুধা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু সংসারপঙ্কে নিমগ্ন জীব উঠিয়া আসে কি করিয়া?

অন্যান্য ভক্তি ও প্রেমমূলক নাটক

তাই গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলচরিত সম্মুখে ধরিয়া দেখাইলেন যে অতি সহজ উপায়েই সে কাজ করা যায়। একনিষ্ঠ লৌকিক প্রেম (এমন কি হীন ইন্দ্রিয়জ আসক্তি) ও ভগবৎ-প্রেম বস্তুতঃ একজাতীয়। দুইই হীরক—তবে একটি আকরস্থ প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি মিশ্রিত—অপরটি সম্পূর্ণ অবিমিশ্র ও বিশোধিত। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তি অদম্য হইলে তাহা দমনের জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া, তাহার বিশুদ্ধিকরণই (sublimation) বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং এই বিশুদ্ধিকরণের সহজ উপায় প্রবৃত্তিটিকে কোন ক্রমে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দেওয়া। বৈষ্ণবেরা ইহাকেই বলেন, "ভগবানে কামার্পণ"। এই উপায়েই ঘোর লম্পট বিল্বমঙ্গল মহাপ্রেমিক সাধকে পরিণত হইয়াছিলেন। বারাঙ্গনা (কিন্তু পূর্ণ-প্রেমিকা) চিন্তামণি হইয়াছিল তাঁহার এই সাধনপথে উত্তরসাধিকা। এই জন্যই বিল্বমঙ্গল তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই বলিয়াছেন—

"বিল্বমঙ্গল" নাটক

"বিল্বমঙ্গল" নাটকের বিষয়-বস্তু ও বৈশিষ্ট্য

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুর্রুর্মে"

স্বয়ং চৈতন্যদেব যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিয়া

রাত্রিদিন আনন্দে বিভোর থাকিতেন তাহাদের মধ্যে "কর্ণামৃত" গ্রন্থখানি অন্যতম। ইহাতেই বুঝা যায়, বিল্বমঙ্গলের এই অপরূপ সাধনা তাঁহাকে কত উচ্চস্তরে লইয়া গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই নাটকের আখ্যান-বস্তু নাভাজী-কৃত হিন্দী "ভক্তমাল" গ্রন্থের লালদাস-কৃত বাংলা অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিযাছিলেন। এই বাংলা "ভক্তমাল" গ্রন্থেও দেখি, যখন চিন্তামণি বৃন্দাবনে আসিয়া বিল্বমঙ্গলের সহিত মিলিত হইল, তখন বিল্বমঙ্গল তাহাকে "গুরুভাবে প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে।" গিরিশচন্দ্রও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলা চিন্তামণিকে দেখিবামাত্র বলিযা উঠিলেন, "একি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্বমোহিনী, আমাকে কৃপা করুন (প্রণাম করন)।" গিরিশচন্দ্র এই নাটকে বিল্বমঙ্গল ভিন্ন এক চোর-ভিক্ষুক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল কাম-প্রবৃত্তি নয়, যে কোন বলবতী প্রবৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিলে তাহা বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হইতে পারে। ভিক্ষুক ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রবল চৌর্য-প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া যখন সোমগিরির শরণাপন্ন হইয়াছিল, তখন সেই মহাত্মা তাহাকে "মাখনচোরকে চুরি" করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকও সেই সঙ্কেতানুসারে তাহার প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণাভিমুখে চালিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বিল্বমঙ্গলে ভিক্ষুক, সাধক, থাক ও পাগলিনী চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। বলিয়াছি, সকল শ্রেণীর দর্শকের আনন্দ-বর্ধনের জন্য এদেশে প্রত্যেক নাটকে গান ও হাস্যরসাত্মক দৃশ্য দিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ গম্ভীররসাত্মক নাটকে এরূপ দৃশ্যের স্থান করা কঠিন হয়। সেইজন্য অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বিষয়-বস্তুর সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও নাট্যকার জোর করিয়া কতকগুলি গান ও হাস্যরসাত্মক চরিত্র বা দৃশ্য নাটকের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। কিন্তু এরূপ অবাস্তর চরিত্র বা দৃশ্যের সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। ফলে তাঁহার নাটকে প্রত্যেক

চরিত্রের একটা বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়। তিনি সাধক ও থাককে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির পাশে দাঁড় করাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কপট প্রণয় প্রকৃত প্রেমের ঠিক বিপরীত ফল দেয়। "পাগলিনী" হইতেছেন আমাদের অন্তরাত্মার প্রতীক। সঙ্কটসঙ্কুল জীবনপথে চলিবার সময় চরম-নৈরাশ্যের ঘোর আঁধারে দিশেহারা হইয়া যখন আমরা ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করি, তখন তিনি বিদ্যুতের মত আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পথ দেখান। তখন তাঁহার নির্দেশমত চলিলে উত্তালতরঙ্গভরা প্রবল নদী "গোখুর জল" হইয়া যায়—"অজগর গোখ্‌রো সাপ" দড়ি হইয়া যায়—নরকের সহচরী বারাঙ্গনা স্বর্গের পথপ্রদর্শিকায় পরিণত হয়। এ চরিত্র ম্যাকবেথের ডাইনী-চরিত্রের ঠিক বিপরীত। ম্যাকবেথ মহাবীর হইলেও ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। একটা বড় যুদ্ধে জয়লাভের পর সিংহাসনলাভের জন্য তাঁহার অন্তরে যে দুরভিলাষ জাগিয়াছিল, ডাকিনীরা প্রকৃতপক্ষে তাহারই বাহ্য-প্রতিমূর্তিরূপে দেখা দিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল ছিলেন সৎসংস্কৃত ব্রাহ্মণসন্তান, চিন্তামণির প্রতি তাঁহার প্রেম রূপমোহজনিত হইলেও অকপট ছিল। সেই দারুণ দুর্যোগের রজনীতে নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য তাঁহার নিজ ঘৃণ্য জীবনের প্রতি যে ধিক্কার জন্মাইয়াছিল, তাহারই সংঘাত তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া তাঁহার অন্তর্জ্যোতি প্রকাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

"রূপসনাতন" অভিনীত হয় ১৮৮৭ সনে। ইহার পর কলুটোলার গোপাললাল শীল বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারের বাটীটি ক্রয় করিয়া সেখানে "এমারেল্ড থিয়েটার" স্থাপন করেন এবং স্টার থিয়েটার কোম্পানি হাতিবাগানে নূতন বাটী নির্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহাদের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও নাট্যকার নিযুক্ত করেন এবং গিরিশচন্দ্র সেখানে "পূর্ণচন্দ্র" নাটক লেখেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধে তাঁহাদিগকে গোপনে "নসীরাম" নামক নাটক

লিখিয়া দেন। এই দুইখানি নাটক অভিনয়ের পর এমারেল্ড থিয়েটারে তাঁহার "বিষাদ" নাটক অভিনীত হয়। এই তিনখানি নাটকেই তিনি আত্মত্যাগী অপার্থিব প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। "পূর্ণচন্দ্রে" তিনি শাশ্বত ভগবৎ-প্রেম ও আত্মিক-মিলন ক্ষণভঙ্গুর মানবীয় প্রেম ও দৈহিক মিলন অপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইহার নায়িকা সুন্দরাকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়া, তিনি ভক্তিসাধনার একটি সুন্দর চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। "নসীরামে"ও তিনি পশুপ্রকৃতির উপর দেবপ্রকৃতির—কামের উপর প্রেমের—জয় গান করিয়াছেন। নসীরামের কথা এই—কাম স্বার্থপর, প্রেম পরার্থপর—কাম মানুষকে অমানুষ করে, প্রেম তাহার মনুষ্যত্ব বাড়াইয়া তাহাকে দেবতা করে—অতএব "জগৎকে প্রেম দাও—যে হীনের হীন তাকে প্রেম দাও—রাই-রাজার ঘরে প্রেম ফুরোবেনা—যত পার বিলাও।" "বিষাদ" নাটকের নায়িকা সরস্বতী আত্মত্যাগী প্রেমের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র। রাজকন্যা ও রাজরাণী হইয়াও তিনি তাঁহার দুশ্চরিত্র স্বামীকে সেবা করিবার জন্য তাঁহার রক্ষিতা বারবনিতার গৃহে ছদ্মবেশে ভৃত্যরূপে অবস্থান করেন এবং সেই উন্মার্গগামী স্বামীকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন।

"নসীরাম," "বিষাদ" ও "পূর্ণচন্দ্র" নাটকে আত্মত্যাগী প্রেমের চিত্র

"বিষাদ" অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। এইরূপে সমস্ত জীবন তিনি বারংবার থিয়েটার বদল করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব কোন থিয়েটার ছিলনা—তিনি ছিলেন free-lance—সকল থিয়েটারই সঙ্কটে পড়িলে তাঁহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তিনি নিজেও অনেক সময়ে নানা কারণে এক থিয়েটার ছাড়িয়া অন্য থিয়েটারে যাইতেন। সুতরাং কোন থিয়েটারেই তিনি দীর্ঘকাল স্থায়ী হন নাই। এমারেল্ড থিয়েটারে তিনি অনেক টাকা লইয়া গোপাললাল শীলের সহিত পাঁচবৎসরের এগ্রিমেণ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপাললালের সখ অল্পকাল

পরে মিটিয়া গেল, তিনি তাঁহার থিয়েটার অন্য লোককে ভাড়া দিলেন, গিরিশচন্দ্রও বন্ধনমুক্ত হইয়া স্টারে চলিয়া আসিলেন। এরূপ যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করাতে তাঁহার সুবিধা অসুবিধা দুইই ছিল। সুবিধা ছিল এই যে, থিয়েটারের স্বত্বাধিকার না থাকাতে তাঁহাকে তাহার আয়ব্যয়ের লাভালাভের ভাবনা ভাবিতে হইতনা, তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে নাটক লিখিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাতে অসুবিধাও বড় কম ছিলনা। তিনি স্বেচ্ছামত নাটক লিখিতে পারিতেননা—অনেক সময়ে তাঁহাকে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করিতে হইত। কর্তারা দেশের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যখন যে বিষয়ে নাটক লিখিলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিতেন তখন সে বিষয়ে তাঁহাকে নাটক লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। তিনিও "তথাস্তু" বলিয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। অবশ্য তিনি যে নাটকই লিখিতেন তাহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকিত এবং সাধারণতঃ তাহা সেবিষয়ে অন্যান্য নাট্যকারের লিখিত নাটক হইতে অনেক ভাল হইত। কিন্তু তিনি নিজে সকল সময়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি ছিলেন উচ্চ আদর্শবাদী—নিঃস্বার্থ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম, আত্মত্যাগ, পরসেবা প্রভৃতির আদর্শ স্থাপন করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও সাধনাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সেই সকল আদর্শ-চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। আধুনিক "বস্তুতান্ত্রিকতা" কখন তাঁহার প্রীতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এরূপ নাটকের প্রতি তাঁহার কিরূপ মনোভাব ছিল, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। ১৯০৫ সনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে একখানি tragedy লিখিয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে তিনি "বলিদান" নাটক লিখিয়া দেন এবং মিনার্ভা থিয়েটারে অসাধারণ সাফল্যের সহিত তাহা অভিনীত হয়। কিন্তু এই নাটকের অভিনয়ান্তে রসরাজ অমৃতলাল যখন তাঁহাকে

নাটক রচনা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা

"বলিদান" নাটক

অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা। আমি যে বিষয় নিয়ে একটা ফার্স্ মাত্র লিখেছি, আপনি তাই নিয়ে একটা এত বড় এবং এমন শক্তিশালী ট্র্যাজেডি লিখলেন!" তখন গিরিশচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিলেন, "এসব নাটক আমার লেখার কথা নয়। মনে ক'রেছিলাম শেষ বয়সে দু'চার খানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা' বুড়ো বয়সেও এই নর্দামা ঘাঁটতে হচ্ছে। এ সব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।"

"শাস্তি কি শান্তি" নাটক

তাঁহার "শাস্তি কি শান্তি" নামক নাটক সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। যে বৎসর তিনি "বলিদান" লেখেন, সেই বৎসরই লর্ড কার্জন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের বলিদান হয় এবং তাহার ফলে রাজনৈতিক গগনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে গিরিশচন্দ্রকে দিয়া "সিরাজদ্দৌলা" এবং পরবৎসর "মীরকাশিম" নাটক লেখান হয়।

"সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাশিম" নাটক

এই দুইখানি নাটক বিশেষতঃ "সিরাজদ্দৌলা" লিখিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় ইতিহাস তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বিস্তর গবেষণা করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং নাটক দুইখানি যে প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বলিতে কি, নাটকীয় গুণ অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে যে সকল দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক গান ও বক্তৃতা ছিল, সেইগুলিই তাহাদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ গিরিশচন্দ্র 'ঐতিহাসিক নাটক' নাম দিয়া কোন উত্তেজনাপূর্ণ "মেলোড্রামা" সৃষ্টির পক্ষপাতী একেবারেই ছিলেন না। তৎকালে এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমরা আজকাল নাটক লিখিনা কেবল দর্শকদের হাততালি পাইবার জন্য কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দি।" কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমাত্মক নাটকসমূহের হীন-অনুকরণে লিখিত যে সকল নাটক আমাদের

রঙ্গভূমিকে রাজনৈতিক তুবড়িবাজির আসরে পরিণত করিয়াছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়।

এমারেল্ড থিয়েটার হইতে গিরিশচন্দ্র স্টারে আসিবার অব্যবহিত পূর্বে স্টারে "সরলা" নামক গার্হস্থ্য নাটকখানি খুব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। রসরাজ অমৃতলাল ডাক্তার তারক গাঙ্গুলী প্রণীত "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের প্রথমাংশ নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া তাহার এই নাম দেন। এই নাটকের সাফল্য দর্শনে উৎসাহিত হইয়া স্টারের কর্তৃপক্ষগণ ঐরূপ আর একখানি গার্হস্থ্য নাটক অভিনয়ের জন্য ব্যগ্র হন এবং গিরিশচন্দ্র স্টারে আসিলে তাঁহাকে ঐরূপ নাটক লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র তদনুসারে "প্রফুল্ল" নাটক লেখেন। ইহাই হইল তাঁহার প্রথম পারিবারিক বা সামাজিক নাটক। এই নাটকখানির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৯ সনে। "সরলা"র ন্যায়ই তৎকালের এক বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কাহিনী লইয়া এই নাটক রচিত হয়। সে সময়ে আধুনিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে রোমান্টিক নাটক লিখিবার উপাদান খুব বেশী পাওয়া যাইত না। পণপ্রথা, ভায়ে ভায়ে বা যা এ যা'এ ঝগড়া করিয়া ঘর ভাঙ্গা, মদ বা বেশ্যার কুহকে পড়িয়া স্ত্রীপরিবারকে পথের ভিখারী করা, জ্ঞাতিবিরোধ, গ্রাম্য দলাদলি, জমিদারের অত্যাচার প্রভৃতি দুই চারিটি ব্যাপার মাঝে মাঝে বাঙালার নিস্তরঙ্গ গার্হস্থ্যজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করিলেও তাহা সাধারণতঃ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিত না যে তাহা উচ্চশ্রেণীর নাটকের বিষয়ীভূত হইতে পারে। এই জন্য গম্ভীর-প্রকৃতির সামাজিক নাটক সেকালে অধিক লিখিত হয় নাই। কিন্তু অস্বাভাবিক 'রোমান্স' সৃষ্টি না করিয়াও যে সাধারণ বাঙালীর পারিবারিক জীবন লইয়া জনপ্রিয় ভাল নাটক লেখা যাইতে পারে তাহা "সরলা" প্রমাণ করিয়াছিল। বাঙালা দর্শকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই নাটকের অভিনয় দর্শন

"সরলা" নাটক

গিরিশচন্দ্রের প্রথম পারিবারিক নাটক "প্রফুল্ল"

করিয়াছিল, কারণ ইহার মধ্যে তাহারা তাহাদেরই ঘরের একটি বিষাদময় চিত্র দেখিতে পাইয়াছিল। যে ঘটনা তাহাদের বা তাহাদের প্রতিবেশীর গৃহে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে যাহার দুঃখময় ফলের ভাগী তাহাদিগকে হইতে হয় তাহারই একটি জীবন্ত ছবি দেখিয়া তাহাদের প্রাণে স্বভাবতই সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"প্রফুল্ল"তেও এইরূপ এক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার পশ্চাতে আছে আর একটি বৃহত্তর কল্পনা এবং তাহাতেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে নাটকটিকে 'বস্তুতান্ত্রিক' বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টি আমাদের সমাজের মূলে আঘাত করিয়া কিরূপভাবে আমাদের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে এই নাটকে পরোক্ষভাবে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। আমাদের সমাজ ও পরিবার যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, পাশ্চাত্য সমাজ ও পরিবারের ভিত্তি হইতে তাহা বিভিন্ন। আমরা Socialistic—সমাজতন্ত্রী, আর পাশ্চাত্যেরা Individualistic—অহংবাদী। আমরা সমাজের হিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া শ্রেষ্ঠধর্ম মনে করি, কিন্তু পাশ্চাত্যেরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে খুব বড় করিয়া দেখে। পাশ্চাত্যদের ধর্ম-পুস্তক বাইবেলের উপদেশ এই যে, "বিবাহ হইলেই মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুরক্ত হওয়া স্বামীর কর্তব্য।" কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্র নবপরিণীতা বধূকে বলে—"শ্বশুরকুলে আসিয়া সম্রাজ্ঞী হও" অর্থাৎ তাহার ভার গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ কর। আমাদের সমাজ বিভিন্ন পরিবারের সমবায়ে গঠিত এবং প্রত্যেক পরিবার সমাজ-বিধান দ্বারা অনুশাসিত, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সকল পরিবারই স্ব স্ব প্রধান। বলিতে গেলে ওখানে সমাজ বলিয়া কোন পদার্থ নাই—আছে

"প্রফুল্ল" নাটকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য

পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের প্রভেদ

কেবল "রাষ্ট্র" এবং উহারা তাহার বিধান অর্থাৎ আইনকে ধর্মের উপরে স্থান দান করে। সমাজ ও পরিবারের বন্ধনরজ্জু—প্রেম, আর রাষ্ট্রের বন্ধনরজ্জু—আইন। আইনের বন্ধন শিথিল হইলে যেমন রাষ্ট্র থাকেনা, তেমনই প্রেমের বল হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সমাজ ও পরিবার টেঁকেনা। অহংবাদ প্রেমের পরিপন্থী—সুতরাং অহংবাদ প্রবল হইলে আমাদের সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার উপর যদি সমাজপতি নিজেই দুর্বল হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয় না। "প্রফুল্ল" নাটকে গিরিশচন্দ্র রমেশকে এই অহংবাদের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে "উকীল" করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে চিকিৎসক অধ্যাপক লেখক শিল্পী সবই ছিল, ছিলনা কেবল আইনব্যবসায়ী উকীল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আইন ও আদালতের সঙ্গে এই 'চিজ'টিকেও আমদানী করিয়াছেন। এই সকল আইন সাধারণতঃ নির্মম, হৃদয়হীন—তাহাদের সঙ্গে দয়ামায়া স্নেহ ভক্তি কৃতজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই, এমন কি জনকজননী বৃদ্ধ বা অক্ষম হইলেও উপযুক্ত পুত্র তাঁহাদিগকে একমুষ্টি অন্ন দান করিতে আইনমত বাধ্য নয়! সুতরাং ঐ সকল "কোমল" বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গেলে আইনব্যবসায়ী উকীলের ব্যবসায় চলেনা। স্বার্থই তাহার সর্বস্ব—আপন গণ্ডা সে ষোল আনা বুঝিয়া লইতে চায়—আইনের ফাঁকিতে যদি সে আরও কিছু বেশী পায় তাহা হইলে সে তাহাও ছাড়ে না। দায়াদমাত্রকেই সে শত্রু মনে করে, সুতরাং তাহার মতে আশৈশব ভাগীদার ভাইয়ের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর থাকিতে পারেনা। একদিকে এইরূপ প্রেমহীন চরম অহংবাদী রমেশ, অন্যদিকে কর্মক্লান্ত স্নায়বিকদৌর্বল্যগ্রস্ত বিকৃতমস্তিষ্ক কর্তা যোগেশ। ফলে অচিরেই "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"—সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। এ অবস্থায় সংসারকে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র আত্মত্যাগী প্রেম—ইহাই ছিল গিরিশচন্দ্রের মত। সেইজন্য তিনি রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লকে সেইরূপ প্রেমের প্রতীকরূপে

গড়িয়াছেন—কারণ কর্তারা পশ্চিম হইতে আমদানী বিষ খাইয়া উন্মত্ত হইলেও গৃহিণীদের প্রাণ এখনও প্রেম-ভক্তিশূন্য হয় নাই, তাহাদের হৃদয়ের সুবর্ণপেটিকায় এখনও পুরাতন আদর্শ সযত্নে রক্ষিত আছে। তাই শেষে মমতাময়ী প্রফুল্ল নিজ জীবন দান করিয়া তাহার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল—ফলে বৃক্ষটি রক্ষা না পাইলেও তাহার বীজ রক্ষা পাইল—ভবিষ্যতে "সাজান বাগান" পুনরায় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিল। মরিবার সময় প্রফুল্ল তাহার স্বার্থান্ধ পিশাচ স্বামীকে যে কথা বলিয়া গেল, তাহাই এই নাটকের সার কথা--"দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'রব না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা সংসারে কারুকে কখন আপনার করনি।" বস্তুতঃ আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লর আত্মবিসর্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেই জন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন "প্রফুল্ল"। কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখানই যদি তাহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত—কাহিনীটিকে এতদূর টানিয়া আনিবার সার্থকতা থাকিত না। অধিকন্তু 'ব শরক্ষা'র জন্য পাগল মদনঘোষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত। নাটকমধ্যে কেবল হাস্যরসাদি সৃষ্টির জন্য কোন অবান্তর চরিত্রকে একটা স্থান দেওয়া যে গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

"প্রফুল্ল"র পরেই গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় গার্হস্থ্য নাটক "হারানিধি" এবং তাহার পর তাঁহার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক "চণ্ড" অভিনীত হয়। এই দুইখানি নাটকেও প্রেমের জয় কীর্তিত হইয়াছে। "হারানিধি"তে মোহিনী রমেশের স্থান ও হরিশ যোগেশের স্থান অধিকার করিয়াছে। মোহিনী তাহার চির-উপকারী বন্ধু হরিশের সুখের সংসারে আগুন দিতে চাহিয়াছিল, অনেকটা কৃতকার্য্যও

"হারানিধি" গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় গার্হস্থ্য নাটক

হইয়াছিল। তথাপি যখন মোহিনী কর্তৃক নির্যাতিতা কাদম্বিনী হীন উপায়ে মোহিনীর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, তখন হরিশের পুত্র নবকুমার তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, কারণ হিংসাকে নিবৃত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় প্রতিহিংসা নয়—প্রেম। সৌভাগ্যক্রমে মোহিনী রমেশের ন্যায় একেবারে পিশাচ হইয়া যায় নাই—ধনগর্ব তাহাকে আত্মম্ভরি ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের কোমলতাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই। রমেশের কোন সন্তান ছিল না. কিন্তু মোহিনীর হেমাঙ্গিনী নামে এক কন্যা ছিল এবং তাহার প্রতি মোহিনীর স্নেহ ছিল অসীম। সেই স্নেহই অবশেষে তাহার মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছিল—এমন কি শেষে সেই স্নেহের অনুরোধে হরিশের পুত্র নবকুমারকে কন্যাসহ তাহার সর্বস্ব দান করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। হরিশের জামাতা অঘোর এই নাটকের আর একটি প্রধান চরিত্র। সে গুণবান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্র তাহাকে গৃহত্যাগী ও বিপথগামী করিয়াছিল এবং তাহার ফলে সে চুরি জুয়াচুরিতে পরিপক্ক হইয়াছিল। এই কারণে নাট্যকার তাহাকে "হারানিধি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মোহিনীও এইরূপ একটি "হারানিধি"। মোহিনীকে যেমন উদ্ধার করিয়াছিল তাহার কন্যার প্রতি স্নেহ, অঘোরকে তেমনই উদ্ধার করিয়াছিল তাহার সাধ্বী পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেমের আকর্ষণ। বাস্তবিক পতিতোদ্ধার করিতে হইলে প্রেমবলই যে শ্রেষ্ঠ বল তাহাতে সন্দেহ নাই।

"চণ্ড" নাটক

"চণ্ড" নাটকখানি "আনন্দ রহো"র ন্যায়ই চিতোরের এক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু নাটক হিসাবে ইহার স্থান "আনন্দ রহো" হইতে অনেক উচ্চে। পাপের রাজ্য সমূলে লোপ করিতে হইলে যে নিষ্পাপ ও নিষ্কাম প্রেমিকের রক্তদানের প্রয়োজন হয় তাহা এই নাটকেও দেখান হইয়াছে। যখন রাঠোরাধিপতি পাপিষ্ঠ রণমল্লের অত্যাচারে জর্জরিত চিতোরের প্রজারা সংসারত্যাগী চিতোর-রাজকুমার

মহাত্মা রঘুদেবজীর নিকট আসিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিল, তখন রঘুদেবজী তাহাদিগকে বলিলেন,—

"যবে অত্যাচারপূর্ণ ধরা,—ধর্মরক্ষা হেতু সাধুজন
শোণিত প্রদানে হরে ধরণীর তাপ !
সেই রক্তস্রোতে হয় অত্যাচারী নাশ—
সুখের আবাস পুনঃ হয় এ মেদিনী।"

ইহার পর রণমল্লপ্রেরিত ঘাতকেরা উপস্থিত হইলে তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফল হইতে বিলম্ব হইল না—অচিরে সমস্ত দেশ রাজকুমার চণ্ডের পরিচালনায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া তাহাকে সংহার করিল এবং রঘুদেবের জয়-ধ্বনি ও তাঁহার সমাধিমন্দিরের উপর পুষ্পবর্ষণের সহিত নাটকের যবনিকাপাত হইল।

"মলিনা বিকাশ" নাটক

"চণ্ডে"র পর গিরিশচন্দ্র "মলিনা বিকাশ" নামে একটি প্রেমমূলক গীতিনাট্য ও কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে "মহাপূজা" নামে একটি ক্ষুদ্র রূপক রচনা করেন। ইহার পর স্টার থিয়েটার তাঁহার সহিত সহসা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। যাহা হউক, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নবনির্মিত "মিনার্ভা" থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। যেখানে ভূতপূর্ব "গ্রেট ন্যাশান্যাল" থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ছিল, সেখানে এই থিয়েটার বাটীটি নির্মিত হয় এবং গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অনূদিত সেক্সপিয়ারের "ম্যাকবেথ" নাটক লইয়া ইহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

"ম্যাকবেথ" নাটক

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র অনুবাদের যে শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব। তাঁহার এ কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে, কিন্তু তিনি এ পথে আর যান নাই। কেন যান নাই তাহা তাঁহার "নাট্যকার" নামক প্রবন্ধ পড়িলে বেশ বুঝা যায়।

তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "ভিন্ন দেশে ভিন্নমস্তিষ্কপ্রসূত নাটক ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়।...সকল বস্তুই দেশকাল-পাত্রোপযোগী। সেইহেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না।...এই জন্য যিনি নাটক লিখিবেন তাঁহাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে।" এই কারণে তিনি পুনরায় তাঁহার পুরাতন ধারাই ধরিয়াছিলেন এবং ম্যাকবেথের পর মিনার্ভায় তাঁহার "মুকুল মুঞ্জরা," "আবুহোসেন," "জনা," "করমেতি-বাঈ" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক নাটিকা অভিনীত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনখানি নাটক--"মুকুলমুঞ্জরা," "জনা" ও "আবুহোসেন"--সকল দিক দিয়াই বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বত্বাধিকারীর অমিতব্যয়িতানিবন্ধন তাঁহার সহিত গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ওদিকে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ নাট্যকার অভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে বিদায় দিবার পর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক লইয়া তাঁহারা থিয়েটার চালাইতেছিলেন, কিন্তু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ পরলোক গমন করিলে, তাঁহারা অবশেষে বাধ্য হইয়া পুনরায় গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। গিরিশচন্দ্রও মিনার্ভাথিয়েটার ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আবার স্টার থিয়েটারে আসিলেন, এবং এখানে ১৮৯৬ সনে তাঁহার "কালাপাহাড়" ও পর বৎসর তাঁহার "মায়াবসান" অভিনীত হইল। এই দুইখানি নাটকই গভীর ও উচ্চ ভাবৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। উচ্চশিক্ষিত ও দার্শনিক মনের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শ লইয়া অহরহঃ যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহার একটা উজ্জ্বল চিত্র আমরা এই সকল নাটকে দেখিতে পাই, এবং সেই সঙ্গে পরমহংস-দেবের সংস্পর্শে গিরিশচন্দ্রের চিত্ত কতটা উচ্চস্তরে গিয়া পৌছাইয়া-

"মুকুল মুঞ্জরা", "আবুহোসেন", "জনা" ও "করমেতিবাঈ" নাটক

"কালাপাহাড়" ও "মায়াবসান" নাটক

ছিল তাহার পরিচয় পাই। বিশ্বজনীন নিষ্কাম প্রেম, আত্মত্যাগ ও নারায়ণজ্ঞানে জনসেবাই যে চরম শান্তিলাভের প্রকৃষ্টপন্থা তাহা গিরিশচন্দ্র নানাস্থানে নানাভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "ভ্রান্তি" নাটকে রঙ্গলাল গিরিশচন্দ্রের এই সার্বজনীন প্রেমতত্ত্ব খুব স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে —"আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ; যাঁর সেবা ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যাঁর সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি, সে দেবতার পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।"

যাহা হউক, এবারেও গিরিশচন্দ্র স্টারে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। "মায়াবসানে"র পরেই তিনি সেখানকার মায়া ত্যাগ করিলেন এবং "ক্ল্যাসিক" থিয়েটারে যোগদান করিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটারটি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গিরিশচন্দ্রের "দেলদার" ও "পাণ্ডব গৌরব" অভিনীত হইল। "পাণ্ডব গৌরব" রচনাকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার দ্রুত রচনা-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় দেন। গদ্য পদ্য ও বহুচরিত্র সংবলিত অত বড় পঞ্চাঙ্ক নাটক তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আবার মিনার্ভা থিয়েটারে ফিরিয়া আসেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন এবং "মণিহরণ" নামক গীতিনাট্য লেখেন। কিন্তু থিয়েটারের নূতন স্বত্বাধিকারী থিয়েটার চালাইতে অপারক হওয়াতে তিনি ক্ল্যাসিকে প্রত্যাগমন করিয়া "মনের মতন," "ভ্রান্তি," "সৎনাম" প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তাহার পর আবার মিনার্ভায় ফিরিয়া গিয়া তিনি "হরগৌরী," "বলিদান," "বাসর," "সিরাজদ্দৌলা," "মীরকাশিম," 'ছত্রপতি শিবাজী" প্রভৃতি নাটক লেখেন। ইহার পর ক্ল্যাসিক রঙ্গমঞ্চে নবপ্রতিষ্ঠিত "কোহিনূর" থিয়েটারে কিছু দিনের জন্য গিয়া সেখানে "ছত্রপতি শিবাজী"র

"পাণ্ডব গৌরব" নাটক

"ভ্রান্তি," "সৎনাম" প্রভৃতি নাটক

"ছত্রপতি" নাটক

অভিনয় করান। তাহার পর তিনি মিনার্ভায় পুনরায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার "শাস্তি কি শাস্তি," "শঙ্করাচার্য্য," "অশোক" ও "তপোবল" অভিনীত হয়।

"শঙ্করাচার্য্য," "অশোক" ও "তপোবল" নাটক

ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মোটামুটি ইতিহাস। তিনি বহুসংখ্যক (সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় আশীখানা) নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসনাদি লিখিয়াছিলেন। সেগুলির বিস্তৃত সমালোচনার স্থান ইহা নহে, সে চেষ্টাও আমি করিব না। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয় গিরিশচন্দ্রের নিকট কত ঋণী তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইবে। বড় দুঃসময়ে তিনি আমাদের রঙ্গালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন। বিপথগামী ও স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া যখন ইহা ক্রমশঃ ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তিনি তাঁহার অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার গতি ফিরাইয়া দিয়া ইহাকে কেবল পুনরুজ্জীবিত করেন নাই, পরন্তু ইহাকে এক মহাগৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি যে নাট্যসাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের জাতীয়-সাহিত্য—পরের নিকট হইতে ধার করা জিনিস নহে। আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনা তাহার ভিত্তি। ভগবদ্ভক্তি, বিশ্বপ্রেম, আত্মত্যাগ, নিষ্কামকর্ম, সবভূতে দয়া প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি বা কর্মকে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করি, তাহাদের জয়গানে কেবল তাঁহার পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলি মুখরিত নয়, পরন্তু তাঁহার অনেকগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকেও যে সেই ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা বলিয়াছি। তাঁহার "ছত্রপতি শিবাজী" ইহার একটি উদাহরণ। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, শিবাজী ধর্মকে ভিত্তি করিয়া নিষ্কাম-ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই ওরূপ শক্তি-শালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা

আমাদের রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্রের দান

বিলাসব্যসনে মত্ত হইয়া সে মহান্ আদর্শ ত্যাগ করাতেই সে সাম্রাজ্যের পতন হয়। এইরূপে তিনি সর্বত্র ত্যাগ ও ধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। "সেই সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয়-সাহিত্য যাহা জাতির উচ্চতম চিন্তাসমূহকে রূপদান করে। গিরিশচন্দ্রের নাটক সেই চেষ্টাই করিয়াছে এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সফলতাও অর্জন করিয়াছে। এই জন্যই তিনি 'মহাকবি' নামের যোগ্য।"

গিরিশচন্দ্রের বাঙালী মনোবৃত্তি

"গিরিশচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পূর্ণমাত্রায় বাঙালী কবি ছিলেন। তিনি যখন পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি কৃত্তিবাস কাশীরামের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন—সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের উপর নয়, কারণ তিনি জানিতেন কৃত্তিবাস কাশীরাম বাঙালী দর্শকগণের যেরূপ প্রিয়, ব্যাস বাল্মীকি সেরূপ নন।" বাল্মীকির আদর্শ-মানব রাম কৃত্তিবাসের রামায়ণে পুরাদস্তুর ভক্তবৎসল দেবতা হইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কৃত্তিবাসের বর্তমান সংস্করণে আমরা দেখিতে পাই, যখন রামলক্ষ্মণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অনুরোধে রাম বংশীধারী কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য রামভক্ত হনুমান বিলক্ষণ চটিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী-বিষ্ণুর বাহন গরুড় হঠাৎ কেন যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না, তবে ইহাতে একটা কথা বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবযুগে বাঙালী কানুর প্রেমে এতটা মজিয়াছিল যে, রামায়ণ গান শুনিতে বসিয়াও সে স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া 'কানুর গান' শুনিতে চাহিত। মহাভারতে অবশ্য এতটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই মহাভারতের নায়ক। কিন্তু এখানেও দেখা যায়, বাঙালী কবি ও যাত্রাওয়ালারা কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যশঙ্খধারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের বংশীধর কৃষ্ণের প্রতিই অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রেও সর্বত্র এইভাব দেখা যায়। একটা

দৃষ্টান্ত দিই। তাঁহার 'অভিমন্যুবধে' যখন অভিমন্যু মৃত্যুকালে তাঁহার মাতুল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মানসচক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে মূর্তি কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথির মূর্তি নয়—বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি!—

"মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি?
বাঁকা শিখিপাখা, ত্রিভঙ্গিমঠাম বনমালি!
পীতাম্বর, মধুর অধরে বাঁশী;
বাঁশী, রাধানামে মাতোয়ারা,
রাধা রাধা সদা বলে।"

"জনা"তেও বিদূষক পার্থসখা শ্রীকৃষ্ণকে জোর করিয়া বৃন্দাবনের স-রাধা কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করাইয়াছিলেন!

অবশ্য স্থানকালাদি বিবেচনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনী মূর্তি দেখিবার জন্য গরুড় বা অভিমন্যু বা বিদূষকের এই ব্যগ্রতা বিলক্ষণ বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কবি করিবেন কি? এদেশের দর্শকেরা যে তাঁহাকে ঐ মূর্তিতেই দেখিতে চায়! বলিয়াছি, সেক্সপিয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ্র সকল শ্রেণীর দর্শকের জন্যই নাটক লিখিতেন—তাঁহার দৃষ্টি কেবল শিক্ষিত দর্শকদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকিতনা, অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিতদিগকেও তিনি তাঁহার সৃষ্ট আনন্দের অংশীদার করিতে চাহিতেন। আমরা জানি, তিনি যখন তাঁহার কোন নাটকের মহলা দিতেন, তখন নাট্যালয়ের স্বত্বাধিকারী হইতে পটপরিবর্তক 'শিফ্‌টার' পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া বসিতেন এবং পণ্ডিতমূর্খনির্বিশেষে প্রত্যেককে নাটকসম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে কেহ বিস্মিত হইলে তাহাকে বলিতেন, "আমি শুধু পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের জন্য নাটক লিখি না—লিখি সকলের জন্য। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আনন্দদান নাটকের উদ্দেশ্য।

সকল শ্রেণীর দর্শকের উপভোগ্য করিয়া নাটক লিখিতে গিরিশচন্দ্রের চেষ্টা

সুতরাং পণ্ডিতের ন্যায় মূর্খেরও নাটকখানি কেমন লাগিল তাহা জানা দরকার।" কেবল মত জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, যদি কেহ বলিত কোন বিশেষ স্থান তাহার ভাল লাগে নাই, তাহা হইলে তিনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন এবং অনেক সময় সে দৃশ্য বদলাইয়া ফেলিতেন। এমন কি, "সিরাজদ্দৌলা"র মত নাটকের মহলা দিবার সময়েও এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নাটকখানি প্রধানতঃ রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত দর্শকগণের জন্য লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং এ নাটকটির সম্বন্ধে সকলকার মতামত লইবার প্রয়োজন ছিলনা, তথাপি তাহার প্রথম অঙ্ক পাঠের পর তিনি তাঁহার প্রথামত প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শুনলে?" প্রায় সকলেই বলিল, "বেশ হোয়েছে।" কিন্তু দুই একজন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রথম দৃশ্যটি অপর দৃশ্যগুলির তুলনায় যেন একটু হাল্কা বোলে বোধ হোল।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বুঝেছি, কিছু হয়নি।" ইহার পর সেই দৃশ্যের পরিবর্তে আর এক দৃশ্য তিনি বসাইলেন, কিন্তু তাহাও সকলের মনঃপূত হইল না। তখন তিনি সেটিকেও ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থানে আর এক দৃশ্য লিখিলেন। এবার সকলে বলিল, "চমৎকার হোয়েছে।" ফলে বইখানা প্রথম দৃশ্য হইতেই জমিয়া গিয়াছিল। পঁচিশবৎসর কাল নাট্যক্ষেত্রে একাধিপত্য করিবার পরও যিনি তাঁহার নাটক বাহির করিবার পূর্বে তরুণ শিক্ষার্থীর ন্যায় এইরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তিনি কত বড় সাধক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাঁহার অসামান্য সিদ্ধিলাভের কারণও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। মানবজীবন ও সমাজই যে নাটকের প্রধান ভিত্তি এবং এই দুই বিষয়ে আমাদের ও পাশ্চাত্যদের দৃষ্টিভঙ্গি যে একরূপ নহে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং বিলাতী সমালোচকের নিকট হইতে ধারকরা চশমা লইয়া গিরিশচন্দ্রের ন্যায় আমাদের কোন জাতীয়-নাট্যকারের

নাটকের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে যাওয়া ভুল। তথাপি বলা যাইতে পারে, গিরিশচন্দ্র সেরূপ পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার জাতীয়তা হারান নাই। দেশীয় বিষয়বস্তু লইয়া এবং দেশীয় ভাব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য কলাকৌশল কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় তাহা তিনি বেশ জানিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলির কথা বলা যাইতে পারে। এই সকল রসপ্রধান নাটক রচনায় ঘটনা-প্রধান নাটক রচনার কলাকৌশল প্রয়োগ করা দুরূহ, কারণ ঘটনা-প্রবাহের দিক দৃষ্টি রাখিতে গেলে রসবিকাশের পক্ষে বাধা পড়িতে পারে। কিন্তু এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এ সকল নাটকে কি ঘটনা সংস্থান, কি চরিত্রের বিকাশ, কি নাটকীয় ক্রিয়ার গতি—সকল বিষয়েই তিনি নাট্যশিল্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, অথচ কোথাও রসের ব্যত্যয় হইতে দেন নাই। এইরূপে তিনি অনেক যাত্রার নাটককে পূর্ণভাবে বর্তমান কালের নাটকে পরিণত করিয়াছেন। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সকল নাটকের অভিনয় উপভোগ করিতে পারে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনে ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণেও তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তিনি এ বিষয়েও যে পাশ্চাত্যভূমির শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের সহিত সমান আসন দাবী করিতে পারেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার নাটকগুলিকে চরিত্রপ্রধান নাটক বলা যায়। আমরা জানি, নাটক-রচনাকালে বাহ্য ঘটনা অপেক্ষা মানসিক দ্বন্দ্বের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রের বিকাশ প্রদর্শনের প্রতিই তাঁহার অধিকতর লক্ষ্য থাকিত। এইরূপে চিরপরিচিত বহু পুরাতন চরিত্রও তাঁহার নিপুণ-হস্তের গুণে উজ্জ্বলতর নূতন রূপ ধারণ করিয়া দর্শকের আনন্দ বর্ধন করিয়াছে। আর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রের স্ফুরণ বা পরিবর্তন দেখাইতে যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাহা অতি কঠোর সমালোচকও

অস্বীকার করিতে পারেন না। হাস্যরসসৃষ্টিতেও তাঁহার এই অসাধারণত্ব দেখা যায়—তিনি গাম্ভীর্যের সহিত হাস্যরসের যেরূপ চমৎকার মিলন ঘটাইয়াছেন সেরূপ অল্প লেখকই দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিদূষকাদি চরিত্র অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাহার পর তাঁহার ভাষা। সর্ববিধ চরিত্রোপযোগী ভাষা প্রয়োগে তিনি কিরূপ নিপুণ ছিলেন তাহা তাঁহার অঙ্কিত কয়েকটি বিভিন্ন চরিত্রের ভাষা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তাঁহার নাটকের প্রত্যেক চরিত্রই তাহার নিজ শিক্ষা, অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কথা বলে, এবং ভাব যতই জটিল হউক না কেন, সে নিজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করে। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা শুনিলেই বুঝা যায় সে কোন শ্রেণীর লোক বা কিরূপ তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও স্বভাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "চৈতন্যলীলা" নাটকের জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের ভাষা ও কথা বলিবার ভঙ্গি হইতেই বুঝা যায় তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক। কেবল তাহাই নহে—জগাই ও মাধাইয়ের চরিত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে—জগাই যে মাধাই অপেক্ষা অধিকতর ভাবপ্রবণ—তাহাও তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ সকল বিষয়ে তিনি কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহা একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে। একদিন এক যুবক তাহার স্বরচিত একখানি নাটক তাঁহাকে দেখাইবার জন্য লইয়া আসিল। নাটকখানি "বেহুলা" উপাখ্যান লইয়া লিখিত। তিনি নাট্যকারকে নাটকের দুইচারিটি স্থান পড়িতে বলিলেন। যুবক লখিন্দরের মৃত্যুর পরের দৃশ্যটি পড়িলেন—লখিন্দরের মাতা সনকা আসিয়া কাঁদিলেন ও তাহার পর চাঁদ সদাগর কাঁদিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "এইবার চাঁদের নাম কাটিয়া সনকা বসাও এবং সনকার নাম কাটিয়া চাঁদ বসাইয়া দেখ কোন প্রভেদ বুঝিতে পার কিনা।" যুবক উভয়ের উক্তিতে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে

গিরিশচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য।

পাইল না। তখন গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "দেখ, তুমি জান, পুত্রশোকে কখন মাতা ও পিতা একভাবে কাঁদেনা—বিশেষতঃ যখন সনকা ও চাঁদ সদাগরের মত মাতা ও পিতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হয়। বিভিন্ন চরিত্রের ও শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় কথা কয়। এদিকে যার দৃষ্টি না থাকে তার নাটকলেখা বিড়ম্বনা।" এ বিড়ম্বনা যে গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকে দৃষ্ট হইবেনা তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

নাটকে গানের ন্যায় পদ্যের ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কারণ হৃদয়ের গভীর ভাব সকল পদ্যে কিংবা কাব্যাত্মক গদ্যে প্রকাশিত হইলে সেগুলি অধিকতর শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কিন্তু মিত্রাক্ষর কবিতায় ভাবের জোর অনেকটা কমিয়া যায়। মিত্রাক্ষরে আমরা কথা কহি না, সুতরাং মিত্রাক্ষরে যে ভাব প্রকাশ করা যায় তাহা কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় এবং কৃত্রিম ভাব সহজে মর্মস্পর্শ করিতে পারে না। অতএব স্থানবিশেষে কাব্যে ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন হইলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ছন্দোময় গদ্য ব্যবহার করাই সমীচীন। বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয় উপলক্ষ্যে এই বিষয়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত মাইকেল মধুসূদনের একদিন তর্ক হয় এবং তাহারই ফলে মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দও কৃত্রিমতার নিগড় পূর্ণভাবে ভাঙ্গিতে পারে নাই। তাহার প্রতি পংক্তি চৌদ্দ-অক্ষর বিশিষ্ট হওয়াতে, তাহা অভিনয়-কালে আবৃত্তি করার পক্ষে অসুবিধাকর ছিল, সেই জন্য গিরিশচন্দ্র যখন "মেঘনাদ বধ" অভিনয় করেন, তখন তিনি সেই সকল দীর্ঘ পংক্তি ভাঙ্গিয়া কেবল যতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলি আবৃত্তি করা সুবিধাজনক ও স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি নাটকে এইরূপ ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী হন। এই নূতন

"গৈরিশী ছন্দ"

ছন্দ এক্ষণে "গৈরিশী ছন্দ" নামে পরিচিত। গিরিশচন্দ্র যে এ ছন্দের উদ্ভাবক নহেন বা রঙ্গালয়ে ইহার প্রবর্তক নহেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু ইহার বহুল প্রচলন তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই চন্দ প্রবর্তিত হওয়াতে নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক সকলের পক্ষেই সুবিধা হইয়াছে, কারণ এ ছন্দে নাটক লেখা যেমন সহজ, আবৃত্তি করাও তেমনই সহজ এবং দর্শকেরাও ইহা সহজে বুঝিতে পারে।

গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

গীত-রচনা বিষয়ে গিবিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় ছিল সঙ্গীতরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার - মধুর সঙ্গীতধারা তথা হইতে স্বতঃই নির্গত হইত—সেজন্য তাঁহাকে কোনরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতনা। তিনি অতি দ্রুত রচনা করিতেন, অথচ তাঁহার কোন গানে ভাব বা রসেব অভাব লক্ষিত হইতনা। অধিকন্তু তাঁহার প্রত্যেক গান দৃশ্য ও চবিত্রেব উপযোগী হইত। অনেক নাট্যকারকে দেখা যায় তাঁহারা কেবল দর্শকগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদের নাটকে গান দিয়া থাকেন এবং সেজন্য অনেক সময় তাঁহারা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করার আবশ্যক মনে করেন না-- এমন কি, সময়ে সময়ে কেবল গান দিবার জন্য তাঁহারা অবান্তর দৃশ্য সংযোজন করিতেও কুণ্ঠিত হননা। কিন্তু এরূপ অপ্রাসঙ্গিক গান রচনা করা গিরিশচন্দ্রের রীতিবিরুদ্ধ ছিল। নাটকের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া তিনি তাঁহার গানগুলি রচনা করিতেন এবং যাহাতে প্রত্যেক গানের ভাষা গায়কের শিক্ষা, অবস্থা ও চরিত্রের উপযোগী হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "শঙ্করাচার্য্য" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে চণ্ডাল-চণ্ডালাদের গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দৃশ্যে চণ্ডালবেশী মহাদেব স্বদলে গঙ্গাস্নানার্থী শঙ্করের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ান—উদ্দেশ্য, শঙ্করের অদ্বৈত-জ্ঞানের পরীক্ষা। চণ্ডাল-চণ্ডালীরা আসিয়াই সুরাপানোন্মত্ত ভাবে গান ধরিল,—

"ভরপূর নেশা কেন কর্‌বি ফিকে,
এটা সেটা দুটো ফিকে দেখে।
মজা তো মজা আর ফিকে বেলকুল,
পূরা মজা লিয়ে থাক্‌না মজগুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্‌নে জুল্‌জুল্‌;
আপ্‌না মজাতে দেল্‌ পূরা রেখে
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফিকে॥"

সুরাপানেবিভোর চণ্ডালের ভাষায় অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মানন্দানুভূতির এই ব্যাখ্যান বস্তুতঃই অপূর্ব। এইরূপ বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য রাখিয়া গান বচনা করিতে গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়না। উপর্যুক্ত গানের ভাষার সহিত "মায়াবসান" নাটকে রঙ্গিণীর শেষ গানের ও "করমেতিবাঈ" নাটকে ফকিরদের ভজন-গানের ভাষার তুলনা করিলেই এ সত্য প্রতীয়মান হইবে। এ উভয় গানেই নির্বাণ-মুক্তির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। রঙ্গিণীর গানটি এই—

"মেদিনী মিশিল তরল সলিলে, তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল বিপুল ব্যোমচারী।
নীরব রব শূন্য শরীরে, শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে মায়াকায়াহারী।"

ফকিরদের গানে ইহার ভাষা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে দেখুন,—

"সূরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাঁহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া মন কাঁহা তোমারা।
আসমান সে আসমান মিলায়া— ছায়া—ছায়া—ছায়া।
কাঁহা ফিন আসমান মিলায়া পাত্তা কুছ্‌ নেই পায়া।
সম্‌জো তব্‌ যব্‌ সমজ্‌ আওরে ভাই
কুছ্‌ নেই কুছ্‌ নেই কেয়া—

দেল্ না বোলে বাৎ না চলে সমজ্ কোই কুছ্ লিয়া,
ফাঁক হ্যায় সব কুছ্. ভর্তি সব কুছ্—পূরা— পূরা—পূরা।"

আবার যখন কবি অদ্বৈতবাদীর মহাশূন্য হইতে কৃষ্ণপ্রেমের মধুময় রাজ্যে নামিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার লেখনীমুখে কি সুধা ক্ষরিয়াছে দেখুন—

"এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে গো বাঁশরী।
সুখে শুকসারী মুখোমুখি করি.
হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠ লো কিশোরী।"

এই কয় পংক্তিতে সমস্ত বৃন্দাবনের চিত্র কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভক্তমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয়, গিরিশচন্দ্রের সকল গান আলোচনা কবিবার স্থান এখানে নাই, কিন্তু যাঁহারা এই সকল গান শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে কি ভাষাবৈচিত্র্যে, কি রস-মাধুর্য্যে, কি ভাবৈশ্বর্য্যে সকল বিষয়েই সেগুলি আমাদের সঙ্গীত-সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক বুঝিবার জন্য তাঁহার ধর্মমত ও দার্শনিক মতের সহিত পরিচয় আবশ্যক

গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে তাঁহার দার্শনিক মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—এমন কি, কোন কোন নাটক সেই সকল মত প্রতিষ্ঠার জন্যই লিখিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই জন্য তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত পরিচয় না থাকিলে তাঁহার সকল নাটক বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। সুতরাং এস্থানে সে সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। পূর্বে বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শৈশবকাল হইতে বৈষ্ণব আবেষ্টনের মধ্যে

পরিবর্ধিত হইযাছিলেন, তাহাব উপব স্বভাবতঃ তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। ফলে তাঁহাব মধ্যে ভক্তিভাব বিশেষরূপেই পুষ্টিলাভ কবিযাছিল এবং কিশোবকাল হইতে যাত্রা কথকতাদি শ্রবণ এই ভাববৃদ্ধিব পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা কবিয়াছিল। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানাদি অনুশীলনেব ফলে তিনি অজ্ঞেয়বাদী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন এবং ধর্ম "সংসাবরক্ষার্থ কল্পনা" ভিন্ন আর কিছুই নয় এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাব মনে জন্মায। সুখের বিষয়, এই নাস্তিকভাবের মূল খুব দৃঢ় ছিল না। কচুরীপানাব মত ইহা তাহাব হৃদয়েব অন্তস্থলে প্রবাহিত ভক্তিবসধারাব উপব একটা আববণ সৃষ্টি কবিলেও যে তাহার বিলোপ সাধন কবিতে পারে নাই তাহা তাহাব এই সময়ে লিখিত পৌরাণিক নাটকগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তাহাব পব যখন তিনি "চৈতন্যলীলা" লিখিবাব উদ্দেশ্যে চৈতন্যচবিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহাব অন্তবস্থ সেই চিবন্তন ভক্তিরসেব উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তিনি আবেগভবে গাহিলেন,—

"কাঁহা মেবা বৃন্দাবন কাঁহা যশোদামায়ী।
কাহা মেবা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই।
কাঁহা মেবি ধবলা শ্যামলী,
কাঁহা মেবি মোহন মবলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাহা মে পাই ?
কাঁহা মেরি যমুনাতট,
কাঁহা মোর বংশীবট,
কাঁহা গোপনাবী মেরি, কাঁহা হামাবা বাই।"

এ গান তাঁহার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল নিশ্চযই, কারণ তাঁহাব এই আকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার দ্বাবে টানিয়া আনিয়াছিল এবং সেই মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহাব বিজাতীয়শিক্ষাসঞ্জাত সকল জ্ঞানাভিমান—সকল তর্ক—সকল—অবিশ্বাস দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা তিনি নিজে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—"মন তখন আনন্দে পবিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বব সত্য—ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমাব অনায়াস-সাধ্য। এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিনযামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব—পরম সাহস—পরম আত্মীয় পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোন ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের ফলে গিরিশ-চন্দ্রের নবজীবনলাভ

শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর গিরিশচন্দ্র সর্বতোভাবে তাঁহার গুরুর পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাব "শঙ্করাচার্য্য" নাটকের শঙ্করশিষ্য শান্তিরামের ন্যায় তিনি পবমহংস-দেবকে বলিয়াছিলেন, "যা কোরতে হয়—সে আপনি করুন। সাধন কোরে তো মন বশ কোর্তে বলেন? সে আমার কর্ম নয়। আমি চোখ বুজে মন স্থির কোর্তে নির্জনে বোস্লেই মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্লেই অম্নি সৃষ্টি-সংসাব ঘুরতে চোল্লো। এ মন নিয়ে কি সাধন কোর্বো বলুন? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে,—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কোরলেম, যা করবার—কোরবেন।" তাঁহার গুরুভক্তি ও বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা দেখিয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সাধন ভজনের প্রয়োজন নাই—সে ভার রহিল আমার উপর। তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত আছ তাহাই করিয়া যাও, তাহাতেই তোমার ও সংসারের মঙ্গল হইবে।" ফলে পরমহংসদেবের বিবেকানন্দস্বামীপ্রমুখ সন্ন্যাসী-শিষ্যেরা যখন ধর্ম-প্রচারকরূপে তাঁহাদের গুরূপদিষ্ট বেদান্তবাণী দেশবিদেশে প্রচার

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং দেশের সর্বত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ঠাকুরের উপদেশমত জনসেবায় ব্রতী হইলেন, গিরিশচন্দ্র তখন তাঁহার নাটকাবলীর ভিতর দিয়া ঠাকুরের কথামৃত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শুনাইতে লাগিলেন।

সর্বধর্ম-সমন্বয়

উপরিউক্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবার পর গিরিশচন্দ্রের ধর্ম ও দার্শনিক মত যে সম্পূর্ণভাবে পরমহংসদেব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং পরমহংসদেবের মত আলোচনা করিলেই আমরা গিরিশচন্দ্রের দার্শানিক মতের পূর্ণ পরিচয় পাইব। পরমহংসদেব স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সকল ধর্মের সত্যতাও স্বীকাব করিতেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের আচার্য্য। তিনি বলিতেন, "যত মত তত পথ"। ইহা অবশ্য গীতোক্ত মতেরই প্রতিধ্বনি। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্,
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

গীতোক্ত ধর্ম সমন্বয়াত্মক

বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন। ...... এ সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে—অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানেব পরিমাণমাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দন সিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দূর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান সম্বন্ধে দুইজনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। ...... তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য আর একজনের অগ্রাহ্য—ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে?

...... তবে ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক—কেন না কর্মের ফলদাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। ...... যে উপাসনা কপট ... তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না তিনি অন্তর্যামী।" উপাসক যতই অজ্ঞ হউক এবং তাহার উপাসনাপদ্ধতি যতই অপকৃষ্ট হউক, তাহার উপাসনা যদি আন্তরিক ও ঐকান্তিক হয় তাহা হইলে অন্তর্যামী ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে তাহার প্রার্থিত ফল প্রদান করেন—একথা পরমহংসদেবও বলিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরোক্ষ, কারণ তিনি স্বয়ং সর্ববিধ সাধনা করিয়া এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর সাধকদের আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হয় না—কিছু সাংসারিক উন্নতি, কিছু ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয় এবং তাহার ফলে তাহাদের উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য পরমহংসদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন,—"যাহা পাইয়াছ তাহাতেই তুষ্ট থাকিও না—এগিয়ে যাও, আরও বেশী পাইবে।" বেদান্ত বলেন, ঘটমধ্যস্থ আকাশ ও বাহিরের মহাকাশ যেমন একই পদার্থ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও তেমনই স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। জীব ব্রহ্মেরই অংশ, সে ব্রহ্ম-অগ্নি হইতে নির্গত একটি বিস্ফুলিঙ্গ—ব্রহ্ম-সিন্ধুর একটি বিন্দু। আমরা কেবল অবিদ্যা

মুক্তির অর্থ কি ?

বা মোহবশতঃ আমাদের আত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করি। এই মোহ টুটিলেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। ইহারই নাম মুক্তি বা মোক্ষ—ইহাই "নিঃশ্রেয়স" অর্থাৎ চরম শ্রেয় ( Summum Bonum )। সে ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম যাহা মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মত্ব উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে এই নিঃশ্রেয়সের পথে চালিত করে এবং অবশেষে তথায় নীত করে।

এই ব্রহ্মত্ব লাভের উপায় কি ? মানুষ ব্রহ্মের "স-রূপ" কিরূপে হইতে পারে ? বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম "সৎ-চিৎ-আনন্দ" স্বরূপ—

তিনি "অস্তি-ভাতি-প্রিয়"—অর্থাৎ তিনি নিত্য বিদ্যমান, স্বপ্রকাশ ও অনন্তপ্রীতির-নির্ঝর রসস্বরূপ। তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন। জীব ব্রহ্মেরই প্রতিচ্ছবি—সুতরাং তাহার মধ্যেও এই সচ্চিদানন্দভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা আছে অব্যক্তভাবে।

'ব্রহ্ম-সারূপ্য'লাভের উপায়

জীবকে ব্রহ্মের "সারূপ্য"লাভ করিতে হইলে এই অব্যক্তভাবকে সুব্যক্ত করিতে হইবে—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়া প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিন প্রকার সাধনার প্রয়োজন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কর্মযোগের দ্বারা সৎভাবের, জ্ঞানযোগের দ্বারা চিৎভাবের ও ভক্তিযোগের দ্বারা আনন্দভাবের বিকাশ সাধিত হয়। সুতরাং সারূপ্যসিদ্ধি-লাভ করিতে হইলে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনমার্গের কোন মার্গকেই বাদ দেওয়া চলেনা।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি—পরস্পরের অনুপূরক

অবশ্য গোঁড়া কর্মবাদীরা কর্মমার্গকে, গোঁড়া জ্ঞানবাদীরা জ্ঞানমার্গকে এবং গোঁড়া ভক্তিবাদীরা ভক্তিমার্গকে মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরমহংসদেব এরূপ গোঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না। গীতায় ভগবান দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই তিন মার্গ বাস্তবিক পরস্পরের বিরোধী নয়—পরন্তু ইহারা পরস্পরের অনুপূরক। নিষ্কামকর্ম-সাধনার ফলে জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক হইলে তাহা ভক্তিতে পরিণত হয়। তবে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে কিরূপ সাধনা শ্রেয়, তাহা তাহার "স্বধর্ম" অর্থাৎ তাহার নিজ প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির ধারার উপর নির্ভর করে। স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাতে কখন সুফল লাভ হয় না। ভগবান অর্জুনকে সেই উপদেশই দিয়াছিলেন। পরমহংসদেবও নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে প্রতীক-উপাসনারূপ নিম্নস্তরের সাধনাই শ্রেয় বলিয়া উপদেশ দিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, এরূপ সাধনায়

সিদ্ধিলাভের পর উচ্চতর সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা চরমমুক্তি সুদূরপরাহত হইবে।

অদ্বৈতবাদের সর্বপ্রধান আচার্য্য শঙ্করও এই মত পোষণ করিতেন। তিনি নির্গুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও সগুণ উপাসনা বিফল বলিতেন না। তিনিও নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে প্রতীক-উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রতীক-উপাসনার অর্থ কোন কিছু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-উপাসনা,—যেমন প্রতিমায় ব্রহ্ম বোধ, শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবোধ, লিঙ্গমূর্ত্তিতে শিববোধ করিয়া উপাসনা। এইরূপ উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ চিত্ত প্রসার লাভ করিয়া উন্নততর উপাসনার উপযুক্ত হয়। এইজন্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী হইয়াও ভক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন না। এমন কি, তিনি তাঁহার "বিবেকচূড়ামণি" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"— মোক্ষের কারণনিচয়ের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে ভক্তি শব্দ ব্যবহার করি তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার মতে, যে 'ভজ্' ধাতু হইতে ভজন, ভক্তি প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে— "তদাকারে আকারিত হওয়া"। অতএব ভজন শব্দের অর্থ— আত্মতত্ত্বানুসন্ধান এবং যে বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের বৃত্তিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতা বোধ জন্মে সেই বৃত্তিই ভক্তি। সুতরাং ভক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের চরম অবস্থা। চিত্তের ধর্মই এই যে, যখন সে যাহার ভাবনা করে, তখন সে তদাকারে আকারিত হয়। সুতরাং ভাবনার বস্তু যত বৃহৎ হয়, চিত্তও সেই পরিমাণে প্রশস্ত হয়। নিজের ক্ষুদ্র গৃহকোণের চিন্তা ছাড়িয়া সমগ্র দেশের কথা ভাবিলে—ক্ষুদ্র জলাশয়ের পরিবর্তে মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিলে— যে চিত্তের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপে সাধক যখন সর্বময় ঈশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হন, তখন তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ সর্বব্যাপী হইয়া যায়—ক্ষুদ্র 'অহম্' প্রসার লাভ

শঙ্করের জ্ঞানবাদ ভক্তিবাদের বিরোধী নয়

করিয়া বিরাট 'অহম্'এ পরিণত হয়। এ অবস্থাতেই হয় ভক্তির সার্থকতা। ইতালির মহাকবি দান্তে তাঁহার Divina Commediaতে এই অবস্থাকে বলিয়াছেন—"The perfect conformity of our will with the will of God"—ইহাই তাঁহার মতে সর্বোচ্চ স্বর্গ। এ অবস্থায় ভগবান ও ভক্ত এক হইয়া যান—ভক্ত প্রত্যেক জীবে আপনাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহার ফলে বিশ্বের সকলেই তাঁহার আত্মীয় হইয়া পড়ে—বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। আমরা আমাদের নিজ আত্মাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—"পুত্র পরিবার প্রিয়বস্তু যা আছে সংসারে, প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে" (শঙ্করাচার্য্য নাটক ৩।৪)। সুতরাং যখন ভক্তের আত্মা বিশ্বাত্মার সহিত এক হইয়া যায় তখন তাঁহার আর কিছুই অপ্রিয় থাকে না—ঘৃণা দ্বেষ হিংসাদি সমস্ত তিরোহিত হইয়া তাঁহার হৃদয় হইয়া যায় অবিমিশ্র প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

সাযুজ্য মুক্তি

জীব ও ব্রহ্মের এই চরম মিলনের নাম "সাযুজ্য" বা "নির্বাণ" মুক্তি। এ মহামিলনে বিরহ দুঃখ মান অভিমান বিচ্ছেদাশঙ্কা প্রভৃতি কিছুই থাকে না—থাকে কেবল আনন্দ—অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ—উপনিষদ যাহাকে বলেন "ভূমানন্দ"। এই আনন্দধাম জ্ঞান-লোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, সুতরাং এ লোকে পৌঁছাইতে হইলে জ্ঞান-লোক অতিক্রম করিতে হয়। যে অবিদ্যামায়া জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখে তাহাকে দূরীভূত করিতে বিদ্যামায়ার সাহায্য আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে হইলে বিদ্যাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ বিদ্যাভিমানও অভিমান—জ্ঞানের অহঙ্কারও অহঙ্কার—এবং অহংজ্ঞানের লেশ থাকিতে সে অত্যুচ্চ আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার থাকে না। প্রত্যুত বিদ্যা অবিদ্যার মতই একটা

বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া

শৃঙ্খল—"স্বর্ণ-লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি—বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ—উভয়ই বন্ধন" (শঙ্করাচার্য্য নাটক ৫।৯)। এই জন্য পরমহংসদেব

বলিতেন, লোকে যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে এবং তাহার পর দুইটা কাঁটাই ফেলিয়া দেয়, তেমনই অবিদ্যামায়াকে বিদ্যামায়া দ্বারা দূরীভূত করিয়া বিদ্যামায়াকেও ত্যাগ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "স্বপ্নের ফুল" নাটকে এই তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার "শঙ্করাচার্য্য" নাটকে মহামায়ার "প'রলে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না" শীর্ষক গানটিতেও এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য যেমন আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয়, তেমনই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিষ্কাম কর্মসাধন আবশ্যক হয়। কেবল গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। পরমহংসদেব বলিতেন "কাঠে আগুন আছে শোনা এক, আর কাঠ জ্বেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক জিনিষ।" তিনি তাঁহার সকল জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করিয়াছিলেন, অপরকেও সেই উপদেশ দিতেন। এই কারণে তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান স্বরূপ সকল জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপভাবে সেবা দয়াপ্রণোদিত জীবসেবা অপেক্ষা উচ্চতর ভিত্তিতে অবস্থিত ও অধিকতর ফলদায়ক, কারণ দয়ার মধ্যে যে অহঙ্কার লুক্কায়িত থাকে তাহা পরিশেষে চিত্তশুদ্ধির পথে একটা বিষম বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ভক্তিভাবে পরসেবার ফলে আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা ক্রমে প্রশস্ততর হইতে থাকে, যে স্থূল আবরণ বিশ্বাত্মা হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অবশেষে অন্তর্হিত হয়—ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। পূর্বে "মায়াবসান" নাটক হইতে রঙ্গিণীর যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আত্মার এই প্রগতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই গানের ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কালীকিঙ্করের কথা এই—"তোমায় এতদিন

নিষ্কাম কর্ম-সাধনা জ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়

উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ কোরেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বোল্‌তেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম, নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফলকামনা ছাড়ে না। সুখ আশায় পরহিত কোরেছি, ধর্ম উপার্জন কোর্‌তে পরহিত কোরেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত কোরেছি—ফল কামনায় পরহিত কোরেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি—জগতের সঙ্গে মিশ্‌লেম।" এই ভাবে আত্মোৎসর্গের ফলে আত্মার ক্ষয় হয় না—বরং তাহার প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, কারণ আত্মাকে "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"।

"শূন্যতা" পূর্ণতারই নামান্তর মাত্র

এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে আত্মা অবশেষে মহাশূন্যে মিশিয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্থ আত্মার লয়প্রাপ্তি নয়, পূর্ণতাপ্রাপ্তি। ইহাই বুঝাইবার জন্য "করমেতি-বাঈ" নাটকে ফকিরেরা তাঁহাদের গানের শেষ পংক্তিতে বলিয়াছেন,—

"ফাঁকা হ্যায় সব কুছ্, ভর্ত্তি সব কুছ্—পূরা - পূরা—পূরা।"

মিস্টিক-সাধক টলার (Tauler) সাহেব এই "পূর্ণ-শূন্যে"র নাম দিয়াছেন "Rich Naught"—মহাঢ্য শূন্য।

গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকেই যে এই নিঃস্বার্থ প্রেম, নিষ্কাম জনসেবা ও পরহিতে আত্মবলিদানের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ

তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে পরমহংসদেবের কৃপায় বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা আমরা তাঁহার শঙ্করাচার্য্য নাটক পড়িলে বুঝিতে পারি। আমি ঐ নাটক হইতে দুই এক স্থান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শঙ্কর তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য সনন্দন (পদ্মপাদ)কে বলিতেছেন,—

বৎস, স্থির চিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্ক যুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে—

তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্কবুদ্ধিনাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।

* * * * * *

নির্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্য মূর্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।

সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈত পন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর। বৎস। অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহাবাক্যত্রয়ে—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য স্বপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি এই সার জ্ঞান।
এই মহাসত্যের আভাস
যে মূহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।

* * * * * *

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্ক যুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়, এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু। ব্রহ্ম অস্তি, স্বপ্রকাশ, প্রিয়বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈতবোধ, অদ্বৈত কিরূপে ?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু জ্ঞানে ?

শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হোতে প্রিয় আর .ক আছে আমার ?

পুত্র পরিবার—প্রিয়বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রবে,
প্রিয়-জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্মসনে।
এই প্রিয়-জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্।
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং ভাব অহং বর্জনে।
মনোবুদ্ধি অহংকার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে।
সাধনসাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জন,
সাধন নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস গ্রহণ।
সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানার্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার ?
* * * * * *
শঙ্কর। দেহধারী মাত্রে বৎস মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদসৎ কার্য্য দ্বিপ্রকার।
অসৎ কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে।"

( শঙ্করাচার্য্য নাটক, ৩।৪ )

কিন্তু কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, তাহা কেবল জ্ঞানলাভের সহায়—একথা গিরিশচন্দ্র কর্মকাণ্ডের প্রধান সমর্থক স্বয়ং কুমারিল ভট্টের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"জ্ঞানলাভে কর্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল, মুক্তিপ্রদ কর্ম কভু নহে।"

( শঙ্করাচার্য্য নাটক, ২।৫ )

উপরে বলিয়াছি, শঙ্করাচার্য্য নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে প্রতীক-পূজার সমীচীনতা স্বীকার করিতেন। গিরিশচন্দ্রের শঙ্করও তাহাই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উচ্চ-অধিকারী শিষ্য সনন্দনকে "বিমল অদ্বৈত পন্থা" সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও অপেক্ষাকৃত নিম্ন-অধিকারী শান্তিরামকে দেবদেবা পূজার প্রয়োজনীয়তার কথাই বুঝাইয়াছেন—

প্রতীকপূজা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত

যত দিন দেহ-বুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যত দিন দেহ-বুদ্ধি বয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহ-বুদ্ধি লয়।

* * * * * *

মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর;
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয়জ্ঞান,
ধ্যানমুগ্ধ অহর্নিশি রহে,
ইষ্টমূর্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি।
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।

* * * * * *
* * * * * *

দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।

* * * * * *

সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পত্নীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি-প্রভেদে—প্রিয় যে সম্বন্ধ যার,
সেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।

( শঙ্করাচার্য্য নাটক, ৫।২ )

এইরূপে জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ শিক্ষা দীক্ষা প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের সহিত পিতা, মাতা, দয়িত, সর্বময় প্রভু প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। ইঁহারা নির্বাণ-মুক্তির অভিলাষী নন—"সামীপ্য" ও "সালোক্য" মুক্তিকেই তাঁহারা নিঃশ্রেয়স বলিয়া মনে করেন—অর্থাৎ একলোকে ভগবানের সমীপে তাঁহার প্রিয় পরিজন ও চিরসহচর রূপে বাস করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন। এই ভাবে বিভোর হইয়াই ভক্তিবাদী সাধকেরা গাহিয়া থাকেন, "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।" চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন, "সাযুজ্য-মুক্ত"রা সিদ্ধলোকে বাস করেন—এই লোক বৈকুণ্ঠের বাহিরে—সুতরাং এরূপ মুক্তরা প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত হন। নির্গুণ-নিরাকার উপাসক বাসুদেব সার্বভৌমের হৃদয় সতত প্রেমরসলেশহীন জ্ঞানচর্চার ফলে একেবারে শুষ্ক পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছিল, চৈতন্যদেব সগুণ সাকার উপাসনার প্রেমানন্দপূর্ণ মাধুর্য্য কীর্তন করিয়া সেই মরুভূমিতে কেমন করিয়া প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহা গিরিশচন্দ্র তাহার "নিমাই-সন্ন্যাস" নাটকে দেখাইয়াছেন। সর্বরসাধার প্রেমময়ের লীলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বলিতেছেন,—

সামীপ্য ও সালোক্য মুক্তি

বিশ্বাধার উৎপত্তি কারণ,
যাহাতে স্থাপন লয়—সেই ইচ্ছাময়
বহুরূপে হইলা প্রকাশ,
তাঁরে তুমি বল নিরাকার?

*  *  *  *  *  *

দেখ দেখ—সাকার ঈশ্বর,
বিভু পরাৎপর—
জ্ঞান-গর্ব কর দূর।
ত্যজ অভিমান, কর প্রেমপূর্ণ প্রাণ,
অনায়াসে দেখিবে গোলোকলীলা।

( নিমাই সন্ন্যাস, ৪।৫ )

গিরিশচন্দ্রের গুরুদক্ষিণা

এইরূপে গিরিশচন্দ্র অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সগুণ ও নির্গুণবাদ, সাকার ও নিরাকারবাদ, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিবাদ, শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণববাদ প্রভৃতি সকল প্রকার দার্শনিক মত ও ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "সকল ধর্মমতই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটিই মুক্তিপথের সহায়"—এ শিক্ষা তিনি তাঁহার মহান্ গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তিনি নাটকের ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব সাধারণের নিকট প্রচার করেন। "সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবাই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান"—পরমহংসদেবের এই দ্বিতীয় উপদেশও তিনি তাঁহার বহু নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের হৃদয়মধ্যে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি কেবল তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেবের আশীর্বাদভাজন হন নাই, পরন্তু দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল নাটক এইরূপে বহুল পরিমাণে উপদেশাত্মক হইলেও গিরিশচন্দ্রের লেখার গুণে ইহাদের নাটকত্বের বিশেষ হানি হয় নাই।

## সপ্তম অধ্যায়

### গিরিশোত্তর যুগ

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নাট্যকারগণের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয়—রসরাজ অমৃতলাল বসুর। ইনিও গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রথমে নট, পরে নাট্যকার হন। বাগবাজারের যে দল "ন্যাশান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করেন, অমৃতলাল ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্টকর্মী ও অভিনেতা। বয়সে তিনি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা নয় বৎসরের ছোট ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পূর্ব হইতেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রথম নাটক "হীরকচূর্ণ" রচিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। "হীরকচূর্ণ" নাটক বা নাটিকাটি সে সময়কার একটি উত্তেজনাজনক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। বরোদার তাৎকালিক গায়কোয়াড় মলহার রাও হীরকচূর্ণ খাওয়াইয়া তথাকার রেসিডেন্টের প্রাণনাশের চেষ্টা করাতে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। ইহাই ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু। বলিয়াছি, সে সময়ে ভাল নাটকের অভাবে রঙ্গালয়গুলি এইরূপ 'হুজুগে নাটক' অভিনয় করিয়া তাহাদের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। গায়কোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সে সময়ে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সেই ঘটনা অবলম্বনে একাধিক নাটক লিখিত হইয়াছিল। প্রথম "গায়কোয়াড়-নাটক" লিখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানতঃ ইহারই উদ্যোগে "ন্যাশান্যাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক নীলদর্পণের 'ড্রেস রিহার্সাল' ইহারই বাটীতে হয় এবং ইনিই ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ইনি একজন ভাল অভিনেতাও ছিলেন এবং নীলদর্পণ নাটকের নায়ক নবীনমাধবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম নাটক "মালতীমাধব" ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত

রসরাজ অমৃতলাল

হয়। ইঁহার "গুইকোয়ার" বা গায়কোয়াড়-নাটক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে সময়ে অবশ্য আদি ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। অমৃতলালের "হীরকচূর্ণ" নাটকও সেই বৎসর গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হয়। ইহার পর তিনি যে চারিখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লেখেন, তন্মধ্যে ১৮৮১ সনে রচিত "তিলতর্পণ" নাটকের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। "বিবাহ বিভ্রাট" তাঁহার ষষ্ঠ নাটক। এই বিখ্যাত প্রহসনটি ১৮৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং তাহার ফলে হাস্যরসাত্মক নাট্যকাররূপে অমৃতলালের অতুল খ্যাতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

অমৃতলাল ষোল সতের খানি প্রহসনজাতীয় নাটক লিখিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকাংশই সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই "রসরাজ" ছিলেন এবং যে রসধারা তিনি পরিবেষণ করিয়াছিলেন তাহা বহুবৎসর ধরিয়া আমাদের রঙ্গালয়সমূহকে হাস্যমুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী হাস্যরসিক নাট্যকার দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। দীনবন্ধু কেবল নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেশের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা ছিল অতুলনীয়। তাহার উপর ছিল, তাঁহার "প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি"। তিনি তাঁহার নাটকগুলিতে এই দুই গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন অবিকল সেইরূপ আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার নিমচাঁদ, নদেরচাঁদ, রাজীব প্রভৃতি বাস্তবজগতের লোক ছিল—জীবন্ত আদর্শ হইতে এই সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু অমৃতলালের প্রহসনোক্ত চরিত্রগুলি অল্পাধিক পরিমাণে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত চিত্র। তিনি জীবিত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ছবি আঁকিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের দোষ-

দীনবন্ধুর সহিত অমৃতলালের পার্থক্য

সমূহ সাধারণসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে ফলও হইত। এই সকল নাটক দর্শকগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বিবাহ বিভ্রাট, খাসদখল প্রভৃতির জনপ্রিয়তা এখনও সমভাবে বর্তমান আছে। এই সকল প্রহসন ভিন্ন তিনি তরুবালা, বিজয় বসন্ত, আদর্শ বন্ধু, নবযৌবন ও যাজ্ঞসেনী নামে পাঁচখানি নাটক লিখিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও রাজসিংহ নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। এ সকল নাটকেও তাঁহার নাট্যপ্রতিভার—বিশেষতঃ নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি ও রসাত্মকবাক্য রচনা শক্তির—যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সমকালে বা তাহার কিছু পরে যে সকল নাট্যকার রঙ্গালয়ে যোগদান করেন তাহাদের মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন না বটে, কিন্তু অভিনয় ও নাট্যালয়পরিচালনা সম্বন্ধে ইহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণ নিজে একজন ভাল অভিনেতা ও সেতারবাদক ছিলেন। ইহারা উভয়েই গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং গীতিনাট্য রচনাতেও ইঁহাদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। রাজকৃষ্ণ বয়সে গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা ছোট ও অমৃতলাল অপেক্ষা বড় ছিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক "অনলে বিজলী" ১৮৭৮ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়, সুতরাং নাট্যকার হিসাবে তিনিও অমৃতলালের ন্যায় গিরিশ-চন্দ্রের অগ্রবর্তী ছিলেন। তাহার "হরধনুর্ভঙ্গ" নাটকে যে তিনি গিরিশচন্দ্রের পূর্বে "গৈরিশী ছন্দ" প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" যে সময়ে ভক্তিস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহার "প্রহ্লাদ চরিত্র" ও অতুল-কৃষ্ণের "নন্দবিদায়"ও অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইঁহারা পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক ভিন্ন মুসলমানী গল্প লইয়াও

রাজকৃষ্ণ রায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র

গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলিও সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণের "লয়লামজনু" এবং অতুলকৃষ্ণের "শিরীফরহাদ," "হিন্দাহাফেজ," "তুফানী" ও "লুলিয়া" একসময়ে সহস্র সহস্র দর্শক আকর্ষণ করিয়া রঙ্গালয়কে অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিল। গিবিশচন্দ্রের "আবুহোসেন" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলিবাবা"র ন্যায় এই সকল গীতিনাট্য আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অনেক উৎকৃষ্ট বড় নাটক অপেক্ষাও আয়প্রদ হইয়াছিল। আমাদেব চিরন্তন নৃত্যগীতপ্রিয়তাই বোধ হয় ইহার কাবণ। অতুলকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের ও বমেশচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসও নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর আসিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইহাবা উভয়ে একই বৎসবে (১২৭০ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্যকার রূপে ক্ষীবোদপ্রসাদই প্রথমে খ্যাতি লাভ করেন, সুতরাং তাঁহাব কথাই প্রথমে বলিব। ক্ষীবোদ-প্রসাদ অসামান্য নাট্যপ্রতিভার অধিকারী হইলেও রঙ্গালয়ে তাঁহাব প্রবেশলাভ সহজ হয় নাই। যখন তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি "জেনাবাল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউশান" (বর্তমান "স্কটিশ চার্চ কলেজ")-এ রসায়ন-বিজ্ঞানেব অধ্যাপনা করিতেন—রঙ্গালয়ের সহিত তখন তাঁহাব কোন সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু সে সময়কার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এরূপ বাহিরের লেখকদেব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না; আর তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরাতন নাট্যকারগণও ঈদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বভাবতঃই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সুতরাং নিতান্ত অভাবগ্রস্ত না হইলে কোন রঙ্গাধ্যক্ষ এই সকল "অব্যবসায়ী" নাট্যকারকে স্থান দিতে চাহিতেন না। যাহা হউক, বহু চেষ্টার পর অবশেষে এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ ক্ষীরোদপ্রসাদের "কুলশয্যা" নাটকটি অভিনয় করিতে স্বীকৃত হন, কারণ সে সময়ে এই থিয়েটারটি শেষ অবস্থায় উপনীত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

হইয়াছিল এবং তাঁহাদের নাটকেরও বিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল। ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত এই নাটকটিই ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম অভিনীত নাটক। চিতোররাজকুমার পৃথ্বীরাজ কর্তৃক বীরবালা তারাবাইয়ের পিতৃরাজ্য-উদ্ধারকাহিনী ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এই নাটক অভিনয়ের কিছুকাল পরে ( ১৮৯৭ সনের এপ্রিল মাসে ) অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "ক্ল্যাসিক থিয়েটার" এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "হরিরাজ"ই ছিল একমাত্র নূতন নাটক। এই নাটকটি সেক্সপিয়ারের "হ্যামলেট" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল এবং সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও থিয়েটারের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, দর্শকাভাবে সময়ে সময়ে রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া আনিয়া থিয়েটার দেখাইতে হইত। এই সঙ্কটকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার নৃত্যগীতবহুল বিখ্যাত "আলিবাবা" নাটকটি সেখানে অভিনয়ার্থ দিলেন এবং ১৮৯৭ সনে ২০শে নভেম্বর তাহা তথায় প্রথম অভিনীত হইল। ফল হইল অদ্ভুত! দেখিতে দেখিতে সেই মুমূর্ষ রঙ্গালয়টি যেন যাদুমন্ত্রবলে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল—তাহার শূন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভরিয়া উথলিয়া পড়িল! বলা বাহুল্য, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও সেই সঙ্গে 'জাতে' উঠিলেন—থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী লেখককে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আরব্য উপন্যাসের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সহিত মনোহর নৃত্যগীতের সংযোগ নাটকখানিকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আলিবাবা, মর্জিনা প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কনে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাও ইহার সাফল্যে কম সাহায্য করে নাই। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। এই নাটকের প্রস্তাবনার গানটি গিরিশচন্দ্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। নাট্যজগতের তৎকালীন নায়কের এই স্পর্শের ফলে আর কিছু না হউক থিয়েটারমহলে নবীন লেখকের

নাটকের 'অস্পৃশ্যতা দোষ' অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এ দান গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। নতুবা গানরচনা করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহার প্রমাণ তিনি তাঁহার সকল নাটকেই দিয়াছেন।

এই নাটক অভিনয়ের কিছুদিন পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ দুর্দশাগ্রস্ত বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক আহূত হইয়া ঐ রঙ্গালয়ের জন্য "প্রমোদরঞ্জন" নামক দার্শনিকভাবপূর্ণ একটি সুন্দর গীতিনাট্য লিখিয়া দেন। এ নাটকটিও যথেষ্ট সফলতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল ও বেঙ্গল থিয়েটারকে উপস্থিত অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহার পর সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের "কুমারী," "বভ্রুবাহন" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল নাটকের সাফল্য দর্শনে প্রায় সকল রঙ্গালয়ই তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে তিনি বেঙ্গল থিয়েটার হইতে মিনার্ভা থিয়েটারে এবং সেখান হইতে ষ্টার থিয়েটারে গমন করেন। তাহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কোহিনূরে, মিনার্ভায় (২য় বার), মনোমোহনে, ম্যাডান কোম্পানির স্থাপিত বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানিতে এবং অবশেষে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। এই রূপে তখনকার সকল থিয়েটারেই তাঁহার নাটক অভিনীত হয় এবং তাঁহার যশ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফুলশয্যা, প্রতাপ-আদিত্য, নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, পদ্মিনী, চাঁদবিবি, রঘুবীর, আলমগীর প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক, সাবিত্রী, বভ্রুবাহন (বা উলূপী), ভীষ্ম, নরনারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক, আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, কুমারী, কিন্নরী, বরুণা, বাসন্তী প্রভৃতি গীতিনাট্য, বেদৌরা, জুলিয়া, পলিন, মিডিয়া, রঞ্জাবতী, বাদশাজাদী প্রভৃতি অন্যান্য নানাজাতীয় নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাটকই বাংলার

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাবলী

নাট্যজগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া বাংলার নাট্যসাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের একটা বিশেষ গৌরবের কথা এই যে তিনি আমাদের নাট্যসাহিত্যের ধারা নানা নূতনপথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্বে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কেবল চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের ন্যায় চিরপরিচিত দুই একটি পালামাত্র রঙ্গালয়ে স্থান পাইয়াছিল।

আমাদের নাট্য-সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের দান—নানা নূতনধারার প্রবর্তন

কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার রঞ্জাবতী নাটকের বিষয়বস্তু "ধর্মমঙ্গল" হইতে গ্রহণ করিয়া দেখাইয়া দেন যে, উপেক্ষিত অন্যান্য প্রাচীন মঙ্গল-গীতিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান বর্তমান আছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধজাতকের গল্প, প্রাচীন রূপকথা প্রভৃতিকেও তিনি বাদ দেন নাই। তাঁহার "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকও এক হিসাবে বাংলার রঙ্গমঞ্চে এক নবযুগ আনিয়াছিল। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে একটা জাতীয়ভাবের বন্যা আসিয়া এদেশের শিক্ষিত সমাজকে প্লাবিত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে কতকগুলি জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটক লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ রাজপুতানার—বিশেষতঃ চিতোরের—ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানা কারণে এই জাতীয়ভাব পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া তরুণ বঙ্গকে স্বাধীনতালাভের জন্য আকুল করিয়া তোলে। বাংলার যুবকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়া শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং বাঙালী যে হীন দুর্বল নয়, পরন্তু একসময়ে তাহারা সফলতার সহিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে মারাঠারা এইভাবে প্রণোদিত হইয়া তাহাদের দেশে "শিবাজী-উৎসব" প্রচলিত করিয়াছিল।

বঙ্গদেশেও সেইরূপ উৎসব প্রবর্তন করিবার জন্য আমাদেব নেতৃবর্গের অনেকে ব্যাকুল হইলেন। এতদিন তাঁহাবা রাজপুতানা হইতে "জাতীয়-বীব" আমদানা কবিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন এবং মারাঠাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কিছুদিন পূর্বে শিবাজী-উৎসবও এখানে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তাঁহারা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তিলাভ করিতে পাবিলেন না। তাঁহারা বাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর ন্যায় স্বদেশেব স্বাধীনতাব জন্য যুদ্ধ কবিযাছেন একপ একজন বঙ্গবীবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিবাজীর পরিবর্তে তাঁহার নামে জাতীয়-উৎসব প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন এবং যশোরেব প্রতাপাদিত্যকে একপ জাতীয়-বীরকপে নির্বাচিত কবিয়া "প্রতাপ-আদিত্য" নাটক লিখিলেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল স্টাব থিয়েটারে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে (জন্মাষ্টমীর রাত্রে) এবং তাহা প্রথম রজনী হইতেই একপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, বঙ্গালয়ে দুই তিন শত অতিবিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও প্রতি রজনীতে শত শত দর্শককে স্থানাভাবে ফিরিতে হইত। বস্তুতঃ ইহাব পূর্বে একপ জনতা স্টাব থিয়েটারে আর কখন দেখা যায় নাই। ক্ষীবোদপ্রসাদের নাটক-রচনার বৈশিষ্ট্যও এই নাটকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি তাহাব পূর্বগামীদেব ন্যায় কোন অবান্তর প্রেমকাহিনী আনিয়া এই জাতীয়-নাটকের আখ্যানভাগকে বিকৃত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভাষার উপর তাঁহার যে অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও তিনি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন—নাটকটি ভাষার সৌন্দর্যে ও ভাবসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। তাঁহার তৃতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকের "বিজয়া" চরিত্রে। এই চরিত্র সৃষ্টি করিয়া

বাংলার নাট্যালয়ে বাংলার নিজস্ব বীরের আবির্ভাব

"প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের বৈশিষ্ট্য

তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জাতীয়-স্বাধীনতা কেবল বুদ্ধি ও বাহুবলে অর্জন করা যায় না, পরন্তু সেজন্য ধর্মবল ও আধ্যাত্মিক শক্তিরও প্রয়োজন হয়। প্রথম অঙ্কেই তিনি অনাচারীর প্রতীক বাজপক্ষীর নিধনদৃশ্যে এই সত্যটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সঙ্গে নিক্ষিপ্ত তিনটি শরাঘাতে বাজপক্ষীটি নিহত হইয়াছিল। বুদ্ধিবলের প্রতীক শঙ্করের শর তাহার মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছিল, বাহুবলের প্রতীক প্রতাপের শর তাহার পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মর্মভেদ করিয়াছিল ধর্মবল ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক বিজয়ার শর। বিজয়া সেই "ত্রিধাবিভক্ত বিহঙ্গম"কে প্রতাপের "বিজয়পতাকার চিহ্ন" স্বরূপ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত বিজয়লাভ করিতে হইলে প্রতাপকে বুদ্ধিবল, বাহুবল ও ধর্মবল এই ত্রিবিধ বলেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই দৃশ্যে মধ্যে সমগ্র "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকের মূলভিত্তি নিহিত আছে—এ দৃশ্যের মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে নাটকটির প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বুঝা যাইবে না। নাট্যকার দেখাইয়াছেন, প্রধানতঃ প্রতাপের ইষ্টদেবী যশোরেশ্বরীর শক্তিরূপিণী বিজয়ার সাহায্যেই প্রতাপ তাহার সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি মোহান্ধ হইয়া তাঁহার ধর্মপ্রাণ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া বসিলেন, সেই মুহূর্তেই যশোরেশ্বরী তাঁহার প্রতি বাম হইয়া মুখ ফিরাইলেন—আর তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে অত বড় সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় অন্তর্হিত হইল!

"প্রতাপ-আদিত্য" নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মগত ছিল। তিনি এক তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পূর্বপুরুষের অলৌকিক শক্তি-সম্বন্ধে নানা গল্প শুনা যায়। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে থিয়োসফিকাল সোসাইটির সদস্য ও "অলৌকিক রহস্য" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ফলে অদৃশ্য দৈবশক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল এবং তাহা তাঁহার অনেক নাটকেই

ছায়াপাত করিয়াছে। যাঁহারা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসবান নহেন তাঁহারা অবশ্য নাটকের এই সকল অংশ তাঁহার দৌর্বল্যের পরিচয় বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এদেশের অধিকাংশ লোক এখনও পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক বা দৈব শক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই। সুতরাং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করার অপরাধে ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয়তা যে শীঘ্র হ্রাস পাইবে তাহা মনে হয় না। বিশেষতঃ সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা জনগণের এই চিরন্তন বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবে বলিয়া বোধ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আমাদের নবজীবনের উষালোক দেখা দেয়, তখন আমাদের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটকগুলি জনসাধারণের সুপ্তপ্রাণ জাগাইয়া তুলিতে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল একরূপ বোধ হয় আর কিছুতে করে নাই। "প্রতাপ-আদিত্য" নাটক ছিল সেই সকল নাটকের অগ্রদূত। এই নাটক দেশপ্রেমের যে প্রবল বন্যা এদেশে আনিয়াছিল তাহাই যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে আমাদের চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বলিয়াছি, এই নাটকটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে জন্মাষ্টমীর রাত্রে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর পরে ঠিক সেই ১৫ই আগষ্ট তারিখে—"প্রতাপ-আদিত্যে"র শুভজন্মদিনে—আমাদের স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে! ব্যাপারটিকে অবশ্য "কাকতালীয়" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু আমার বিশ্বাস অনেকেই এই ঘটনার মধ্যে কোন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখিতে পাইবেন।

আধ্যাত্মিক শক্তি অদৃশ্য হইলেও উপেক্ষণীয় নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার নাটকের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বগামী নাট্যকারদের মধ্যে যাঁহারা সমাজ-সংস্কার-কল্পে নাটক লিখিয়াছিলেন তাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরের কয়েকটি

সমাজ-সংস্কারক ক্ষীরোদপ্রসাদ।

কুপ্রথার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। বহুবিবাহ-পণপ্রথাদি-নিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন প্রভৃতি তাহাদের নাটকের বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এরূপ খণ্ডশঃ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, যে অট্টালিকার ভিত্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে তাহার উপরতলার দুই এক স্থানে দাগরাজি করিয়া তাহাকে রক্ষা করা যায় না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, স্বার্থান্ধ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া তথাকথিত হীনজাতি শূদ্রগণকে এতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলেই আমাদের সমাজের আজ এত দৌর্বল্য ও দুর্দশা। সমাজের শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা-বাদাদি সর্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকলকে সমান অধিকার দিতে হইবে। ইহার ফলে অন্যান্য সামাজিক দোষ আপনা আপনি দূরীভূত হইবে, [illegible] ইহাই [illegible] মতাচার, [illegible] ক্ষীরোদপ্রসাদ এক [illegible] দিয়াছেন তাঁহার "কুমারী" নাটকে। এই নাটকটি রচিত হইয়াছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য, সে সময় [illegible] হরিজন আন্দোলনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতার ভাষায় ছুৎমার্গীদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ফলোদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর সে সময়ে রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকগণের মনোভাব এরূপ সাম্যবাদমূলক বিষয়ের বিরোধীই ছিল। সুতরাং এমন অবস্থায় ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটক লিখিয়া দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি নিজে অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়াও এরূপ ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের বংশ ব্রাহ্মণের গুরুবংশ, তাঁহার সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ পিতা সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি নিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন

'কুমারী' নাটক ও তাহার বৈশিষ্ট্য

বটে, কিন্তু তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পৈতৃক ধর্মে যথেষ্ট আস্থাবান্ ছিলেন। তথাপি তিনি ব্রাহ্মণশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যে হিন্দু-শাস্ত্র প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া প্রচার করে, তাহা কখন কোন মানুষের প্রতি ঘৃণা সমর্থন করিতে পারে না। সেইজন্য তিনি "কুমারী" নাটকের "প্রস্তাবনা" গীতে আমাদিগকে উপবেব আবরণের দিকে না চাহিয়া ভিতরের মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়াছেন। যিনি তাহা করেন তিনি নিজের ও সকলের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকেই নিজ আত্মীয়রূপে অনুভব করেন এবং এইরূপে সকল জাত্যভিমান দূর হইয়া গেলে প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হয়। গানটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কারণ ইহা হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদের মতের সহিত তাঁহার গীত-রচনারও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাইবে :—

অস্পৃশ্যতাবাদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

"আসা দু'দিনের তরে।
য'দিন থাক, সুখে থাক, কেন রও মরমে ম'রে।
জীবন এমন সাধের ধন,
সাধ ক'রে তায় বাঁধন দিয়ে কেন হে পীড়ন,
খুলে তার দাও হে দুনয়ন ;
ঘুচে যাক্ চোখের নেশা
মিশে যাক্ আলোক আঁধারে।
আপনারে দেখুক্ চিনুক্ সে
ক্ষুদ্র ঘরের ঘেরাব ভিতর বিরাট পুরুষ কে,
দেখুক্ সে দুহাত তুলে,
তুল্‌তে কোলে কে তার দুয়ারে ;
দূরে যাক্ যত অভিমান,
মিলে যাক্ তোমায় আমায় সমানে সমান,
গগনে ছুটুক্ প্রেমের গান,—
ভেসে যাক্ ভাবের লহর মলয় সমীরে।"

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার এই সাম্যবাদী মতের বিশেষ সমর্থন পাইয়াছিলেন তন্ত্রশাস্ত্র হইতে। তন্ত্রে অপাপবিদ্ধা কুমারীকে আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রতিমূর্তিরূপে পূজা করিবার বিধি আছে। কিন্তু এই "কুমারী"-নির্বাচনে জাতি-বিচার দূরে থাক্, অনেক সময়ে নিম্নতম শ্রেণী হইতে নির্বাচন করাই শ্রেয়স্কর মনে করা হয়, কারণ বিলাস ও ঐশ্বর্য্য-মধ্যে লালিতা উচ্চজাতীয়া তরুণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মলচিত্তা নিরভিমানা কুমারী মেলা একান্ত দুর্ঘট বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে অনেক তান্ত্রিক সাধক চণ্ডালাদি হীনতম শ্রেণী হইতেও উত্তর-সাধক বা উত্তর-সাধিকা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। সহনশীলতা, অভিমানশূন্যতা, অকপট প্রেম ও ভক্তি, পূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি যে সকল গুণ উত্তর-সাধকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন তাহা তথাকথিত উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয় এই কারণেই পরম বৈষ্ণব সাধক চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ হইয়াও রজকিনী রামীকে উত্তর-সাধিকারূপে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি সেই "কামগন্ধহীনা" প্রেমিকা রজকিনীকে দেবীভাবে পূজা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এইজন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার এই নাটকে এক জ্ঞাননিষ্ঠা ভক্তিমতী ব্রাহ্মণকুমারীকে ও তাহার সখী এবং গুরুভগিনী এক পূতহৃদয়া চণ্ডাল-কুমারীকে ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও উচ্চতর আসনে বসাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। কেবল তাহাই নহে, যে সকল "ব্রাহ্মণ"-নামধারী ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কোন গুণের অধিকারী না হইয়াও কেবল বংশ ও "একগাছি সূতা"র বলে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে—যাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া কতকগুলি প্রাণহীন দেশাচার ও অর্থহীন প্রথার অনুবর্তন করাকেই ধর্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করে—যাহারা মনুষ্যত্বের উপর তথাকথিত "বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব"কে স্থান দান করে তাহারা কতদূর হেয় তাহাও তিনি এই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যে "ব্রাহ্মণ"

অস্পৃশ্যতা-বর্জন জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

ক্রোধ, মোহ ও অহঙ্কারাদি রিপুর অধীন—যে নীচমনা ও স্বার্থপর—তাহার সহিত সাধারণ চণ্ডালের কোন প্রভেদ নাই।

"কুমারী" নাটকের আখ্যানাংশ।

এই নাটকের প্রথমেই দেখি, রাজপুত্র পুরন্দর ও তাঁহার ব্রাহ্মণ সখা সোমস্বামী "মাহেন্দ্রক্ষণে" মৃগয়ায় যাত্রা করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, উহার ফলে রাজপুত্রের "দেবকন্যা"-লাভ হইবে। যাহাতে এই শুভযাত্রাকালে রজক-চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য শূদ্র সম্মুখে আসিয়া কোন অমঙ্গল সৃষ্টি করিতে না পারে, ব্রাহ্মণদের পরামর্শমত রাজা সে ব্যবস্থাও করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যেই নাটকের নায়িকা রজককুমারী অম্বিকা উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এবং পরে আর এক দৃশ্যে স্বয়ং রাজাকে প্রশ্ন করিল, তাহার নারায়ণ-পূজায় অধিকার নাই কেন? সে মন্দিরে নারায়ণ পূজা করিতে গিয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাই এই প্রশ্ন। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা বা তাহার পরামর্শদাতা "শাস্ত্রজ্ঞ" ব্রাহ্মণেরা কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহারা তথাকথিত শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিলেন মাত্র। বাস্তবিক এক্ষেত্রে উত্তর দেওয়াও খুব কঠিন ছিল, কারণ হৃদয়ের মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব হিসাবে এই রজককুমারী কোন ব্রাহ্মণকন্যা বা ক্ষত্রিয়কন্যা অপেক্ষা হীন ছিল না। সুতরাং অবশেষে ব্রাহ্মণদের পরামর্শানুসারে ব্রাহ্মণসেবক রাজা বিদ্রোহিণীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। নির্বাসিতা রজককুমারী তাহার গুরু পতঞ্জলির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলে মৃগয়ারত রাজকুমার দৈবক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ও তাঁহার সখা সোমস্বামী যথাক্রমে রজককুমারী ও তাহার সখী চণ্ডালকুমারী অপরাজিতাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাদের জন্য সকল জাত্যভিমান বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে মহাপুরুষ পতঞ্জলির উপদেশে রাজপুত্র পুরন্দর অম্বিকাকে এবং তাঁহার সখা সোমস্বামী অপরাজিতাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল সমস্যার

সমাধান করিলেন। এই উপলক্ষ্যে পতঞ্জলি পুরন্দর ও সোমস্বামীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এ নাটকের সার কথা. "মা আমার রাজার ঘরে গিয়া বিলাসিনী, ব্রাহ্মণের ঘরে অহঙ্কার গরিবতা অভিমানিনী, কিন্তু নীচ অনার্য্য রজক চণ্ডালের ঘরে মা আমার কার্য্যকরী শক্তি। সে শক্তিকে আশ্রয় কর। তার ঘৃণা কোর না।" সকলের মধ্যেই নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, আত্মবিস্মরণবশতঃ তাহাকে চিনিতে না পারিয়াই আমরা আমাদের মধ্যে নানা বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারই ফলে আমরা আজ এরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি—এই কথাটি ক্ষীরোদপ্রসাদ কেবল এক নাটকে নয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি নাটকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কার্য্যে তাঁহার শাস্ত্রদর্শী পিতার পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং "কুমারী" নাটক তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে যে সকল প্রশ্ন সমগ্র জগৎকে আলোড়িত করিতেছে তন্মধ্যে আর একটি প্রধান প্রশ্ন হইতেছে—'অত্যাচারীর দমনে কোন উপায় শ্রেষ্ঠ—অহিংসা অথবা হিংসাত্মক?'"—ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"হিংসা বনাম "অহিংসা — কোন নীতি শ্রেয়স্কর?

প্রথমে তাঁহার "রঘুবীর" নাটকে, পরে "প্রতাপ আদিত্য" নাটকে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। উভয় নাটকই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ক্ষীরোদপ্রসাদ সকলের অগ্রগামী ছিলেন।

এই উভয় নাটকের নায়কই 'অহিংসা'র ভক্ত হইয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকের নায়ক প্রতাপ শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি জন্মাবধি রাজসিক ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু যৌবনকালে বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দদাসের সংসর্গে আসিয়া তিনি সহসা অহিংস বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিন্তু এরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ পরিবর্ত্তন কখন স্থায়ী হয় না—এ ক্ষেত্রেও তাহা হয় নাই। সে সময়ে মোগলরাজ-

কর্মচারীদের ঘোর অত্যাচারে বাংলার হিন্দু ও পাঠান প্রজারা এরূপ উৎপীড়িত হইতেছিল যে তাহা দেখিয়া প্রতাপের ক্ষাত্র হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না—অচিরে জপের মালা ফেলিয়া তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় অসি পুনরায় তুলিয়া লইলেন। সেই সন্ধিক্ষণে মহাশক্তির সেবিকা কপালিনী বিজয়া আসিয়া তাঁহার সহায় হইলেন। অত্যাচারী-দের সহিত প্রাণান্তকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যে প্রবল হিংসাত্মক মনোভাবের প্রয়োজন প্রেমপূর্ণ সাত্ত্বিক বৈষ্ণবধর্ম তাহার অনুকূল নহে। সুতরাং গোবিন্দদাসকে অনুরোধ করিয়া বিজয়া তাঁহাকে যশোর ত্যাগ করাইলেন এবং প্রতাপকে দানবদলনী রণরঙ্গিণী মহাকালীর পূজার ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। ফলে সমরানল শীঘ্রই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, প্রতাপের চেষ্টা সফল হইল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে হিংসানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা যুদ্ধজয়ের সহিতই নিবৃত্ত হইল না—তাহা অবশেষে প্রতাপের হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্নেহময় ধার্মিক পিতৃব্যকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করাইল। ফল যাহা হইল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

"প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে এ প্রশ্নের উত্তর।

"রঘুবীর" নাটক "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকের কিছু পরে অভিনীত হইলেও ইহা উহার তিন বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের নায়ক রঘুবীর প্রতাপের ন্যায় রাজপুত্র ছিল না। তাহার জনক বিশ্বনাথ ছিল এক দস্যুতা-ব্যবসায়ী ভীল। মহাবীর্য্যশালী বিশ্বনাথ সামান্য দস্যু ছিল না—এক সময়ে তাহার নামে সমস্ত দাক্ষিণাত্য কাঁপিত। কিন্তু অবশেষে সে স্বেচ্ছায় দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটের দেওয়ান অনন্তরায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার উপদেশে সে তাহার "আজীবন দস্যুতার যত উপার্জন"—রাশি রাশি ধনরত্ন—সমস্ত দরিদ্রগণকে দান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিল। মৃত্যুকালে সে তাহার শিশুপুত্র রঘুবীর ও শিশুকন্যা শ্যামলার ভার অনন্তরায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যায়। অনন্তরায় ঋষিকল্প

"রঘুবীর" নাটকে এ প্রশ্নের মীমাংসা।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি রঘুবীর ও শ্যামলীকে নিজ পুত্র-কন্যা স্থানে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে "ঋষিতুল্য" করিয়া গড়িয়া তুলেন। সুতরাং দেহে তেজস্বী ভীলরক্ত প্রবহমাণ থাকিলেও শিক্ষায় দীক্ষায় রঘুবীর পূর্ণমাত্রায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়ায়। দেহে ছিল তার অপরিমিত শক্তি—সমস্ত দেশের মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমে তাহার তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাহার এই সমস্ত শক্তি পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিত—সে ছিল অসহায়ের সহায়, দুর্বলের বল, বিপন্নের রক্ষাকর্তা। এ কার্য্যে সে জাতি, ধর্ম, চরিত্র প্রভৃতি কিছুবই বিচার করিত না। আশৈশব অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ছিল সে—ঘোরতম শত্রুকেও সে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিত—বিপন্ন সর্প তাহার মস্তকে দংশন করিলেও সে তাহাকে রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না—অতি বড় পাষণ্ডকেও দণ্ড দিতে সে কাতর হইত! কিন্তু শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এইরূপ হিংসাদ্বেষহীন দেব-প্রকৃতি লাভ করিলেও, যে হিংসাত্মক ভীল-প্রকৃতি লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার লোপসাধন করা তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সে এ প্রকৃতিকে যথাসাধ্য দমন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার শক্তি সে অনুভব করিত এবং সর্বদাই তাহার ভয় হইত কখন সে মাথা তুলিয়া উঠিয়া তাহার সমস্ত জীবনের সাধনা পণ্ড করিয়া দেয়! সেইজন্য সে এমন কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত না, যাহাতে তাহার এই জন্মগত হিংসা-প্রবৃত্তি সামান্যমাত্র প্রশ্রয় পায়। কিন্তু শেষে যখন পিশাচ জাফর নবাবকে হত্যা করিয়া গুজরাটের সিংহাসনে বসিল, সপুত্র অনন্তরায়কে অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, নবাবনন্দিনী পলায়ন করিয়া ধর্ম ও প্রাণ-রক্ষার্থ রঘুবীরের শরণাগত হইলেন, তখন রঘুবীরের অন্তরে যে ঝটিকা উত্থিত হইল তাহা নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং বিপন্ন স্বজন-গণের তীব্র তিরস্কারের ফলে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ শমনসদৃশ নির্মমহৃদয় জিঘাংসু ভীলসর্দারে পরিণত করিল! তাহার পর যে ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হইল তাহাতে সানুচর জাফরের

জীবন ত আহুত হইলই, পরন্তু সপুত্র অনন্তরায়, নবাবনন্দিনী, শ্যামলী প্রভৃতি কেহই বাদ গেলেন না।

পরের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হওয়া যে আত্মহত্যারই নামান্তর তাহা রঘুবীর বেশ জানিত এবং সেইজন্য জাফরের অত্যাচারের ফলে যখন তাহার জিঘাংসু ভীল-প্রকৃতি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন সে নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। নতুবা জাফরের বিনাশসাধন তাহার পক্ষে পিপীলিকাবধের তুল্যই সহজ ছিল। এই সময়ে শ্যামলীর সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে তাহার মনের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমি তাহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে কেবল রঘুবীরের মনের পরিচয় নয়, শ্যামলীর উক্তির ভিতর দিয়া এ বিষয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদেরও মতের আভাস পাওয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষার অপূর্ব মাধুর্য্য ও কবিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

"রঘু।—সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যু-গৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে
কবে কার সর্বনাশ ক'রি। জন্ম-সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম-সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজদত্ত
জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত প'ড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'ল না তাহার!
গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্যক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গে
ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন, যেই মত
মাঝে মাঝে, দূরে—অতিদূরে, শ্যামচ্ছায়া-
বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,

পিশাচের আচরণ ঘায়, হৃদয়ের
নিভৃত গুহায় নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলি বুঝি
বিষম ঝঙ্কার, এইবার—শোন্ বোন্!—
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার! সেকি
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষুধিত শার্দূল,—
সে কি হরিণীর আকর্ণ বিশ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে?—কি কবি শ্যামলী?

শ্যামলী।—চিত্তের প্রশান্তিলাভ সে ত বিধাতার
করুণায়। কর্ম্মক্ষেত্রে কবি অবস্থান,
আজন্ম তুষারাবৃত স্থির হিমাচল
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বালামুখী
বায়ুকণা আজীবন রয়েছে মাখিয়া।
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্মিয়াছে
কত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। শান্তি চাও
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ। তারে
স্মরি', পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক—
শিরীষ-কুসুমরাশিসম—সন্তর্পণে
নিষেবিবে ব্যথিত চরণ। আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তান্বিত বীর!"

লোভ মোহ স্বার্থাদি যে হিংসাত্মক কার্য্যের ভিত্তি নহে—যাহা কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে করা যায়—তাহাতে ভগবানের সহায়তা লাভ করা যাইতে পারে। এরূপ ধর্মানুমোদিত কার্য্যের পরিণাম অশুভ হয় না বা তাহার ফলে কর্মীর চিত্তের শান্তি নষ্ট হয় না। ধর্মই রক্ষক—"যেখানে ধর্মের স্থিতি, জয় সেইখানে"—

জনহিতার্থে নিষ্কাম হিংসা ধর্মানুমোদিত।

ধর্ম হইতে বিচ্যুতিই প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। কেবল প্রতাপ-আদিত্য ও রঘুবীর নাটকে নয়, রঞ্জাবতী, নরনারায়ণ প্রভৃতি নাটকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ এই সত্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ "অচ্ছিন্ন আম্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট-ভ্রূণ মত" ধ্বংসের বীজাণু অধর্মের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের সাধন-সঙ্গেই অধর্মাচারীর বিনাশের সূত্রপাত হয় ও লোকচক্ষুর অগোচরে ধ্বংসকার্য্য চলিতে থাকে। তাহার পর এক দিন— হইতে পারে বহু বৎসর পরে—এক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সে ধ্বংসক্রিয়া সর্বসমক্ষে প্রকাশ পায়। "নর-নারায়ণ" নাটকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর কর্ণের সহিত তাঁহার উপযুক্তা সহধর্মিণী পদ্মাবতীর যে কথোপকথন হয় তাহাতে তাঁহাদের দুই চারিটি কথায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কৌরবপক্ষের বল পাণ্ডবপক্ষের বল অপেক্ষা অনেক অধিক, অতএব কৌরবদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশী, ইহা বুঝাইতে গিয়া কর্ণ বলিতেছেন—

"নর-নারায়ণ" নাটকের শিক্ষা—পাপের মধ্যেই ধ্বংসবীজ লুক্কায়িত থাকে।

"এক দিকে একাদশ অক্ষৌহিণী, সপ্তমাত্র
অন্য দিকে। এক দিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—
অসংখ্য অসংখ্য মহারথী -'

পদ্মা।—অন্যদিকে একা ধনঞ্জয়।

কর্ণ।—ভয় পেলে পদ্মাবতী?

পদ্মা।—না, প্রভু, সমস্ত বিশ্ব—সমস্ত মানব
যে যুদ্ধের ফল-প্রতীক্ষায়, মুক্ত চক্ষে
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে
যুদ্ধ-পরিণাম কর্ণ-পত্নী পাবে ভয়?
তবে প্রভু, অনুমতি দাও যদি বলি।

কর্ণ।—বল, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে।

পদ্মা।—কৌরব মরেছে বহুদিন।

কর্ণ।—জানি—জানি। যেদিন কৌরব-সভামাঝে
রজস্বলা দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্ছনা।

পদ্মা।—সেদিন মরেছে ভীষ্ম, সেদিন মরেছে
দ্রোণ—

কর্ণ।—জানি—জানি—সে সঙ্গে মরেছি আমি।"

কুরুক্ষেত্রের নামান্তর "ধর্মক্ষেত্র"। ধর্মরাজ-কর্তৃক এই ক্ষেত্র অধর্মাচারী কৌরবগণের বধ্যভূমিরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে ইহার "ধর্মক্ষেত্র" নাম সার্থক হইয়াছিল। অবশ্য যেদিন কৌরবগণ কুললক্ষ্মী দ্রৌপদীর অপমানরূপ ঘোর অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সেইদিনই তাহারা ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের অপরাধের চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিল। এই দণ্ডদানের জন্য ভগবান স্বধর্মনিষ্ঠ মহাবীর অর্জুনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নয়, পরন্তু জগতের হিতের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে অত্যাচারিগণকে দমন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। এ কার্য্যে নিজের ইষ্টানিষ্টের কথা ভাবিবার অধিকার তাঁহার নাই—এমন কি, অত্যাচার দমন করিতে গিয়া যদি তাঁহার অতিপ্রিয় আত্মীয়কেও হত্যা করা প্রয়োজন হয় তাহাও তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি ভগবানের আদেশ-পালনে নিযুক্ত, যদি মায়ামমতা বা মোহবশতঃ সে কার্য্য হইতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে স্বধর্মচ্যুত ও কর্তব্যভ্রষ্ট বলিয়া তিনি দণ্ডার্হ হইবেন। অধিকন্তু যাহাদের জন্য তাঁহার এই মোহ তাহারাও রক্ষা পাইবে না, কারণ ভগবান পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কার্য্যতঃ সংহার করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে মোহ-গ্রস্ত অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ আমাদের মোহগ্রস্ত শক্তিকে অত্যাচার-দমনে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মের রক্ষণ ভগবানের প্রিয় কার্য্য—সে কার্য্য করিতে যিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন

জগতের হিতের জন্য দুষ্কৃতকে হিংসাত্মক দণ্ডদান বিধাতার বিধান।

ভগবান তাঁহার সহায় হন—সারথিরূপে তাঁহার রথ চালনা করেন। তাই শ্যামলী রঘুবীরকে বলিয়াছিল—

"ধর্মের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মুহূর্তে মিলায়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-
সমর-সাগরে। নিজে ভগবান কর্মী—
সারথির রূপে ধর্মরথে আরোহিয়া,
আপনি দেখিল প্রভু সহাস্য-বদনে
ষট্‌ত্রিংশ অক্ষৌহিণী আঁখি-নিমীলন!
তবে তুমি কেন পারিবে না?"

কিন্তু এরূপ নিষ্কাম-কর্মীর ব্যক্তিগত জীবন কখনও সুখান্ত হইতে পারে না, কারণ তাঁহার আত্মবলির উপরেই জগতের হিত নির্ভর করে, যুগে যুগে শহীদ-রক্তে সিক্ত ধরণীতেই ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং এই মহাত্মাদের জীবন-নাটক সকল সময়েই বিয়োগান্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই মহাভারত কাব্য একটি প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র কেবল কৌরবদের শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় নাই, পাণ্ডবদেরও হইয়াছিল এবং সেই শ্মশানের উপরেই "ধর্মরাজ্য মহাভারত" স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং রঘুবীরের দুঃখময় পরিণামে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। তাহার ধ্বংসকার্য্যের ফলে তাহার আত্মীয়-স্বজন বিনষ্ট হইলেও অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা পাইয়াছিল। এইখানেই প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার প্রভেদ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের আর এক বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখিবার সময়ে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির কাহিনীগুলি বাংলা দেশে যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিতেন। এ বিষয়ে আমাদের যাত্রাওয়ালা ও কথকঠাকুরদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ সাধারণতঃ মূল গ্রন্থসমূহ হইতেই তাঁহার পৌরাণিক চরিত্রগুলি আহরণ করিয়াছিলেন এবং

তাহাদের চিত্র সমুজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের মধ্যে সেই সকল মহান্ আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, পদ্মাবতী, সাবিত্রী, উলূপী প্রভৃতি চরিত্র মহত্ত্বে, মাধুর্য্যে, ঔদার্য্যে, তেজস্বিতায় দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাসের ধারা বহাইয়া দেয়। বিশেষতঃ তাঁহার "নরনারায়ণ" নাটকটিকে আমাদের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে কৌস্তুভমণিসদৃশ বলিলেও অন্যায় হয় না। ভাষার মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য এবং মহাভারতীয় চরিত্র ও ঘটনা-সমূহের মনোহর ও অভিনব বিশ্লেষণ ইহার নাটকীয় সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণেও তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ আলমগীর প্রমুখ জটিল চরিত্রগুলির উপর তিনি যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে সেগুলির ঔজ্জ্বল্য ও মনোহারিত্ব যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অঙ্কিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য

"প্রতাপ-আদিত্য" নাটক দেশাত্মবোধের যে প্রবল প্রবাহ আনিয়া রঙ্গালয় প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার বেগ আর কমে নাই—বরং উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। বস্তুতঃ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার যতদিন না পরিবর্ত্তন হয় ততদিন ইহার বেগ প্রশমিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের পর অনেক নাট্যকারই এই জাতীয় নাটক লিখিয়া-ছেন। তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন—গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল। গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা" ও দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" প্রতাপ-আদিত্য অভিনয়ের দুই বৎসর পরে ১৯০৫ সনে রচিত হয়। ইহার পর ১৯০৬ সনে গিরিশচন্দ্রের "মীরকাশিম" মিনার্ভা থিয়েটারে ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই উভয় নাটকই মীরকাশিমের কাহিনী লইয়া

রঙ্গালয়ে দেশাত্মবোধের বন্যা

লিখিত হয় এবং পরে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার ন্যায় এই উভয় নাটকই রাজাদেশে নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

"রাণা প্রতাপ" দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক। এখানি প্রথমে স্টারে, পরে মিনার্ভায় অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক "তারাবাঈ" অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে স্থাপিত "ইউনিক" থিয়েটারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের "ফুলশয্যা"র ন্যায় এ নাটকটিও পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈয়ের কাহিনী লইয়া লিখিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে এক নূতন প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অনেকের মনোমত না হওয়াতে তিনি তাঁহার পরের ঐতিহাসিক নাটকগুলি গদ্যেই লিখিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ও ভাষার বৈশিষ্ট্য

কিন্তু তাঁহার এই গদ্যের ভাষার এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা এই সকল নাটকের সাফল্যের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকাররূপে তাঁহার খ্যাতি "রাণা প্রতাপে"র অভিনয় হইতেই আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে তাঁহার অপূর্ব গীতরচনার শক্তি—বিশেষতঃ তাঁহার হাসির গান তাঁহাকে শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়াছিল এবং তাঁহার হাস্য-রসাত্মক "বিরহ" নাটিকাটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া শিক্ষিত দর্শকগণকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী

তারাবাঈ ও রাণাপ্রতাপের পর দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান, নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, দুর্গাদাস, মেবারপতন ও সিংহল-বিজয় নামে আরও ছয়খানি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সীতা, ভীষ্ম ও পাষাণী নামে তিনখানি পৌরাণিক নাটক, সোরাব-রুস্তমের কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক এবং "পরপারে" ও "বঙ্গনারী" নামে দুইটি সামাজিক নাটক লেখেন। "বিরহে"র ন্যায় আরও দুই চারিখানি রঙ্গনাট্যও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই অভিনীত হইয়াছিল এবং অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই সকল নাটকের মধ্যে

তাঁহার সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্তই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিক ইহাদের আকর্ষণী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গুণ ও দোষ

এই দুইখানি নাটক-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার গুণ ও দোষ উভয়ই এই নাটকদ্বয়ে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটকে রসপূর্ণ বা উচ্ছ্বাসময় সংলাপ-রচনায়, চিত্তাকর্ষক চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানিতেও ঐসকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গীত-রচনায় তাঁহার যে অসামান্য দক্ষতা ছিল তাহারও নিদর্শন এই দুই নাটকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিচিত্র ঘটনা ও দৃশ্য সৃষ্টির মোহে পড়িয়া তিনি প্রায়ই তাঁহার নাটকের মেরুদণ্ডটির কথা বিস্মৃত হইতেন। সকলেই জানেন, একটি বিশেষ ঘটনা-প্রবাহ অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিত হয় এবং সেই প্রবাহের উৎপত্তি হইতে চরম পরিণতি পর্যান্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকল অংশ দেখানই নাট্যকারের কার্য্য। কিন্তু নাটকীয় ঘটনা-স্রোত নির্বিবাদে অগ্রসর হয় না—নানা প্রতিকূল শক্তি তাহার অগ্রগমনে বাধা দেয়। আবার পক্ষান্তরে নানা অনুকূল শক্তি আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। এইরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ—উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটক পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। এই উভয় শক্তি যে সকল চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, সেই সকল চরিত্র ও ঘটনা নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ—তাহারা মুখ্য চরিত্র ও ঘটনার বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল চরিত্র বা ঘটনার সহিত মুখ্য চরিত্র বা ঘটনার এরূপ কোন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, সেগুলিকে নাটকের মধ্যে লইয়া আসিলে নাটককে হীনবল করা হয়, কারণ সুবিন্যস্ত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে 'আগাছা'র ন্যায় এই সকল অবান্তর চরিত্র বা ঘটনা নাটকের

রস ও সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট হানি করে। সেকালের পাশ্চাত্ত্য নাট্য-শাস্ত্রোক্ত "three unities"এর মধ্যে unity of time এবং unity of place পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু unity of action (বা unity of purpose) অর্থাৎ সমগ্র নাটকের ক্রিয়া-প্রবাহের একাভিমুখতা নাট্যরচনার অবশ্য পালনীয় নিয়ম বলিয়া আজও পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে নাটকের plot বা আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতা-রক্ষণে ও তাহার বিকাশ-সাধনে যাহা সাক্ষাৎভাবে সহায়তা করে না তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই নিয়ম-পালনের ঔচিত্য নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন, "নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই।......সেই ঘটনাগুলি সেই মূলঘটনার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহাকে আগাইয়া দিবে কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কার্য্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এই অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়মটি লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। এমন কি, তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে।

নাটকে ঘটনা-প্রবাহের ঐক্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষণ অত্যাবশ্যক

দৃষ্টান্তস্বরূপ, চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি গ্রহণ করা যাউক। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই নাটকে চারিটি স্বতন্ত্র ঘটনা-প্রবাহ সমান্তরালভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে,—প্রথম, কন্যাশোকে উন্মত্ত চাণক্য-কর্তৃক লোক-সমাজ-পরিত্যাগ ও কন্যার উদ্ধারের পর তাঁহার পূর্বাবস্থা-প্রাপ্তি; দ্বিতীয়, চন্দ্রগুপ্ত-কর্তৃক মগধ-সিংহাসনে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা—ইহার আবার দুইটি অংশ—একটি নন্দবংশ-ধ্বংস, অপরটি সেলিউকাসের সহিত যুদ্ধ; তৃতীয়, সেলিউ-কাসের কন্যা হেলেনকে লইয়া সেলিউকাস ও তাঁহার সেনাপতি অ্যান্টিগোনাসের বিবাদ; চতুর্থ, চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়রাজকুমারী ছায়ার

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটক প্রকৃতপক্ষে একাধারে চারিটি নাটক

প্রেম-কাহিনী। বলা বাহুল্য, এই চারিটি ঘটনার কোনটির সহিত অন্য কোনটির সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। ইহাদের মধ্যে যে কোন ঘটনা স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে অপর ঘটনাগুলির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ এই নাটকে চারিটি স্বতন্ত্র নাটকের অভিনয় একই আসরে একই সময়ে দেখান হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও নাট্যশাস্ত্রকার আরিস্তোতল এরূপ অসম্বদ্ধ-উপকাহিনী-সংবলিত প্লটের নাম দিয়াছেন "episodic" এবং ইহার বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Of all plots and actions the episodic are the worst; I call a plot episodic in which episodes or acts succeed one another without probable or necessary sequence." দ্বিজেন্দ্রলালও যে এ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহা উপরে বলিয়াছি। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার গুণে এ নাটকের প্রায় সকল দৃশ্যই উপাদেয় হইয়াছে এবং সাধারণ দর্শকেরাও যে এইরূপ চারিটি উপভোগ্য নাটক একসঙ্গে একই মূল্যে দেখিতে পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া থাকে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ দর্শকগণকে আনন্দদানের শক্তির উপরেই নাটকের নাটকত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে—একথা বোধ হয় কোন নাট্যরসজ্ঞ ব্যক্তিই বলিবেন না। বস্তুতঃ সাধারণ দর্শকগণের অধিকাংশের দৃষ্টি সাধারণতঃ পৃথক্ দৃশ্যের উপরেই থাকে—সমগ্র নাটকের প্রকৃত প্রাণ-প্রবাহ কোথায় এবং কি ভাবে তাহা অগ্রসর হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। সুতরাং কোন দৃশ্য কোন কারণে ভাল লাগিলেই তাহারা আনন্দে হাততালি দেয়—তাহার সহিত আসল নাটকের কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করিয়া দেখে না। কিন্তু এরূপ পাঁচমিশালী খিচুড়ি সাধারণের যতই মুখরোচক হউক, ইহাকে কিছুতেই উৎকৃষ্ট নাটক বলা চলে না। অর্ধশিক্ষিত যাত্রাওয়ালারা যাত্রা জমাইবার জন্য অবান্তর সং দেখাইলে অনেক শিক্ষিত দর্শক নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে

নাটকে অবান্তর দৃশ্যের সন্নিবেশ অবিধেয়

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের মধ্যে সহসা অ্যান্টিগোনাস ও তাঁহার মাতার আবির্ভাব উহা অপেক্ষা কম বিসদৃশ মনে হইবে না। এই দৃশ্যটি প্রাণস্পর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু এই episode বা উপকাহিনীটি যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক—নাটকের মুখ্য আখ্যানের সহিত যে ইহার কোন সম্পর্ক নাই—তাহা নাট্যকারের অন্ধভক্তেরাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

প্রকৃত নাটক জীবন্ত মানবদেহের ন্যায় এক প্রাণ দ্বারা পরিচালিত

ভাল নাটক জীবন্ত মানবদেহের ন্যায়—তাহার প্রত্যেক অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত এবং সকলগুলিই এক প্রাণের দ্বারা পরিচালিত হয়। সকল অঙ্গই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সেই প্রাণের পুষ্টিসাধনে নিরত থাকে—কোন অঙ্গ ছেদন করিলে আর সকল অঙ্গ তাহা অনুভব করে এবং প্রাণেরও শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল "চন্দ্রগুপ্ত" হইতে নয়, "সাজাহান" "রাণা প্রতাপ" প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি হইতেও অনেক দৃশ্য স্বচ্ছন্দে ছাঁটিয়া ফেলা যাইতে পারে—তাহাতে নাটকের কোন ক্ষতি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাজাহান নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ ও ষষ্ঠ দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এ দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর, সুতরাং বর্জনীয়। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা একখানি নাটক নয়, পরন্তু তিনখানি—"সাজাহান" "দারা" ও "সুজা" নাটক। এই

"সাজাহান" নাটক তিনটি নাটকের সমষ্টি

তিনখানি নাটকই সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদের পরস্পারের মধ্যে সম্বন্ধ এত ক্ষীণ ও দূরবর্তী যে উহাদের প্রত্যেকটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক বলা যাইতে পারে। উহারা পরস্পরকে সাহায্য করা দূরে থাক, একটি নাটকের অভিনয়কালে অপর দুইটি একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। একটিকে ত্যাগ করিলে, অন্য দুইটির মধ্যে কোনটিরই অঙ্গহানি হয় না। এইরূপে "রাণা প্রতাপে"ও মেহের-দৌলত-শক্তসিংহের অদ্ভুত প্রণয়ঘটিত একটি সম্পূর্ণ অবান্তর ও অনৈতিহাসিক কাহিনী জুড়িয়া দিয়া নাটকটির অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বাস্তবিক কোন চমকপ্রদ বা চিত্তরঞ্জক ঘটনা দিবার লোভে অবান্তর দৃশ্যের যোজনা এই সকল নাটকের অনেক স্থানেই দেখা যায়। নাটকের গানগুলি প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বরচিত জনপ্রিয় সঙ্গীতসমূহ হইতে নির্বাচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন গান একরূপ জোর করিয়াই নাটকমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা করিবার জন্য অতিরিক্ত দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ পর্য্যন্ত যোজনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাজাহান নাটকের "আমার জন্মভূমি" গানটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত নাটকের "আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি" গানটি বহুকাল পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত হইলেও নাটকের সহিত ইহা বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই।

আর একটি কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকসমূহে সকল স্থানে ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই। রাণাপ্রতাপের কথা পূর্বে বলিয়াছি। আরও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। "সাজাহান" নাটকের প্রথমেই দেখা যায়—দারার মুখে ঔরংজীবের বিদ্রোহের সংবাদ শুনিয়া সাজাহান বলিতেছেন, "এরকম কখন ভাবিনি। অপ্রস্তুত নই। তাই ঠিক ধারণ কোর্ত্তে পার্ছিনা।" অথচ ইতিহাসপাঠক-মাত্রেই জানেন সাজাহান পিতার প্রিয়তম পুত্র হইয়াও সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনপ্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতা শাহ্‌রিয়ারকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ও অন্যান্য বহু রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দকে 'ক্ষত্রিয়'রূপে ও চন্দ্রগুপ্তকে 'শূদ্র'রূপে চিত্রিত করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ের জাত্যভিমানকেই নন্দবংশ-ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অথচ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, নন্দবংশীয়েরা শূদ্র ছিলেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম উগ্রসেন

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি

মগধ ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থিত ক্ষত্রিয়বংশগুলিকে ধ্বংস করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। আর কিংবদন্তি যাহাই বলুক, মৌর্য্যবংশ নামে যে সে সময়ে একটি পুরাতন ক্ষত্রিয়-বংশ ছিল তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই মৌর্য্যবংশের সন্তান ছিলেন। যাহা হউক, নাটকে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে এভাবে পরিবর্তিত করা যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ দূষণীয় তাহা বলা যায় না। নাটকের সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য অনেক নাট্যকারই ঐতিহাসিক সত্যকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া লন অথবা ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিয়া কিংবদন্তির উপর নির্ভর করেন। সে অধিকার তাঁহাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া কোন দেশপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্রের বা ঘটনার বিকৃতি করিবার অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের অনুচিত বিকৃতি

বিশেষতঃ আমাদের দেশে পৌরাণিক-নাটক-লেখকদের এ বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত, কারণ অনেক পৌরাণিক চরিত্র আজও পর্য্যন্ত হিন্দুর অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র— কেহ কেহ হিন্দুর আরাধ্য দেবতার মধ্যে গণ্য— এরূপ চরিত্রকে বিকৃত করিলে হিন্দুরা স্বভাবতঃই মর্মপীড়া অনুভব করে। মহাবীর লক্ষ্মণকে হীন কাপুরুষরূপে অঙ্কিত করিয়া মাইকেল মধুসূদন হিন্দুদের নিকট কিরূপ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিবার সময়ে নাট্যকারের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক চরিত্রের মর্য্যাদা-রক্ষণে সকল সময়ে অবহিত ছিলেন না। পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচ্ছামত নূতন করিয়া গড়িতে গিয়া তিনি অনেক সময়ে ঔচিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "ভীষ্ম" নাটকে কৌরব ও পাণ্ডবকুলের জননী সত্যবতীর চরিত্রে যে কালিমা লেপন করিয়াছেন তাহা কোন হিন্দুই অনুমোদন করিতে পারে না। এই নাটকের নায়ক নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকেও তিনি হীনস্তরে নামাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। ভীষ্মের

ত্যাগের কঠোরত্ব দেখাইবার জন্য তিনি সেই আজীবন মনেপ্রাণে ব্রহ্মচারী মহাপুরুষের এক অদ্ভুত প্রণয়কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারই আত্মশ্লাঘাত্মক স্বগত-উক্তির সাহায্যে তাঁহার এই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। এইখানেই সেই মহাত্মার দুর্গতির শেষ হয় নাই। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, তাঁহার অতিহীন প্রতিদ্বন্দ্বী শাল্বরাজের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে কুকুরবিড়ালের মত বাঁধিয়া ফেলিল এবং শাল্বরাজ সেই সুযোগে তাঁহাকে পদাঘাত করিল! আর তিনি অমিতশক্তির অধিকারী হইয়াও একটি তরবারির অভাবে তাহাদের হস্তে নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করিলেন! "পাষাণী" নাটকের নায়িকা অহল্যাদেবীর চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া নাট্যকার আরও নিম্নে নামিয়া আসিয়াছেন। একটি দৃশ্যে তিনি স্বচ্ছন্দে দেখাইয়াছেন, প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে গণ্যা ঋষিগৃহিণী অহল্যাদেবী নিজ ক্ষুধার্ত ক্রন্দনরত শিশুপুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া তাঁহার জারের অনুগমন করিতেছেন! আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রামায়ণাদি গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলিকে "সিদ্ধ রস" আখ্যা দিয়াছেন, কারণ এই সকল কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রগুলির রসমূর্তি আমাদের জনসাধারণের চিত্ত চিরস্থায়ী ভাবে অধিকার করিয়া আছে। সে রসবিরোধী নূতন কল্পনা করিয়া যাঁহারা সেই মূর্তিগুলিকে ভাঙিয়া দিতে চান তাঁহারা কখনও সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারশাস্ত্রবিদেরাও ঠিক এই কথা বলেন। বাস্তবিক সর্বসাধারণের ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণের চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন—কি নীতি, কি রুচি, কি সাহিত্য—কোন দিক্ হইতেই সমর্থন করা যায় না।

গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পরে যে সকল নাট্যকার আমাদের রঙ্গালয়ের সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলাম। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম করি নাই। তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথকে ইঁহাদের সহিত ঠিক সমশ্রেণীভুক্ত বলা চলে না। পূর্বোক্ত নাট্যকারেরা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন,

**নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ**

নাটকরচনাকালে জনসাধারণের রুচি ও শিক্ষা-সংস্কারাদির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে বড় লক্ষ্য করেন নাই। তিনি জন্মিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দুইবৎসর পূর্বে এবং অল্প বয়সেই তিনি নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। সুতরাং তাঁহার কতকগুলি নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হইবার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁহার নাটক বেশী অভিনীত হয় নাই, কারণ তাঁহার অধিকাংশ নাটকই closet-drama বা বৈঠকী-নাটকজাতীয়। কাব্য ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণাদির দিক্ দিয়া দেখিলে সেগুলি যে অপূর্ব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই গেটের নাটকের ন্যায় "caviare to the general"—তাহাদের স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। টমসন সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন, "His dramatic-work is the vehicle of ideas rather than expression of action"—অর্থাৎ নাটকীয় ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নাটকগুলি লেখা হয় নাই, পরন্তু সেগুলি তাঁহার ভাবের বাহন-স্বরূপই রচিত হইয়াছে। অথচ সকলেই জানেন, ক্রিয়াই হইতেছে নাটকের প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গীতি-কাব্যের সম্রাট্, বোধ হয় সেইজন্যই তাঁহার নাটকে ক্রিয়াংশ অপেক্ষা কাব্য ও ভাবের অংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি নাটক বা নাটিকা সম্পূর্ণ প্রতীক বা রূপক-জাতীয়—সেগুলির নায়ক-নায়িকাকে সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ বলা চলে না। ফলে এগুলি সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, নাটক লিখিবার সময়ে তিনি সাধারণ দর্শকগণের অথবা রঙ্গমঞ্চের কথা কখনও চিন্তা করেন নাই। তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন, "নাট্যকারের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়া

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বৈশিষ্ট্য

কপাল, আমার কোনই ক্ষতি নাই।” ফলে তাঁহার “প্রজাপতির নির্বন্ধে”র নাট্যরূপ “চিরকুমার-সভা”র ন্যায় দুই একখানা হাস্যরস-ভূয়িষ্ঠ সহজবোধ্য নাটক ব্যতীত আর কোন নাটক জনসাধারণের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করে নাই। তাঁহার “রাজা-রাণী” কিছুদিনের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল এবং পরে ইহা পরিবর্তিত আকারে “তপতী” নামে অভিনীত হইয়া কিয়ৎকাল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার “রাজর্ষি”র নাট্যরূপ “বিসর্জন” নাটকটি উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইলেও তাহা দ্বারা এক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সেকালের কর্তৃপক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে সাহসী হন নাই। অবশ্য শিক্ষিতদের ক্লাবে বা সখের থিয়েটারে এসকল নাটক বহুবার বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের দুই একখানি উপন্যাস রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণকর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। এইরূপে তাঁহার “বৌঠাকুরাণীর হাট” এক সময়ে “বসন্ত রায়” নামে অভিনীত হইয়া যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। পরে ১৩১৬ সালে কবি স্বয়ং এই উপন্যাসের যে নাট্যরূপ দেন তাহার নাম রাখেন “প্রায়শ্চিত্ত”। ইহার বিশ বৎসর পরে তিনি এই নাটকের আরও কিছু পরিবর্তন করিয়া “পরিত্রাণ” নামে ইহা প্রকাশ করেন। এই উভয় নাটকেই মূল উপন্যাসটির আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং পুরাতন ইতিহাসের কাহিনী হইলেও ইহাদের মধ্যে আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পর যে সকল নাট্যকার আমাদের রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। ইঁহারা উভয়েই খ্যাতনামা নট ছিলেন, অধিকন্তু অপরেশচন্দ্র বহু বৎসর নাট্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং নাট্যালয়, অভিনেতা ও

দর্শকগণ-সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নাটক লিখিতে পারিতেন। নাটক লিখিবার শক্তিও তাঁহাদেব বেশ ছিল। ফলে তাঁহাদের অনেক নাটকই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, বিশেষতঃ অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন" ও যোগেশচন্দ্রের "সীতা" যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল সেরূপ জনপ্রিয়তা ইদানীন্তন অল্প নাটকের ভাগ্যেই ঘটিযাছে। এই নাটকদ্বয়ের এরূপ সাফল্য দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিযাছিল যে, "আধুনিকতা"র প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও এদেশে পৌরাণিক নাটকের প্রতিপত্তি অণুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আব ভক্তিমূলক নাটকেবও জনপ্রিয়তা যে সমভাবে বর্তমান আছে তাহা প্রমাণ করিয়াছিল অপরেশচন্দ্রের "চণ্ডীদাস" নাটকের ও যোগেশচন্দ্রের "বিষ্ণুপ্রিয়া" নাটকের সাফল্য। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক-রচনাতেও উভয় নাট্যকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিযাছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সামাজিক নাটকগুলিব মধ্যে অনুরূপা দেবী প্রভৃতির উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত নাটকগুলিই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

পৌরাণিক কাহিনীসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে বর্তমান কালোপযোগী সমস্যামূলক নাটক লেখা যাইতে পারে যোগেশচন্দ্রের "সীতা" তাহার একটি উদাহরণ। এই নাটকে সীতার নির্বাসন-কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যকার সমাজধর্ম ও রাজধর্মের সহিত মানবধর্মের বিরোধের একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। রামচন্দ্র একদিকে আদর্শ রাজা ও সমাজপতি, অন্যদিকে আদর্শ মানব। যিনি আদর্শ রাজা বা সমাজপতি তিনি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না—তাঁহাকে প্রতিপদে রাজ্যের বা সমাজের আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। প্রজারা যাহা চায়—সমাজ যাহা বলে—তিনি তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না—তাঁহার নিকট vox populi, vox Dei—প্রজাদের কথা তিনি ভগবদ্‌বাক্য-জ্ঞানে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু

যোগেশচন্দ্রের "সীতা"-নাটকের আধুনিকত্ব

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রজারা বাস্তবিক ভগবানের ন্যায় অভ্রান্ত নয়, তাহারা প্রায়ই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ স্থলে প্রজানুরঞ্জক রাজার হয় বিপদ্, কারণ "রাজধর্ম" পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে তাঁহার নিজের বিবেকবাণীরূপ প্রকৃত vox Deiকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অতিরিক্ত "নিয়মতান্ত্রিক" এবং "প্রজানুরঞ্জক" রাজার ব্যক্তিগত জীবন দুঃখময় ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, বিশেষতঃ যখন বশিষ্ঠের ন্যায় একজন চিরাগতপ্রথাভক্ত ঘোর রক্ষণশীল ধর্মাচার্য্য তাঁহার প্রধান উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাকে পদে পদে রাজধর্মের নামে প্রাণহীন সামাজিক প্রথা ও প্রজাদের যুক্তিহীন আবদারের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হয়। ফলে শুচিবেশ রামচন্দ্রকে তাঁহার অর্ধ-আত্মা প্রেমময়ী সীতাকে নির্বাসনে পাঠাইতে হইল। প্রকৃতিদুহিতা সীতা রাজপ্রাসাদের কৃত্রিম বেষ্টন হইতে তাড়িতা হইয়া মানবধর্মের প্রতীক মহাকবি বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে সীতাহারা রামচন্দ্র তাঁহার অবলম্বিত রাজধর্মের পথে আরও অগ্রসর হইয়া "প্রচলিত সামাজিক নিয়মভঙ্গই সকল অমঙ্গলের নিদান" এই বিধান অনুসারে সত্যব্রত শম্বুককে সমাজদ্রোহিতার অপরাধে হত্যা করিলেন! কিন্তু শম্বুক মরিবার সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়া গেল যে, তিনি যে ধর্ম সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা প্রকৃত সত্য নয়—"সত্য নয়, সত্যের কঙ্কাল তুমি করিছ পূজা।" ইহার পর অশ্বমেধ-যজ্ঞ—তাহাতে প্রকৃতির প্রতীক সীতার স্থানে কৃত্রিম স্বর্ণসীতা বসাইবার ব্যবস্থা হইল। ঠিক সেই সময়ে সীতাপুত্র লব বন হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রাণহীন কৃত্রিম প্রতিমা-পূজক রামচন্দ্রের মর্মস্থলে আঘাত দিয়া নিপীড়িত সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিল। ব্যথিত স্বরে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,

"ক্ষুদ্রসত্য রক্ষা-হেতু বুঝি হায়—মহাসত্যে দিছি জলাঞ্জলি!
কে বলিবে—শাস্ত্রের বচন সত্য—কিংবা সত্য মর্মের কাহিনী?"

তখনই কবি বাল্মীকি প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"বৎস, মর্মের কাহিনী।
মর্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া
সেই সত্য, অন্য সত্য নাই।"

তখন রামচন্দ্র সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বন হইতে সীতাকে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু শাস্ত্ররক্ষক বশিষ্ঠ বাদী হইলেন—তিনি শাস্ত্র বা আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সীতাকে "শপথ" অর্থাৎ নিজ চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা-সম্বন্ধে রীতিমত "অ্যাফিডেবিট" করিতে বলিলেন! ফলে প্রকৃতির কন্যা সীতা হৃদয়ের সত্যের উপরে মুখের সত্যকে স্থান দেওয়া অপেক্ষা জননী প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন।

এ সমস্যা চিরন্তন সমস্যা—এ "ট্র্যাজেডি"ও দেশকাল-নির্বিশেষে আবহমানকাল হইতে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। রামচন্দ্রের মত আমাদের সকলেরই মধ্যে দুইটি করিয়া মানুষ আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বাহিরের ব্যাপারের সহিত জড়ীভূত থাকে—বাহিরের লোকেদের সহিত লেন-দেন করে—আর অপর মানুষটি তাই দেখে এবং তাহার সহচরের সকল কাজের সমালোচনা করে। যতদিন উভয়ের মধ্যে মিল থাকে ততদিন বেশ কাটিয়া যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিলেই ব্যাপারটি বিশেষ জটিল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ সে দ্বন্দ্ব পাকিয়া উঠিলে একটা ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়।

মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যাসমূহ বহু পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তি

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে এরূপ ট্র্যাজেডি অহরহঃ ঘটিতেছে, তাহা লইয়া অবশ্য নাটক লেখা চলে না। কিন্তু নায়ক যদি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হন এবং যে ঘটনা উপলক্ষে দ্বন্দ্ব তাহা যদি একটি বৃহৎ ব্যাপার হয় তাহা হইলে তাহা হয় একটি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু। "সীতার বনবাস" এই জাতীয় ট্র্যাজেডি। আমাদের পুরাণকারগণ এইরূপ বহু কাহিনীর সাহায্যে এই সকল চিরন্তন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনার গুণে এই সকল কাহিনী আমাদের দেশের আবাল-

বৃদ্ধবনিতার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। আমাদের "আধুনিক" নাট্যকারগণ এই সকল জনপ্রিয় কাহিনীকে "out of date" "বে-রেওয়াজ" প্রভৃতি বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় নাটকের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন।

আমাদের উপন্যাসকারগণের—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের—নিকট আমাদের রঙ্গালয়ের ঋণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ভাল নাটকের অভাববশতঃ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে আমাদের রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অনেক সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছেন। ফলে একে একে বঙ্কিমের প্রায় সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। রমেশচন্দ্রের "বঙ্গবিজেতা" "জীবন-প্রভাত" প্রভৃতি উপন্যাস এক সময়ে রঙ্গালয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইদানীং তাঁহার "গোরা" প্রভৃতি আরও দুই একটি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকল উপন্যাস ভিন্ন, মধুসূদনের "মেঘনাদ-বধ" ও "তিলোত্তমা-সম্ভব" এবং হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহারে"র ন্যায় কতিপয় কাব্যগ্রন্থও নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া রঙ্গালয়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে। ইদানীন্তনকালে যে সকল উপন্যাসকারের গ্রন্থ নাট্যীকৃত হইয়া রঙ্গালয়ে স্থান লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস এবং অনুরূপা দেবীর ও নিরুপমা দেবীর কয়েকখানি উপন্যাস দর্শকগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। অন্যান্য উপন্যাসেরও দুই এক-খানির নাট্যরূপ মন্দ সমাদর লাভ করে নাই।

রঙ্গালয়ে কবি ও ঔপন্যাসিকদের দান

অপরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্রের কিছু পূর্বে বা সমকালে, অধুনা পরলোকগত যে সকল নাট্যকার অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন রায়, মনোমোহন

গোস্বামী, অমরেন্দ্র দত্ত, দাশরথি মুখোপাধ্যায়, মনোজমোহন বসু, বরদা দাশগুপ্ত, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসুরায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে অমরেন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন গোস্বামী ব্যতীত আর কেহই অভিনেতা বা নাট্যাধ্যক্ষরূপে সাধারণ রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু ইঁহারা প্রায় সকলেই সুনিপুণ নাট্যকার ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অনেকগুলি নাটক যথার্থই প্রশংসার যোগ্য এবং সেগুলি নিজ গুণেই সমাদৃত হইয়াছিল। বরদা দাশগুপ্তের "মিশরকুমারী"র ন্যায়, ইঁহাদের রচিত কয়েকখানি নাটকের অভিনয় আজও পর্য্যন্ত বহু দর্শককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রকৃত নাটকীয় গুণই যে ইহাদের এই জনপ্রিয়তার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কতিপয় জনপ্রিয় নাট্যকার

কিন্তু এই সময়ে লিখিত কয়েকখানি "দেশপ্রেমাত্মক" নাটকের সমাদরের কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য ভিন্ন সেগুলির জনপ্রিয়তার অন্য কোন ভিত্তি নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ-আদিত্য, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি নাটক দেশাত্মবোধের যে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল, এই নাটকগুলি তাহারই সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সকল নাটকের লেখকগণ তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিভার অভাব ঐ সকল শক্তিশালী নাট্যকারের অনুকরণের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুকৃতিমাত্রই সাধারণতঃ বিকৃতিতে পরিণত হয়—এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। এই সকল লেখক উক্ত জনপ্রিয় নাট্যকারগণের দেশপ্রেমমূলক নাটকসমূহ হইতে "জমাট" দৃশ্যগুলি বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে অধিকতর জমাট করিবার উদ্দেশ্যে রঙের উপর রঙ চড়াইয়াছিলেন এবং সে কার্য্য করিবার সময়ে সম্ভাব্যতা, স্বাভাবিকতা বা সঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। একটা খুনের স্থানে তাঁহারা পাঁচটা খুন করিয়াছিলেন, একটা

কতিপয় নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ

দেশপ্রেমমূলক নাটকের বিকৃতি

গোলার স্থানে দশটা গোলা ছুড়িয়াছিলেন, একটা গৃহদাহের পরিবর্তে দাবানল সৃষ্টি করিয়াছিলেন! ঘোর সঙ্কটময় পরিস্থিতি, অসম্ভবরূপে বিপদুদ্ধার এবং যত্রতত্র হুঙ্কার ও আস্ফালনসহ জ্বালাময়ী বক্তৃতাই এই সকল নাটকের প্রধান সম্পদ্। বস্তুতঃ এই নাটকগুলি কয়েকটি উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয় যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে। মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের অনুরোধে বা দর্শকগণের মনোরঞ্জনার্থ অবান্তর হাস্যরস ও সঙ্গীত প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়াতে দৃশ্যগুলিকে আরও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

অবশ্য রঙ্গালয়ে লম্ফঝম্ফ তর্জন-গর্জন আস্ফালন চিরকালই এক শ্রেণীর দর্শককে আনন্দদান করিয়া থাকে, কারণ সেগুলিকে তাহারা শৌর্যবীর্যের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে—তাহার অভাব ঘটিলে তাহাদের নিকট সমস্ত নাটক বা তাহার অভিনয় নিস্তেজ নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। তবে পূর্বে শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত দর্শকগণই এই সকল দৃশ্য বেশী উপভোগ করিত, কিন্তু এখন রাজনৈতিক গরম-মসলা মিশানর ফলে শিক্ষিতদেরও মধ্যে সেগুলির আদর যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণও সুবিধা বুঝিয়া এই জাতীয় নাটক প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে সকল কথা সোজাসুজি বলিবার উপায় ছিল না, সুতরাং অনেক স্থলে ইসারা-ইঙ্গিত ও ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" পড়িয়া নাটকগুলিকে আরও অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা নাই, সেখানে অবশ্য এরূপ বিড়ম্বনা ঘটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পীর অসংযমাদি দোষ অনুমোদন করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত—কথায় কথায় আস্ফালন তেজবীর্যের পরিচায়ক নয়—যিনি প্রকৃত বীর তিনি ধীর হইয়া থাকেন—যাত্রা-দলের কংস বা ভীমের মত তর্জন-গর্জন করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। নিজ জীবনী-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে জাতি এরূপ অস্বাভাবিক

উত্তেজনা-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে, সে জাতি নিজ স্নায়বিক দুর্বলতারই পরিচয় দেয়।

আমাদের "নাট্যাভিনয়" আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালের এইরূপ দুই একজন নাট্যকারের অসংযম ও কুরুচিই এই আইন প্রণয়নের মূলকারণ ছিল। প্রথমে কেবল তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষেরা এই খড়গটি আমাদের রঙ্গালয়ের মস্তকোপরি ঝুলাইয়া দেন, কিন্তু পরে ইহার ফল হইয়াছিল সুদূরব্যাপী। আইনটি ঠিকভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ভার দেওয়া হয় পুলিশের উপর। কিন্তু বহু নাটকীয় ঘটনার সহিত লিপ্ত থাকিলেও, পুলিশকে নাট্যসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ সমালোচক বলা চলে না। সুতরাং তাঁহাদের হাতে পড়িয়া সাহিত্য বা রসের দিক্ দিয়া নাটকের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ পুলিশের পূর্বকর্তারা কেবল দেখিতেন—নাটকখানিতে কোন রাজ-দ্রোহিতার গন্ধ বা সাম্প্রদায়িক আপত্তির কারণ আছে কিনা, এবং তদনুসারে তাঁহারা কাঁচি চালাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাজটা অনেক সময়ে এমন বেপরোয়া ভাবে করা হইত যে, নাটকের রস বা সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িত। সময়ে সময়ে অতি নিরীহ শব্দেরও তাঁহাদের হস্তে নিস্তার থাকিত না। আমার মনে আছে, "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে স্থানবিশেষে "মা" "জন্মভূমি" প্রভৃতি কতিপয় "ভয়ঙ্কর" বলিয়া বিবেচিত শব্দ ছাড়া "ফিরিঙ্গী" শব্দ লইয়া ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। এই শব্দটা নাটকের অন্যতম চরিত্র 'রডা'র বিশেষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, কারণ রডা ছিল পর্তুগীজ্ এবং সে সময়ে এদেশে পর্তুগীজ্‌রা "ফিরিঙ্গী" নামেই পরিচিত ছিল। এখন এই শব্দটি অবশ্য আসল ও দোআঁশলা সকল প্রকার ইউরোপীয় জাতির প্রতিই নির্বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্যের সময়ে বাংলা দেশে পর্তুগীজ্ ভিন্ন ইংরেজ প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় জাতির নাম-গন্ধও ছিল না।

"নাট্যাভিনয়" আইন ও তাহার প্রতিক্রিয়া

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? পুলিশের নাটক-বিচারক মহাশয় এই শব্দটার মধ্যে ইংরেজের গন্ধ পাইলেন এবং অভিনয়কালে ইহা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন! নাট্যোল্লিখিত রডার চরিত্র বীরচরিত্র, তাহার দ্বারা ফিরিঙ্গী নামে কলঙ্ক পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তৎসত্ত্বেও এই আদেশ দেওয়াতে বোধ হয় যে, সে সময়ে দেশের অবস্থা বুঝিয়া কর্তৃপক্ষদের চিত্ত একটু বেশী সন্দেহাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে যখন "চন্দ্রশেখর" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া প্রথম অভিনীত হয়, তখন লরেন্স ফস্টর নিজ জাতি-কুল-স্বভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে দুর্বৃত্তপ্রকৃতির ইংরেজ বা স্কচ হইলেও কেহ তখন তাহার সম্বন্ধে কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সহসা কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কাহারও মনে হইল, উক্ত চরিত্রের অভিনয় দ্বারা সমগ্র ইংরেজজাতির মানহানি করা হইয়াছে। অমনই আদেশ হইল, "ঐ সাহেবের ইংরেজী নাম বদলাইয়া অন্য কোন ইউরোপীয় নাম দাও।" আদেশ পালিত হইতে অবশ্য বিলম্ব হইল না। কিন্তু এইরূপে অন্য ইউরোপীয় জাতির ব্যয়ে ইংরেজ জাতির মানরক্ষা করিতে গিয়া সমস্ত গল্পের যে সঙ্গতি নষ্ট হইয়া গেল সে দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। দর্শকেরা আপত্তি করিল না, কারণ নাম বদলাইলেও তাহারা তাহাদের পরিচিত লরেন্স ফস্টরের রূপের কোন পার্থক্য দেখিতে পাইল না। যাহা হউক, এখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি। অতএব আশা করা যায়, এখন হইতে এই আইনটির এরূপ ভাবে আর অপব্যবহার হইবে না। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে কুরুচি ও সাম্প্রদায়িকতাদি দোষ নিবারণের জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়তা যে এখনও আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

---

# অষ্টম অধ্যায়

## বর্তমান-যুগের নাটক ও ইহার উন্নতির উপায়

গিরিশচন্দ্রের পর আমাদের নাটক কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখিলাম। এক্ষণে আমাদের নাট্যজগতে এক নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্য্যায়ের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহার মূলে কতকগুলি বিপ্লবকর ঘটনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং নবপর্য্যায়ের নাটকগুলির স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্রে সেই সকল ঘটনার আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব আমি প্রথমে সেই সকল ঘটনা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

নাট্যজগতে নবপর্য্যায় আরম্ভ

এই ঘটনাগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চের ক্রমিক পরিবর্তন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে যখন দৃশ্যপট প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন কেবল "গুটান" দৃশ্যপট ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ দৃশ্যপটগুলি গুটান থাকিত এবং প্রয়োজনমত তাহা ফেলা হইত ও গুটাইয়া তোলা হইত। ইহার পরে "ঠেলা" দৃশ্যপট প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ কাঠের ফ্রেমে আঁটা দৃশ্য-পটগুলি রঙ্গমঞ্চের দুই পার্শ্ব হইতে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। ইহার পর "set scene" অর্থাৎ পৃথক্ আসবাবপত্রাদি দ্বারা সজ্জিত গৃহাদির দৃশ্য প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কোন নূতনপ্রকার দৃশ্যপটের আবির্ভাবের সহিত প্রাচীনতর দৃশ্যপটগুলির তিরোভাব ঘটে নাই। ফলে এই তিন প্রকারের দৃশ্যপটই এখনও পর্য্যন্ত আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথক্ আসবাবপত্রাদিযুক্ত দৃশ্যপটের প্রবর্তনের সহিত অভিনয়ের ধারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে প্রায় সকল অভিনেতাকে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতে হইত। ইউরোপেও

মঞ্চ ও দৃশ্যপটের নানা পরিবর্তন এবং নাটক ও অভিনয়কলার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া

পূর্বে এই প্রথা ছিল। সেক্সপিয়ার, মলেয়ার, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শেরিডানের সময় পর্য্যন্ত ওদেশের রঙ্গমঞ্চ অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মত ছিল। সুতরাং ওখানেও অভিনেতাদিগকে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতে হইত। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কোন কোন দৃশ্যে দুই একখানা চেয়ার বা আসন দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমান কালে এইরূপ "সজ্জিত" দৃশ্যপট প্রবর্তিত হওয়াতে অভিনেতারা অবস্থানুসারে বসিয়া, দাঁড়াইয়া বা শুইয়া অভিনয় করিতে পারেন। ফলে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর আবার যখন ঘূর্ণনীয় মঞ্চ (revolving stage) প্রবর্তিত হইল তখন দৃশ্যপট-পরিবর্তনের সহিত অভিনেতাদের স্থান-ত্যাগের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আর রহিল না—অভিনয় করিতে করিতেই তাঁহারা অপসারিত হইতে লাগিলেন। ফলে নাট্যকারেরাও তাঁহাদের নাটক তদনুসারে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—রঙ্গমঞ্চে তাড়িতালোকের প্রবর্তন ও নানা-কার্য্যে তাহার নিয়োগ। এই নূতন আলোক-প্রবর্তনের ফলে রঙ্গ-মঞ্চে কেবল আলোকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় নাই, পরন্তু ইচ্ছামত আলোক-নিয়ন্ত্রণ এবং আবশ্যকমত বিবিধ বর্ণের আলোক-ব্যবহারের সুবিধা হইয়াছে। সেকালে রঙ্গমঞ্চে প্রথমে বাতির আলোক ব্যবহৃত হইত। পরে গ্যাসের আলোক তাহার স্থান অধিকার করে। এখনও মফঃস্বলের যে সকল স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক পাইবার উপায় নাই, সেই সকল স্থানে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল নগরে তাড়িতালোক অনায়াসলভ্য, সে সকল স্থানে এই আলোক রঙ্গমঞ্চে এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছে। এই আলোক সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সেইজন্য এখন রঙ্গমঞ্চে সকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাল দেখান চলে, কোন বিশেষ দৃশ্য বা কোন

তাড়িতালোকের প্রবর্তন এবং অভিনয়কলা ও নাটকের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া

অভিনেতার ভাবভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে ও দৃশ্যের আকস্মিক পরিবর্তন সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন নানা বর্ণের আলোক ব্যবহার করিয়া এবং স্বেচ্ছামত তাহার উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া দৃশ্যের ও পরিচ্ছদাদির সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই সঙ্গে অভিনেতাদের রূপ-সজ্জার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। পূর্বে ক্ষীণালোকে আলোকিত রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়েব সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাসমূহ রঙ্গমঞ্চ হইতে কিছুদূরে উপবিষ্ট দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হইত না, সুতরাং বাচিক অভিনয়ের দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইত। নাট্যকারকেও সেইজন্য ভাবোচ্ছ্বাসময় সুদীর্ঘ বক্তৃতাবলী দ্বারা নাটককে ভারাক্রান্ত করিতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের গভীর ভাবসমূহ বাক্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করাই অধিকতর স্বাভাবিক—এরূপ স্থলে বাগাড়ম্বর যত কম করা যায় ততই ভাল। অবস্থা-বিশেষে একটি ক্ষুদ্র "চাহনি" বা সামান্য অঙ্গভঙ্গির দ্বারা যে মর্মস্পর্শী ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে তাহা উৎকৃষ্ট বাক্যবিন্যাসের দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। কর্ণ যাহা শুনে তাহা অপেক্ষা চক্ষু যাহা দেখে তাহা দর্শকগণের হৃদয় অধিকতর বিচলিত করে। এই জন্যই বাচিক অপেক্ষা আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় অবস্থাবিশেষে অধিকতর প্রাণস্পর্শী হয়। বৈদ্যুতিক আলোক ও উন্নততর রূপসজ্জার সাহায্যে এখন এই আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চেব বর্তমান অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুযশ লাভ করিয়াছেন এবং আমাদের অভিনয়প্রথারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমাদের বর্তমান নাট্যকারগণও তাঁহাদের নাটকে যতদূর সম্ভব বাক্যচ্ছটা সংযত করিয়া অভিনেতাদিগকে সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয় করিবার অবসর দিতেছেন।

সিনেমার আগমন ও থিয়েটারের সহিত প্রতিযোগিতা

আমাদের রঙ্গজগতের আর একটি বিপ্লবজনক ঘটনা—সিনেমার আগমন। আমাদের এখানে নির্বাক্ চিত্রের আবির্ভাব হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে। কিন্তু সবাক্ চিত্রের বয়স এখনও কুড়ি বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ইহার মধ্যেই ইহা আমাদের অভিনয় ও নাটকের উপর কিরূপ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বঙ্গদেশে প্রথম সিনেমা-চিত্র দেখান ফ্লেমিং (Fleming) সাহেব। ১৯০২ সনে তিনি একটি ক্ষুদ্র (মাত্র ৪০০ ফুট দীর্ঘ) নির্বাক্ চিত্র আনিয়া এখানে প্রদর্শন করেন, কিন্তু পর বৎসর তিনি অর্থাভাববশতঃ তাঁহার ব্যবসায় মদন (Madan) কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। পরে ১৯২৮ বা ১৯২৯ সনে এই মদন কোম্পানিই প্রথম সবাক্ চিত্র আমদানী করেন। সুতরাং নির্বাক্ ও সবাক্ উভয়বিধ চিত্র-প্রচলনের জন্যই মদন কোম্পানির নিকট এদেশ অনেকটা ঋণী। যাহা হউক, নির্বাক্ চিত্র যখন প্রথম এদেশে আসে তখন তাহার অভিনয় দেখিয়া কোন কোন অভিনেতা নিজ অভিনয়ের ধারা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া লইলেও নাট্যকারগণের উপর তাহার কোন প্রভাব অনুভূত হয় নাই, কারণ তখন গিরিশচন্দ্রাদির যুগ চলিতেছিল এবং সিনেমা-গৃহও এখনকার মত থিয়েটারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু সবাক্ চিত্র আগমনের পর হইতে থিয়েটারের সহিত সিনেমার প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং সেজন্য প্রথমে থিয়েটারগুলিকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ সে সময়ে আমাদের পূর্বতন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ অন্তর্হিত হওয়াতে সকল থিয়েটারই ভাল নাটকের অভাবে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যাহা করা উচিত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহারা যতদূর সম্ভব শত্রুর অস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ যে সকল গুণে সিনেমা এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ

করিয়াছিল তাঁহারা যথাসাধ্য সেই সকল গুণ অর্জনে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

সিনেমার এই সকল গুণের মধ্যে প্রথম ছিল—প্রবেশ-মূল্যের সুলভতা। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে এটা একটা বড় কথা। দর্শনী লইয়া অভিনয় দেখানর প্রথা আমাদের দেশে কখনই ছিল না—এটা আমরা সাহেবদের নিকট শিখিয়াছি।

সিনেমার জনপ্রিয়তার প্রথম কারণ—সুলভতা

এখানে কি অবস্থায় মূল্য লইয়া অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা হয় তাহা পূর্বে বলিয়াছি। যখন বাগবাজারের দল প্রবেশ-মূল্য লইয়া থিয়েটার দেখাইবাব ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহাদের লাভ করিবার উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁহারা কেবল থিয়েটারের ব্যয়-নির্বাহার্থ এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহারা আনুমানিক আয়ব্যয় অনুসারে প্রবেশ-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দর্শকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে থিয়েটারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে থিয়েটার বেশ লা~ ও লোভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ফলে কলাপ্রীতির স্থান ব্যবসায়বুদ্ধি আসিয়া অধিকার করিল এবং থিয়েটারের আয় আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও টিকিটের মূল্য কমিল না। বস্তুতঃ মূল্য কমান ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল, কারণ লাভের প্রত্যাশায় থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল। তাহার ফলে রঙ্গমঞ্চের সাজসরঞ্জাম দৃশ্য-পটাদির এবং অভিনেতৃবর্গের বেশভূষার ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। নাম-করা অভিনেতাদের লইয়া লোফালুফি চলিতে লাগিল, এবং এই কারণে তাঁহাদের বেতন একেবারে পাঁচ ছয় গুণ বাড়িয়া গেল। তাহার উপর তাঁহারা কোন থিয়েটার ছাড়িয়া অন্য থিয়েটারে আসিবার কালে শেষোক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে মোটা রকম "বোনাস্", আদায় করিতে লাগিলেন।

তদ্ভিন্ন থিয়েটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে দর্শকগণকেও লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইল। সময়ে সময়ে এমন অবস্থা হইতে লাগিল যে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ দর্শকগণকে নানাপ্রকার "উপহার" দ্বারা প্রলুব্ধ করা ভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিবার অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ এক সময়ে এই উপহারের হিড়িক এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কপিকুমড়া হইতে আরম্ভ করিয়া "শব্দকল্পদ্রুম" পর্য্যন্ত বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় নাই! এইরূপে নানা কারণে থিয়েটারের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল, সুতরাং সে অবস্থায় কর্তৃপক্ষেরা প্রবেশমূল্য-হ্রাসের কথা মনেও আনিতে পারিতেন না।

থিয়েটার-ব্যবসায়ের তুলনায় সিনেমা-ব্যবসায়ের সুবিধা

পক্ষান্তরে সিনেমাগৃহের কর্তাদের রঙ্গমঞ্চের আসবাবপত্র ও দৃশ্যপটাদি এবং অভিনেতৃবর্গের জন্য কোন ব্যয় বা চিন্তাই করিতে হয় না—একটা জনপ্রিয় চিত্র ভাড়া করিয়া আনিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। যে চিত্রটি পৃথিবীর অপর প্রান্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে সেখানি এইরূপে অতি অল্প ব্যয়েই এখানে দেখান চলে। যে সকল সিনেমা কোম্পানি নিজেরা ছবি প্রস্তুত করেন তাঁহাদিগকে অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ছবি তাঁহারা কেবল নিজেদের গৃহে দেখান না, পরন্তু তাহার অসংখ্য প্রতিচ্ছায়া প্রস্তুত করিয়া দেশবিদেশে সর্বত্র তাহা ভাড়া দিয়া তাঁহারা যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। থিয়েটারের অধিকারীরা অবশ্য তাহা করিতে পারেন না। যদি কোন চিত্র জনপ্রিয় না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য একখানি চিত্র ভাড়া করা সিনেমাওয়ালাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয় না। কিন্তু থিয়েটারে তাহা করা যায় না। সেখানে যদি কোন নাটক সাফল্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে হয় সর্বনাশ। সে নাটকটি অভিনয়ার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তাহাত নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান পূরণ করিবার উপায়

থাকে না। একখানি নূতন নাটক লিখাইয়া তাহা অভিনয়ার্থ প্রস্তুত করিতে আজকাল কিরূপ সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং কোন নাটক বিফল হইলে থিয়েটারের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে সিনেমার অধিকারীরা প্রবেশ-মূল্য যত কম করিতে পারেন থিয়েটারের অধিকারীরা ততটা পারেন না।

সিনেমার জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ নানাবিধ বিস্ময়কর ও জ্ঞানপ্রদ দৃশ্য-প্রদর্শন

সিনেমার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে যে সকল চমৎকার দৃশ্য ও ঘটনা দেখান যাইতে পারে থিয়েটারে কস্মিন্‌কালেও তাহা দেখান সম্ভবপর নয়। জগতের যাবতীয় বিস্ময়কর ও মনোরম দৃশ্য এবং মানুষ যত প্রকার অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিতে পারে তাহা সমস্তই সিনেমায় প্রদর্শিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সিনেমার সাহায্যে চাক্ষুষ পরীক্ষা ও প্রমাণ-সহ শিল্প, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ই সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ সকল চিত্র শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলকেই সমানভাবে জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে এবং এইরূপে সকল প্রকার দর্শককে এক সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া সিনেমার আয়বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। এক্ষেত্রে বোধ হয় থিয়েটারকে সিনেমার নিকট চিরদিনই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় কারণ— অল্প সময়ে পূর্ণ-তৃপ্তি-সাধন

সিনেমার তৃতীয় সুবিধা এই যে, এখানে অল্প সময়ের মধ্যে এক জগদ্ব্যাপী বৃহৎ নাটক অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করা যাইতে পারে। সিনেমায় দৃশ্যপট সাজাইবার জন্য সময়ের আবশ্যক হয় না, দৃশ্যের পর দৃশ্য অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে, কথাবার্তাগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হয়, সুতরাং একখানি বড় নাটকের অভিনয় দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়। ফলে সিনেমার অধিকারী প্রত্যহ সেই নাটকের তিন চারি

বার অভিনয় দেখাইতে পারেন। দর্শকগণেরও কম সুবিধা নয়, কারণ তাঁহাদের সময়ের অনেকটা সাশ্রয় হয় এবং তাঁহারা সকালে বিকালে বা রাত্রে যে সময়ে সুবিধা হয় ছবি দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অনতিদীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় দর্শকগণের স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গলজনক।

চতুর্থ কারণ—জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয়-প্রদর্শন

সিনেমার দর্শকগণের চতুর্থ সুবিধা এই যে, এখানে সামান্য ব্যয়ে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই সকল অভিনয় দেখিয়া কেবল সাধারণ দর্শকগণ আনন্দলাভ করেন না, পরন্তু আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবর্গও তাহা দেখিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়া থাকেন। ইহার ফলও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের রঙ্গালয়ে যে গগন-ভেদী চীৎকার অভিনয়ের নামে বিকাইত, এখন তাহার স্থানে আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং দর্শকেরাও এরূপ অভিনয়ের আদর করিতে শিখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাড়িতালোকের সাহায্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু থিয়েটারের লোপ-সাধন সিনেমার দ্বারা হইতে পারে না

কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও সিনেমা এখনও থিয়েটারের বিলোপ-সাধন করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ নকল জিনিষ যতই নিখুঁত হউক না কেন, আসল জিনিষের দাম কমাইতে পারে না। কোন পুত্তলিকাকে জীবন্ত মানুষ বলিয়া ভ্রম হইলেও, পুত্তলিকা পুত্তলিকা-মাত্র, মানুষের স্থান সে অধিকার করিতে পারে না। জীবন্ত মানুষকে আমরা নিত্য নূতন ভাবে পাই, কিন্তু প্রাণহীন ছবি কথা কহিলেও তাহার ভাবের কখনও পরিবর্তন হয় না। সে একই ভাবে চিরদিন অভিনয় করিয়া যায়। ফলে দুই একবার দেখিলেই তাহা পুরাতন হইয়া যায়—পুনরায় তাহা দেখিবার ইচ্ছা মিটিয়া যায়। পক্ষান্তরে জনপ্রিয় জীবন্ত অভিনেতার সহিত দর্শকগণের একটা প্রাণের সংযোগ স্থাপিত হয়—তিনি যেন

তাহাদের নিতান্ত আপনার লোক হইয়া পড়েন। রঙ্গমঞ্চে স্বশরীরে অভিনয় করিয়া তিনি আমাদিগকে যে আনন্দ দান করিতে পারেন, তাঁহার ছবির অভিনয় কখনও আমাদিগকে সে আনন্দ দিতে পারে না। গভীরতর চিন্তার ফলেই হউক অথবা তাৎকালিক দর্শকগণের মতিগতি বুঝিয়াই হউক, অনেক সময়ে অভিনেতারা স্থান-বিশেষে নূতন ভাবে অভিনয় করিয়া নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহাদের ছায়া-চিত্রগুলিত তাহা পারে না—তাহাদের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েভাব ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ছবিতে কোন অভিনেতার অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে, অধিকতর তৃপ্তিলাভার্থ আসল লোকটির অভিনয় দেখিবার জন্য স্বভাবতই মনে একটা বাসনা জন্মে. কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কাহারও অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইলে ছবিতে তাঁহার সেই অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা বোধ হয় অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। যখন আসল মানুষটি পাওয়া যায় না কেবল তখনই আমরা তাঁহার ছবি দেখিয়া কতকটা তৃপ্তিলাভ করি। তদ্ভিন্ন সিনেমায় আমরা যাহা দেখি তাহা নাটক নয়, নাটকের কঙ্কালমাত্র। নাটকের মধ্যে প্রধান উপভোগ্য বস্তু তাহার সংলাপাংশ, কারণ নাটকের রস তাহার মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু সিনেমায় নাটকের এই অংশ নির্মমভাবে কাটিয়া ছাটিয়া ফেলা হয়। নাটকের ক্রিয়াংশ বুঝাইবার জন্য যে বাক্যগুলি না রাখিলে চলে না কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয় সুতরাং সিনেমা প্রকৃত নাট্যরসপিপাসুকে কখনও তৃপ্তিদান করিতে পারে না। সেজন্য থিয়েটারের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই।

সুতরাং থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যই থিয়েটারকে বাঁচাইয়া রাখিবে, যেমন যাত্রার বৈশিষ্ট্য আজও পর্য্যন্ত যাত্রাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতার ফলে নাটক ও অভিনয়াদির নানা পরিবর্ত্তন

কিন্তু বলিয়াছি, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে হইলে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রতিযোগীর গুণগুলি যথাসম্ভব আয়ত্ত করিতে হয়। যাত্রা তাহা করিয়াছে, সেই জন্য থিয়েটার তাহাকে পরাভব করিতে পারে

নাই। আমাদের থিয়েটারগুলিও যে সিনেমার সহিত যুদ্ধে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার আভাস উপরে কতকটা দিয়াছি। অনেক থিয়েটারে প্রবেশ-মূল্য অপেক্ষাকৃত কমাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অভিনয়ের ধারাও বর্তমান রুচি অনুসারে পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা পরিবর্তন ঘটিয়াছে নাটকের আয়তনে ও গঠন-প্রণালীতে। পূর্বে অভিনয় হইত প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া—একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও তাহার পর একটি প্রহসন—অভিনয় শেষ হইতে অন্ততঃ ছয় সাত ঘণ্টা লাগিত। ইহাই ছিল অভিনয়ের সাধারণ "প্রোগ্রাম"—সময়ে সময়ে ইহার উপর আরও দুইএক পালা জুড়িয়া দেওয়া হইত। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া এই অভিনয়কাল ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল বই কমে নাই। ক্রমে এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে, অবশেষে অভিনেতা ও দর্শকগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক আইন পাশ করিয়া রাত্রি একটার পর অভিনয় করা নিষেধ করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ আয় কমিবার আশঙ্কায় এই আইনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দুই চারিটি পাল পার্বণ ব্যতীত একাধিক নাটক অভিনয় করার প্রথা তাঁহারা নিজেরাই তুলিয়া দিয়াছেন এবং অভিনয়ের নূতন নাটকগুলির আয়তনও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সিনেমার অভিনয়-দর্শনে অভ্যস্ত দর্শকগণের মনের গতিও এক্ষণে এরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে যে, তাহারা এখন এইরূপ অল্পকালব্যাপী অভিনয় দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। নাটকের আয়তন এইরূপ কমাইয়া দেওয়ার ফলে থিয়েটারের আয় কমা দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে, কারণ সিনেমার ন্যায় এখন থিয়েটারেও প্রত্যহ অভিনয় করাত যায়ই, পরন্তু দিনে দুইবার অভিনয় করাও চলে। প্রথমে যখন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় হইত। তাহার পর শনিবার ও রবিবার এই দুই দিন অভিনয় করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং শেষে বুধবারেও অভিনয়ের ব্যবস্থা

হয়। কিন্তু এই তিন দিন বিভিন্ন নাটকের অভিনয় হইত। বিশেষ জনপ্রিয় নাটকও সপ্তাহে এক দিনের অধিক অভিনীত হইত না। এখন একটি নাটক প্রতি সপ্তাহে উপর্য্যুপরি দুই দিন অভিনয় করার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে দর্শকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও নাটকের শ্রীবৃদ্ধির সহিত এ বিষয়ে আরও উন্নতি সাধিত হইবে।

কিন্তু নাটককে "ছোট" করার অর্থ অবশ্য তাহাকে বিকলাঙ্গ করা নয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেক নাটক পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। "ছোট গল্প"-রচনার ন্যায় এরূপ নাটক-রচনাও একটি বিশিষ্ট শিল্প। বর্তমান যুগের নাটকসমূহ এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন অথচ পূর্ণাঙ্গ নাটক। একলক্ষ্যতা ও গতির ক্ষিপ্রতা এই সকল নাটকের বিশেষ লক্ষণ। মানবের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির সহিত নানা শক্তির অবিরত দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

নাটকের আয়তন ও গঠনের পরিবর্তন

এই বিরোধী শক্তি স্বসমাজ হইতে পারে, অন্য ব্যক্তি হইতে পারে, এমন কি নিজের বিবেক পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রকৃত বিষয়বস্তু তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এ যুগের নাট্যকার তাঁহার নাটকটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য কেবল এই দ্বন্দ্বেরই গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন করেন—কোন অবান্তর ব্যাপার নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দর্শকগণের চিত্তবিক্ষেপ ঘটান না। এমন কি, গল্পের ভূমিকা পর্য্যন্ত বাদ দিয়া তিনি দ্বন্দ্বের পরিপক্কাবস্থায় তাঁহার নাটক আরম্ভ করেন এবং বক্তৃতা অপেক্ষা নাটকীয় ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ফলে নাটকের পরিসমাপ্তি হইতে অযথা বিলম্ব হয় না। নবপ্রবর্তিত ঘূর্ণনীয় মঞ্চের সাহায্যে এখন অভিনয়ও যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদিত হয়। দুই অঙ্কের মধ্যে বিরাম-কালের দৈর্ঘ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেকালের "কনসার্ট" বা "একতান বাদন" আর দর্শকগণের বিরক্তি উৎপাদন করে না।

নাটকের ক্রিয়াংশ এইরূপে প্রাধান্য লাভ করাতে ইহার কাব্যাংশ অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে

ক্রমশঃ একেবারে সাহিত্য ও কাব্যরসহীন হইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মানবহৃদয়ের অন্তস্তলে যে চিরন্তন কাব্য ও রোমান্সের উৎস বিরাজমান রহিয়াছে তাহা কখনও শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। সে উৎস উদ্বেলিত হইলেই তাহা হইতে রসধারা নির্গত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এই সংসার-মরুতে নানাবর্ণের ফুল ফোটায়। সুতরাং মানবহৃদয় লইয়াই যখন নাটকের কারবার তখন তাহা কখনও কাব্যহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভবিষ্যতে নাটকে কেবল নাটকীয় ক্রিয়া হইতে স্বতঃসম্ভূত কাব্যরসই স্থান পাইবে, অবান্তর কাব্য বা সাহিত্য দ্বারা তাহা ভারাক্রান্ত হইবে না। যে নাটক মানবজীবন ও সমাজের দর্পণ-স্বরূপ, মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্বাদি যাহার ভিত্তি এবং কল্পনা ও রসের প্রাচুর্য্যে যাহা সমৃদ্ধিশালী, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তাহা যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

আধুনিক নাটকের আয়তন ক্ষুদ্রতর হইলেও কাব্যরস-হীন হইবে না।

শুনিতে পাই, আমাদের বর্ত্তমান নাট্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এদেশে "আধুনিক নাটকের স্রষ্টা" বলিয়া অভিনন্দিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও ভক্তেরা সেই কারণে তাঁহাদিগকে গতযুগের প্রধান নাট্যকারগণেরও উপরে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কারণ আমরা চিরকালই আমাদের পিতামহদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর দূরদর্শী ও বিজ্ঞতর জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু একটু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, "আধুনিক নাটক-সৃষ্টি"র জন্য এই সকল নাট্যকারেরা যতটা কৃতিত্ব দাবী করিয়া থাকেন তাহার অতি সামান্য অংশই তাঁহাদের প্রাপ্য। এই সকল নাটককে প্রধানতঃ দুইটি কারণে "আধুনিক" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, ইহাদের গঠন-প্রণালীর নূতনত্ব; দ্বিতীয়, ইহাদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। পূর্বে

নবীন নাট্যকারেরা নব-যুগের ফলমাত্র—স্রষ্টা নহেন

দেখাইয়াছি যে, রঙ্গালয়ের আকার ও গঠনাদির পরিবর্তনের সহিত নাটকেরও রচনাপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। নবযুগেও যে তাহা হইয়াছে তাহা উপরে বলিয়াছি। বর্তমানকালে নানা কারণে নাট্যকারেরা নাটকের আকার ছোট করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক নাটকসমূহের উল্লিখিত রচনা-প্রণালীর অনুসরণ বা অনুকরণ করিতেছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের উদ্ভাবনী-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আর বিষয়বস্তুর "আধুনিকতা" ত কালের সহিত চিরদিনই পরিবর্তনশীল। আজ যাহা "অত্যাধুনিক" কাল তাহা পুরাতনের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িবে। সুতরাং এ হিসাবে "আধুনিক" শব্দের অর্থ "সাময়িক" ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই কারণে প্রত্যেক "হুজুগে" ও সাময়িক নাটকই সমভাবে "আধুনিকতা"র দাবী করিতে পারে। "শ্রমিক-ধনিক", "কৃষক-জমিদার" প্রভৃতি সমস্যা-বিষয়ে নাটক লিখিয়া আজ যাঁহারা নূতনত্বের দাবী করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ "নীলদর্পণ" নাটকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই নাটক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন "আধুনিক" নাটকের কথা আমার জানা নাই, অথচ এই নাটকটি ছিল আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রবল রাজশক্তি-দ্বারা রক্ষিত দুর্দান্ত বিদেশী ধনিক ও জমিদারের নৃশংস অত্যাচার-দমনে এই একখানি নাটক কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এমন কি, এ বিষয়ে ইহাকে আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদসাধনে সহায়ক সুবিখ্যাত উপন্যাস Uncle Tom's Cabin-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকটি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং কোন রঙ্গালয়ের তাগিদ বা প্রয়োজন অনুসারে ইহা লিখিত হয় নাই। এধরণের কোন বিদেশী নাটকও আদর্শরূপে নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গভীর সহানুভূতির সহিত স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন

তাহারই একটি সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। এই বাস্তবতাই এই নাটকটিকে এত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে আমাদের নবীন নাট্যকারেরা আমাদিগকে যাহা দিতেছেন তাহাতে অনেক স্থলেই কৃত্রিমতার গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। বেশ বোঝা যায়, বিদেশ হইতে আমদানী সমাজতন্ত্রাদি মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল নাটকের আখ্যানসমূহ কল্পিত হইয়াছে এবং সাধারণের মুখরোচক করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জনপ্রিয় রাজনৈতিক বুলি ও কাহিনী তাহাদের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু এ উপায়ে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য বিদেশ হইতে উচ্চ চিন্তা ও ভাবধারা এবং মঙ্গলজনক রীতিপদ্ধতি আনিয়া নিজ সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করা সকল সময়েই বাঞ্ছনীয় এবং এ কার্য্য আমরা চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি।

বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়

কিন্তু তাই বলিয়া নির্বিচারে বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ সমর্থন করা যাইতে পারে না। যাহা আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরোধী তাহা দ্বারা আমাদের পুষ্টি-সাধন সম্ভবপর নয়। যে আহার্য্য আমরা পরিপাক করিয়া স্বদেহে মিশাইয়া লইতে না পারি তাহা গ্রহণ করিলে উপকার না হইয়া অপকারই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া পশ্চিম হইতে বর্ত্তমান কালোপযোগী নাটক লিখিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিবার সহিত সেখানকার নাটকাদির গল্পাংশও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু এই সকল গল্পের ভিত্তি যে সমাজ তাহার সহিত আমাদের সমাজের প্রভেদ বিস্তর। যাহা ঐ সমাজের পক্ষে সত্য, আমাদের সমাজের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এই সকল লেখক তাহা সকল সময়ে বিচার করিয়া দেখেন না। তাঁহারা কেবল গল্পের নায়ক নায়িকাদের নামধামাদি বদলাইয়া সেগুলিকে

দেশী রূপ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভিতরের আসল ব্যাপারটা যেরূপ বিজাতীয় সেই রূপই রহিয়া যায়। ফলে আমাদের চক্ষে তাহাদের বিসদৃশতা আরও সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। আমরা "হ্যামলেট" পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি এবং তাহার অভিনয় দেখিয়া আরও তৃপ্তি লাভ করি। তাহার মধ্যে কোন ঘটনাই বিসদৃশ বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কারণ আমরা জানি হ্যামলেট যে সমাজের লোক সে সমাজে ঐরূপ ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি "হ্যামলেটে"র স্থানে "হেমেন্দ্রলালে"র নাম বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ বীভৎস ও অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বিলাতী সমাজ-সমস্যাকে আমাদের সমাজ-সমস্যা রূপে চিত্রিত করা অবিধেয়

হইতে পারে, বিলাতী সমাজের সমস্যার অনুরূপ সমস্যা এদেশের বিলাতী ভাবাপন্ন দুই চারিটি পরিবারের মধ্যে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই সকল নাটক ত কোন ক্ষুদ্র পরিবার বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য লেখা হয় না, সর্ব-সাধারণের জন্যই এগুলি রচিত হইয়া থাকে। তাহাদের সহানুভূতি পাইতে হইলে তাহাদের সামাজিক জীবনের প্রকৃত সমস্যামূলক চিত্রই অঙ্কিত করা উচিত। নতুবা এরূপ কাল্পনিক ও অবাস্তব চিত্র তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত সমালোচক ম্যাথিউ আর্নল্ড ইংল্যাণ্ডের তাৎকালিক নাটকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। তিনি সে সময়ে ফরাসী নাটক হইতে সঙ্কলিত বা তাহার অনুকরণে লিখিত ইংরেজী নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সক্ষোভে লিখিয়াছিলেন, "We have numberless imitations and adaptations from the French. All of these are at bottom fantastic." আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"The result of putting French wine into English bottles is to give to the attentive observer a sense of incurable falsity in the piece as adapted."

আশা করি, যে সকল নাট্যকার অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণ করেন, তাঁহারা এই সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতের সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন। ফরাসী সমাজ ও ইংরেজ সমাজের মধ্যে প্রভেদ এত সামান্য যে নাই বলিলেই চলে। তথাপি পণ্ডিতপ্রবর ম্যাথিউ আর্নল্ড্ ফরাসী নাটককে ইংরেজী নাটকে রূপান্তরিতকরণকে "fantastic" এবং "false"—অদ্ভুত ও অবাস্তব—বলিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্য সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের বাংলা রূপান্তর কতটা বিসদৃশ হয় তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। "A nation is known by its stage"—রঙ্গালয় জাতির দর্পণ-স্বরূপ—জাতির চিত্তের ও সংস্কৃতির পরিচয় তাহার রঙ্গালয় হইতেই পাওয়া যায়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের রঙ্গালয়ে যাহাতে আমাদের জাতির বিকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হয় তাহা দেখা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

কেবল সমাজতত্ত্বমূলক নাটক নয়। আমাদের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য ধরণের "মনস্তত্ত্বমূলক" নাটকও লিখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এই চেষ্টা উৎসাহ-যোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই জাতীয় যে সকল নাটক লিখিত হইতেছে তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের জন-সাধারণের মনের কোন সম্পর্ক নাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাকারণে আমাদের জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাদের হৃদয় ও মনের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন নীরবে সম্পাদিত হইতেছে তাহারই একটি জীবন্ত চিত্র আমরা আমাদের নবীন নাট্যকারদিগের নিকট পাইবার আশা করি। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমরা অধিকাংশ স্থলে পাইতেছি কতকগুলি বিলাতীভাবাপন্ন কাল্পনিক পরিবারভুক্ত স্নায়ুরোগগ্রস্ত যুবক-যুবতীর সমাজদ্রোহিতার অথবা তাহাদের যৌন মনোবৃত্তির অবাস্তব চিত্র। এ চিত্রগুলি যে পাশ্চাত্ত্য "মনস্তাত্ত্বিক"

আধুনিক বহু তথাকথিত "মনস্তাত্ত্বিক" নাটক বিদেশের অন্ধ-অনুকরণ মাত্র

লেখকদিগের নিকট হইতে ধার করা তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাস্তবিক এই শ্রেণীর নাটকগুলির নিদান খুঁজিতে গেলে "ফ্যাশান" ছাড়া আর বড় কিছু দেখা যাইবে না। আজ ইবসেন, কাল বার্নার্ড শ, তারপরদিন হয়ত কোন রাশিয়ান নাট্যকার শিক্ষিত তরুণদলের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতেছেন এবং নাটকও তদনুসারে লিখিত হইতেছে। আর মাঝে মাঝে প্রেরণা যোগাইতেছেন—ফ্রয়েড বা ঐরূপ আর কোন মনস্তত্ত্ববিদ্। বলা বাহুল্য; অন্যান্য ফ্যাশানের ন্যায় এ ফ্যাশানও অধিক দিন স্থায়ী হয় না—আজ যিনি দেবতা কাল তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে; এবং অন্যান্য ফ্যাশানের ন্যায় এ ফ্যাশানও কেবল সমাজের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ থাকে—জনসাধারণের হৃদয়ে এই সকল নাটক কোন রেখাপাত করে না।

যাহা হউক, অধুনা আমাদের নাটক ও রঙ্গালয়ের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যখন প্রথম সাধারণ

শিক্ষিত দর্শক ও অভিনেতার সংখ্যাবৃদ্ধি নাটক ও রঙ্গালয়ের উন্নতির সহায়

রঙ্গালয় স্থাপিত হয় তখন তাহার প্রায় সকল দর্শকই আসিত শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষার বিস্তার খুব বেশী হয় নাই, সুতরাং যদিও তখন সপ্তাহে একবার মাত্র অভিনয় হইত এবং থিয়েটারের সংখ্যাও অল্প ছিল, তথাপি রঙ্গালয়ে অনেক সময়ে দর্শকাভাব ঘটিত এবং রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ নানা প্রলোভন দেখাইয়া দর্শক আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থার উন্নতি হইল তখন, যখন গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকসমূহ লইয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। এই সকল নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়কেই সমভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলে দর্শক-সংখ্যা স্বতঃই বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর কলিকাতায় লোক-সংখ্যা ও দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোপকণ্ঠ কলিকাতায় এখন পঞ্চাশলক্ষ লোক স্থায়িভাবে বাস করে এবং বাংলা দেশ হইতে প্রতিবৎসর অর্ধলক্ষাধিক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জনসংখ্যার এই

অসম্ভব বৃদ্ধির সহিত থিয়েটারের দর্শক-সংখ্যাও যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ অসংখ্য সিনেমাগৃহকে দিনে তিনবার পূর্ণ করিয়াও এত দর্শক অবশিষ্ট থাকে যে, যদিও এখন থিয়েটারে সপ্তাহে ছয়দিন অভিনয় হয় তথাপি সেখানে দর্শকের বিশেষ অভাব হয় না। অধিকন্তু, শিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে জটিল সামাজিক সমস্যা বা গভীর মনস্তত্ত্বমূলক নাটকের অভিনয়ের পক্ষে এখন আর ততটা বাধা নাই। কেবল দর্শকগণের মধ্যে নহে, অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যেও শিক্ষিতদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে-শিক্ষিত অভিনেতা ছিল না বলিলেই হয়। এখন অনেক গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। অভিনেত্রীদের মধ্যেও শিক্ষিতাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় নাটকের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ শিক্ষিত জনমতের নিকট কোন অপকৃষ্ট বা হীন-রুচিজাত নাটক প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব আমাদের রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়।

আমাদের বর্তমান নাট্য-কারগণের নিকট আমরা অনেক আশা করিতে পারি

আমাদের আধুনিক নাট্যকারগণের মধ্যেও যে নাট্যপ্রতিভার অভাব নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কতকগুলি নাটকে তাঁহারা যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুবই আশাপ্রদ এবং সেজন্য তাঁহারা শিক্ষিত দর্শকগণের শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের নাটক বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহারা যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য আমাদের রঙ্গালয়ের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেই ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমের অযথা অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই—এরূপ কথা বলিয়া আমি সত্যের অপলাপ করিতে চাহি না, কিন্তু আমি আশা করি তাঁহারা

অচিরে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইবেন এবং অবিলম্বে এই ভ্রান্ত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। জটিল সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যামূলক নাটক লেখার সকল উপাদান তাঁহারা এখন এখান হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিবেন—তাহার জন্য আর বিদেশীর নিকট ঋণ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। বর্ত্তমান যুগ বিপ্লবের যুগ—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এবং সমাজের সকল শ্রেণীরই মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিপ্লব অবিরামগতিতে চলিতেছে। ফলে অন্যান্য সমাজের ন্যায় আমাদেরও সমাজ দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে—বিশেষতঃ স্বাধীনতালাভের পর আমাদিগকে নিত্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এ সময়ে আমাদের সমাজের প্রকৃত সমস্যা লইয়া নাটক রচিত হইলে কেবল আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতি হইবে না, পরন্তু আমাদের সমাজেরও যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।

বঙ্গরঙ্গালয়ে মুসলমান নাট্যকারের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয়

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, "বাঙালী" সমাজের অর্থ কেবল হিন্দু-সমাজ নয়, মুসলমানসমাজও এ সমাজের একটা খুব বড় অংশ। সে সমাজের গতিপ্রকৃতি আমাদের নাট্যসাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিন্তু মুসলমান নাট্যকার ভিন্ন এ কাজ অন্য কাহারও দ্বারা সন্তোষজনক ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিপ্লবকর ঘটনাবলীর সংঘাতে মুসলমান সমাজের অন্তস্তলে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা কেবল তাঁহারাই দেখাইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন খ্যাতনামা মুসলমান নাট্যকার আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। বঙ্গদেশে মুসলমান সাহিত্যিক বা কবির অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যজগতে উচ্চাসন দাবী করিতে পারেন। মধ্যযুগে তাঁহারা বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে কিরূপভাবে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানকালেও গদ্যপদ্য ও সঙ্গীত-রচনায় তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজি নজরুল-প্রমুখ মুসলমান কবিদের মধুর সঙ্গীতসমূহ এখন বাংলার ঘাটে মাঠে গৃহে

সর্বত্র গীত হইয়া থাকে। বর্তমানকালের কয়েকখানি নাটকও যে নজরুল-রচিত সঙ্গীতের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। যাঁহাদের হৃদয় হইতে এরূপ ভাব ও রসের ধারা প্রবাহিত হয় তাঁহারা যে উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারেন না ইহা বিশ্বাস করা যায় না। একথা সত্য যে, মধ্যযুগে তাঁহাদের লিখিত কাব্য ও পল্লিগীতি-সমূহ নাটকীয় উপাদানে বিশেষ সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে সেগুলি হইতে নাটক গড়িয়া উঠিতে পাবে নাই, কিন্তু এখন আর সে সকল কারণ বর্তমান নাই। ফলে মুসলমান নায়ক-নায়িকা লইয়া এখন বহু নাটক হিন্দু নাট্যকারদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশেষ সাফল্যলাভও করিয়াছে। কিন্তু এগুলির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ আরব্য-উপন্যাসাদির ন্যায় গল্পগ্রন্থ হইতে বা ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি হইতে বাঙালা মুসলমান সমাজের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি কবিয়া আমাদের মিলনের পথ সুগম করিতে হইলে এ পরিচয় বিশেষ আবশ্যক। বাস্তবিক পরস্পারের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের মধ্যে এই সাম্প্রদাযিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ অজ্ঞতা দূর করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়—সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটকের অভিনয়। এ চেষ্টা যে পূর্বে কখন হয় নাই তাহা নহে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এ বিষয়েও পথপ্রদশন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য বাংলাব হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান—এই তিন সম্প্রদায়ের লোককেই—একসূত্রে গাঁথিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতাপ এই তিন সম্প্রদায় হইতেই সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সকলকেই সমান মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানীতে মন্দির-প্রতিষ্ঠাব সহিত মস্‌জিদ ও গির্জা নির্মাণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাটকের একটা দৃশ্যে প্রতাপের সহিত ইশার্খার কথোপকথনসূত্রে প্রতাপের এই নীতি সুস্পষ্টভাবে

ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য এরূপ নাটক উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের দ্বারাই লিখিত হওয়া উচিত। এইজন্যই আমরা এসময়ে উপযুক্ত মুসলমান নাট্যকারের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি।

রঙ্গালয়ের সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য অকতব্য

কিন্তু আমাদের মধ্যে একদল আমাদের নাটক অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্যই যেন অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহাদের মতে, পাশ্চাত্ত্য দেশের রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আমাদের রঙ্গমঞ্চকে ঐশ্বর্য্য-শালী করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের নাটকের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নাই। কিন্তু আমি মনে করি তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। পাশ্চাত্ত্যেরা অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাসপরায়ণ ধনীদের সাজসজ্জার আড়ম্বর চিত্তচমৎকারী হইলেও সকলের পক্ষে তাহা অনুকরণীয় নয়। আমাদের দেশের মত দরিদ্রদেশে রঙ্গমঞ্চের সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটাদির জন্য ঐরূপ ব্যয় করিতে গেলে "ঢাকের দায়ে মনসা বিকাইয়া" যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে পাশ্চাত্ত্যদের অনুকরণে এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। তৎপরিবর্তে নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষের দিকেই আমাদিগের অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, রঙ্গমঞ্চ খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও এ দুই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করা যায় এবং তাহাই রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতি, কারণ রঙ্গালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য অভিনয় দেখান, চিত্র-প্রদর্শন নয়। দৃশ্যের চমৎকারিত্ব কখনও নাট্যবস্তুর বা অভিনয়ের অভাব পূরণ করিতে পারে না। দৃশ্যপটাদি-বিহীন অনাচ্ছাদিত রঙ্গমঞ্চে মহাকবি সেক্সপিয়ার যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, পশ্চিমের আধুনিকতম যন্ত্র ও মহাবিস্ময়কর দৃশ্যপটাদির সাহায্যেও তাঁহার বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বলিতে কি, সেকালের নিরাভরণ "platform stage"-এর

স্থানে একালের মহৈশ্বর্য্যশালা "picture-frame stage"-এর প্রবর্ত্তন কেবল নাট্যাভিনয়ের ব্যয়বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র—তাহার ফলে নাটকের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। বলিয়াছি, platform stage আমাদের যাত্রার আসরের মতই ছিল এবং সেরূপ রঙ্গালয়ের একটা বিশেষ গুণ ছিল এই যে, সেখানে দর্শকগণের দৃষ্টি নাটকের উপরেই থাকিত এবং কেবল তাহারই রস তাহারা সম্পূর্ণ উপভোগ করিত। কিন্তু এখন বোধ হয় সাধারণ দর্শকেরা নাটক অপেক্ষা চিত্র-দর্শনের আনন্দই অধিকতর উপভোগ করিয়া থাকে। নাট্যকারেরাও অনেক সময়ে নাটকের রস বা বিষয়বস্তুর কথা না ভাবিয়া কি উপায়ে তাঁহাদের নাটকের মধ্যে চমকপ্রদ দৃশ্য দেখান যাইতে পারে তাহাই চিন্তা করিয়া থাকেন। নাট্যাধ্যক্ষ মহাশয়েরাও সাধারণতঃ এইরূপ নাটকের পক্ষপাতী, কারণ যাহা দ্বারা দর্শক আকৃষ্ট হয় তাহাই তাহাদেব মতে উৎকৃস্ট নাটক। কিন্তু নাটকের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে এ মনোভাব আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ নাটক অপেক্ষা দৃশ্যপটের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রতিমা ছাড়িয়া চালচিত্রের পূজার ন্যায়ই অসঙ্গত। আমাদের বোঝা উচিত, অলঙ্কার বা পরিচ্ছদেব বাহুল্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে তাহা ভারস্বরূপ হইয়া স্বচ্ছন্দ-গতিতে বাধা দেয়। এই কাবণেই আজ পাশ্চাত্যদেশে সেকালের ভূ-চুম্বী গাউন একালে "দেডহাতি গামছা"য় পরিণত হইয়াছে। সুখের বিষয়. আমাদের গৃহলক্ষ্মীরাও "সর্বাঙ্গ গহনায় মোড়া" যে বর্বরতার লক্ষণ সেটা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। বিলাতী বিবিদের ও দেশী মহিলাগণের এই রুচি-পরিবর্ত্তন কেবল যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও গতিব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নয়, পরন্তু একটা প্রকাণ্ড অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করিয়া দিয়াছে। আমাদের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণও যদি এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তাহা হইলে যে কেবল তাঁহাদের ব্যয়-লাঘব হইবে তাহা নয়, পরন্তু নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষসাধন-বিষয়ে তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হইতে পারিবেন।

উপসংহারে আমি নাটক-রচনার প্রকৃষ্ট প্রণালী-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ আমার বিশ্বাস আমাদের বর্তমান নাট্যকারগণ এবিষয়ে উন্নতিসাধনের জন্য সচেষ্ট না হইলে আমাদের নাটকের আশানুরূপ উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় এ বিদ্যাও আয়ত্ত করা যে শিক্ষা- ও সাধনা-সাপেক্ষ—এ কথা ভুলিলে চলিবে না। এমন কি, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী নাট্যকারকেও যে সাফল্য অর্জন করিবার জন্য বহুবৎসর যাবৎ শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে এরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অনুভব করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ জনপ্রিয় নাটকসমূহ পাঠ করিয়া বা তাহাদের অভিনয় দেখিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া নাটক লিখিতে বসেন। ফলে তাঁহাদের নাটকগুলি আদর্শরূপে গৃহীত নাটকসমূহেরই অনুকরণমাত্র হইয়া দাড়ায়। তাঁহাদের নাট্য-প্রতিভার এইরূপ পরিণতি নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য কেবল ব্যাকরণ অধিগত করিয়া যেমন সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সেইরূপ কেবল নাট্যশাস্ত্রের সূত্র মুখস্থ করিয়া নাট্যকার হওয়া যায় না—সেজন্য জন্মগত নাট্যপ্রতিভা আবশ্যক। কিন্তু বলিয়াছি, প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিলে বিশিষ্ট প্রতিভাও কার্যকরী হয় না। সুতরাং নাট্যকারমাত্রেরই এই সকল কৌশল শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সুখের বিষয়, বহু নাট্যশাস্ত্রবিশারদ মহাজন নানা উপদেশ দান করিয়া এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই সকল বিশেষজ্ঞ মহাজনদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও নাট্যকার ভল্‌তেয়ারের স্থান খুব উচ্চে। তিনি উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেগুলি বাস্তবিক অত্যন্ত মূল্যবান্। আমি শিক্ষার্থীদের

নাটক-রচনার পূর্ব্বে রচনা-কৌশল শিক্ষা করা উচিত

ট্র্যাজেডি রচনা সম্বন্ধে ভল্‌তেয়ারের উপদেশ

সুবিধার জন্য সেই সকল উপদেশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Compact a lofty and interesting event in the space of two or three hours; bring forward the several characters only when each ought to appear; ......... develop a plot as probable as it is attractive; say nothing unnecessary; instruct the mind and move the heart; be eloquent always and with the eloquence proper to every character represented."

কিন্তু এই উপদেশগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে দেওয়া হইয়াছে যে, বিনাব্যাখ্যায় ইহাদের মর্ম সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ হইবে বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য আমি এই সূত্রগুলির একটু বিস্তৃতভাবে টীকাটিপ্পনীসহ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।—উদ্ধৃতাংশে ভল্‌তেয়ার প্রথমেই বলিয়াছেন, উচ্চশ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্তু "lofty" এবং "interesting"—মহৎ ও কৌতূহলোদ্দীপক—হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া উচ্চজাতীয় নাটক লেখা চলে না— "মেঘনাদ-বধ" ট্র্যাজেডির বিষয় হইতে পারে, "ছুছুন্দর-বধ" নয়। কিন্তু বিষয় কেবল মহৎ হইলেই হইবে না, তাহা সাধারণের চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই আকর্ষণী-শক্তি দেশকালপাত্রের উপর নির্ভর করে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এদেশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাহিনী যে ভাবে সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, ট্রয়-যুদ্ধের কাহিনী তাহা পারে না। যাহা হউক, এইরূপে একটি ভাল নাটকীয় আখ্যান নির্বাচন করিবার পর, সেইটিকে এরূপ ভাবে "compact" অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ও সংহত করিয়া লইতে হইবে যে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নাটকটির অভিনয় শেষ হইতে পারে। নাটকের মধ্যে যখন যে চরিত্রগুলি আনা আবশ্যক কেবল সেইগুলি ভিন্ন নাট্যকার অন্য কোন অবান্তর চরিত্রকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবেন না এবং

উচ্চশ্রেণীর নাটকের বিষয়-বস্তু ও গঠনপ্রণালী

যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই সেরূপ কথা কাহাকেও বলিতে দিবেন না—অর্থাৎ নাটকে প্রত্যেক চরিত্রের ও প্রত্যেক বাক্যের সার্থকতা থাকা চাই। কেবল চরিত্র ও বাক্য কেন, প্রত্যেক দৃশ্যও সার্থক হওয়া আবশ্যক। আখ্যায়িকার মধ্যে যে সকল ঘটনার সহিত নাটকের মুখ্য ঘটনা বা উপপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই সেগুলি বাদ দেওয়া যে অবশ্যকর্তব্য তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন এমন কতকগুলি ঘটনা থাকে যেগুলির সহিত নাটকের সম্বন্ধ থাকিলেও রঙ্গমঞ্চে সেগুলি দেখাইবার সুবিধা বা প্রয়োজন হয় না। এই সকল ঘটনা নেপথ্যে ঘটাইয়া তাহার বিবরণ নাটকের কোন চরিত্রের মুখে দিলেই যথেষ্ট হয়। কোন কোন ঘটনা (যেমন উদ্বন্ধনে মৃত্যু) এরূপ বীভৎস যে রঙ্গমঞ্চে সেগুলি না দেখানই ভাল। পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি ঘটনা থাকে যেগুলি প্রদর্শন করা অবশ্যকর্তব্য। সেগুলি না দেখাইলে নাটকের অঙ্গহানি হয়—তাহার আকর্ষণী-শক্তি কমিয়া যায়। "চৈতন্য-লীলা"-নাটকের জগাইমাধাই-উদ্ধারের দৃশ্য এইরূপ দৃশ্য। ইহা যদি নেপথ্যে ঘটান হইত, তাহা হইলে দর্শকমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইতেন সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক William Archer সেইজন্য এরূপ দৃশ্যের নাম দিয়াছেন "obligatory scenes"—অবশ্য-প্রদর্শনীয় দৃশ্যাবলী। যিনি নাটকের জন্য নির্বাচিত আখ্যায়িকা হইতে এই সকল দৃশ্য অভ্রান্তভাবে বাছিয়া লইতে পারেন, তিনি যথার্থ নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্যগুলি কেবল বাছিয়া লইলেই চলিবে না, নাটকের প্লট গড়িয়া তুলিবার সময়ে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যে, ঘটনা-পরম্পরার ধারাবাহিকতা যেন কোনরূপে নষ্ট না হয়।

অবশ্যপ্রদর্শনীয় দৃশ্যাবলী

নির্বাচিত আখ্যানকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিবার জন্য নূতন ঘটনা-সৃষ্টির অধিকার অবশ্য নাট্যকারের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কোন ঘটনা যাহাতে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম না করে সেদিকেও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখানে "সম্ভাব্যতা" শব্দের অর্থ দেশকালপাত্রের

সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য। যাহা একের পক্ষে বা একসময়ে বা এক-স্থানে সম্ভবপর তাহা অন্যের পক্ষে বা অন্যসময়ে বা অন্যস্থানে সম্ভবপর না হইতে পারে। সুতরাং কোন কার্য্যের বা ঘটনার সম্ভাব্যতা বিচার করিতে হইলে স্থানকালপাত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনামাত্রকেই "অসম্ভব" বলা যায় না। নাট্যকার যদি কাহাকেও দৈত্যদানবদেবতার ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া তিনি যে কোন অলৌকিক কার্য্য করাইতে পারেন। এই কারণে, আলাদিনের "প্রদীপ-দৈত্য" যখন চীনদেশ হইতে একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তুলিয়া আনিয়া এক রাত্রের মধ্যে তাহা আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্তে বসাইয়া দেয় তখন কেহই বিস্মিত হন না। কিন্তু নাট্যকার যদি কোন সাধারণ লোককে দিয়া সেরূপ কোন কার্য্য করাইতে চান তাহা হইলে তৎপূর্বে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে সেরূপ শক্তি সে কিরূপে কোথা হইতে অর্জন করিয়াছে। এই জন্যই কুরুক্ষেত্রে দুর্বল জয়দ্রথের হস্তে মহাবল ভীমের পরাভব দেখাইবার পূর্বে জয়দ্রথের তদুপযোগী বরলাভের কথা কবি আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যেও কেহ কেহ অনেক সময়ে এই সোজা কথাটা ভুলিয়া যান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিজেন্দ্রলালের "ভীষ্ম" নাটকে ক্ষুদ্র শাল্বরাজের হস্তে ভারতের অদ্বিতীয় বীর ভীষ্মের হীন লাঞ্ছনার কথা পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই অসম্ভব ঘটনার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্ত হাস্যকর। একটি অসির অভাবেই নাকি মহারথ ভীষ্ম পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে শাল্বের অনুচরদের কাহারও হস্ত হইতে একটা অস্ত্র কাড়িয়া লইবার বা তাহা-দিগকে কোনরূপ বাধা দিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তিনি হারাইয়াছিলেন! ইদানীং রাজনৈতিক উত্তেজনার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে সকল তথা-কথিত "ঐতিহাসিক নাটক" লিখিত হইয়াছে, তাহার লেখকগণের

নাটকে "সম্ভাব্যতা" শব্দের অর্থ—চরিত্রের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য

মধ্যে অনেকে বীররসের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখাইতে গিয়া সম্ভাব্যতার প্রায় সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় "জোআন্ অব্ আর্ক্" সৃষ্টির দিকে, কারণ এইরূপে এক সঙ্গে বীরত্ব ও রোমান্সের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার সুবিধা হয়। এই সকল "জোআন্" কোন রাজকুমারী বা সন্ন্যাসিনী বা ঐজাতীয় অন্য কোন মূর্তিতে সহসা আবির্ভূত হন এবং ঐতিহাসিক জোআন্ অপেক্ষা যে তাঁহারা অধিকতর "অঘটনঘটনপটীয়সী" তাহাব প্রমাণ দিতে তাঁহাদের অণুমাত্র বিলম্ব হয় না। একটা উদাহরণ দিই। দৃশ্য —রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সভায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রবল শত্রু রাজ্য আক্রমণ কবিতে আসিতেছে, কিন্তু সেনাপতি জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাজ্যে সৈন্যসামন্ত যুদ্ধসরঞ্জামাদি প্রযোজনীয় সকল দ্রব্যেরই একান্ত অভাব। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাহা করেন, অনেক চিন্তার পর রাজা তাহাই করিলেন—তিনি শত্রুর সহিত সন্ধি করাই স্থির করিলেন। আর রক্ষা আছে? অমনই কোথা হইতে ষোড়শী রাজকন্যা অর্ধ-প্রসাধিত অবস্থায় বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিযা আসিযা তীব্রস্বরে বলিলেন, "কি! সন্ধি! না তা কিছুতেই হোতে পারে না। আর কেউ যুদ্ধ না করে, আমি একাই যুদ্ধ কোর্‌ব।" রাজকন্যা বালিকা—যুদ্ধবিদ্যায় একেবারেই অনভিজ্ঞা ও অনভ্যস্তা—জোআন্ অব্ আর্কের মত তিনি কোন দৈবশক্তি লাভ করেন নাই বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন নাই - কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রায় সকলেই —বিশেষতঃ দর্শকবৃন্দ—তাঁহার সেই বীরবাক্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার ফলে রাজকুমারীর প্রশংসাধ্বনিতে সমস্ত রঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল! রাজকুমারীও এই অসাধারণ বিজয়লাভের পর নিশ্চিন্তমনে তাঁহার প্রসাধনকার্য্য সমাপন করিতে প্রস্থান করিলেন! বলা বাহুল্য, নাট্যকারগণ কেবল এই হাততালির লোভেই এরূপ দৃশ্য দেখাইয়া থাকেন, নতুবা ইহার অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভাব্যতা যে তাঁহারা দেখিতে পান না, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

অতএব দেখা যাইতেছে, নাটককে অনবদ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহা হইতে যাহা কিছু অনাবশ্যক, অবান্তর ও অসম্ভব তাহা সমস্তই নিষ্করুণভাবে পরিবর্জন করিতে হইবে। এইরূপে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্র বাদ দেওয়ার ফলে নাটকের কলেবর হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু নিপুণহস্তে কর্তিত রত্নের ন্যায় তাহার মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। একজন সূক্ষ্মদর্শী নাট্যসমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, "In the drama, as in all other departments of poetry, the half is often greater than the whole." এইজন্য অভিজ্ঞ নাট্যকারগণ সকল সময়ে আখ্যানবস্তুর সারভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষারভাগ গ্রহণ করেন এবং নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেবল প্রয়োজনীয় ঘটনা ও মুহূর্তগুলি উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তোলেন। তাহার ফলে নাটকের রস এরূপ জমাট বাঁধিয়া উঠে যে, শ্রোতৃবর্গ তাহা আস্বাদ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন। অনেক সময়ে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে সংঘটিত (কিন্তু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত) ঘটনা একই দৃশ্যে দেখাইতে হয়। ইহাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, পরন্তু তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্য-লীলা" নাটকান্তর্গত জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের দৃশ্যটিকে এ নিয়মেরও উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দকে আহত করিবার পর হইতে অনুতপ্ত জগাই-মাধাইয়ের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণপূর্বক হরিনামে রত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটি বস্তুতঃ একই দিনে বা একই স্থানে ঘটে নাই। সুতরাং ঘটনাটির প্রত্যেক অংশ পৃথক্ ভাবে রঙ্গালয়ে প্রদর্শন করিতে হইলে একাধিক দৃশ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু "চৈতন্য-লীলা"র মত নাটকে এরূপ একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ ঘটনার জন্য যদি দুই তিনটি দৃশ্য সন্নিবেশ করা যায় তাহা হইলে নাটকের গতি স্বভাবতই মন্থর ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য উক্ত নাটকে এই সকল

অবান্তর, অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনাদি বাদ দিলে নাটকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বাড়ে বই কমে না।

ঘটনা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া একই দৃশ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দৃশ্যটির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, অথচ সত্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, কারণ একই ব্যাপারের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইলেও, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একটি।

ইহার পর ভল্‌তেয়ার বলিয়াছেন, নাটক কেবল হৃদয়গ্রাহী হইলে চলিবে না, শিক্ষাপ্রদও হওয়া চাই। যাহাতে ভাবুক ও চিন্তাশীল—উভয় প্রকার দর্শকই—তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাট্যকারের সে ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশে নাটকের এই আদর্শই যে চিরকাল গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদাদি নাট্যকারগণ যে এই আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা আমি যথাস্থানে দেখাইয়াছি।

*নাটকমাত্রেই শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত*

পরিশেষে ভল্‌তেয়ার নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত একটি ক্ষুদ্র বাক্যে তাহারও সঙ্কেত দিয়াছেন। বাস্তবিক নাটকের বিষয় ও দৃশ্য-নির্বাচনাদি ঠিকমত হইলেও ভাষা যদি তদুপযোগী না হয়, তাহা হইলে নাট্যকারের সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, নাটক যখন কতকগুলি ক্রিয়া ও তৎসংক্রান্ত কথোপকথনের সমষ্টিমাত্র, তখন তাহার মধ্যে কাব্য বা সুমার্জিত সাধুভাষা প্রয়োগের স্থান নাই কারণ সাধারণ কথাবার্তায় আমরা সেরূপ ভাষা ব্যবহার করি না। কিন্তু এ মত যে সকল স্থানে খাটে না, তাহা আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ পড়িলেই বুঝিতে পারি। এই সকল নাটকের অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্রকে প্রায় পদ্যে বা ছন্দোযুক্ত গদ্যে কথোপকথন করিতে দেখা যায় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সকল কথা আমাদের অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া দূরে

*নাটকে স্থানবিশেষে সাধু-ভাষা ব্যবহারের উপযোগিতা*

থাকুক, আমরা সেগুলি হইতে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। যদি সেগুলিকে "কথ্য" অর্থাৎ সাধারণ চল্‌তি ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত নাটকটি নীরস নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক মূল্যবান্ সাজসজ্জা, মনোহর দৃশ্যপট, বিচিত্রবর্ণের আলোক প্রভৃতি যেমন অভিনয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, শব্দের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য তেমনই নাটককে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলে। ভাষা ভাবের পরিচ্ছদস্বরূপ। যে সকল অভিনেতা রাজা মহারাজা প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁহাদের পদমর্য্যাদাদি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন তাঁহাদিগকে তদুপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে হয়, উচ্চভাবসমূহকে সুপরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যও তেমনই সেগুলিকে অনেক সময়ে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় এবং এ বিষয়ে "চল্‌তি"ভাষা অপেক্ষা "সংস্কৃতানুসারিণী" সাধুভাষা যে অধিকতর উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে সংস্কৃত ভাষাকে অপরাজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে অতি অল্প কথায় উচ্চতম ভাব প্রকাশ করা যায়, তদুপরি ইহার মধুর ঝঙ্কার আমাদের কর্ণে চিরদিন অমৃত বর্ষণ করে। বিশেষতঃ এই সঙ্গীত-প্রিয় দেশে এরূপ সুস্বরবিশিষ্ট ভাষার যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফলে আমাদের নাট্যকারগণ ইহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে চণ্ডীবরের সহিত বিজয়ার কথোপকথনের দৃশ্যটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সুন্দর দৃশ্যটি দর্শকগণকে কিরূপ মুগ্ধ করে তাহা সকলেই জানেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, দৃশ্যটির এই মোহিনীশক্তির মুখ্য ভিত্তি হইতেছে ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সমন্বয়। যদি ইহার ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে যে ইহার সকল মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাটকে পদ্য-ব্যবহার সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। অনেক ভাব পদ্যে যেমন সুন্দর, সরস ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়, গদ্যে তেমন পারা যায় না। সেই জন্য অনেক নাট্যকার এরূপ স্থলে পদ্যের ব্যবহারই সমীচীন মনে করেন। বস্তুতঃ অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় নাট্যকারেরও দৃষ্টি থাকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকে— যে ভাবে যখন যে কথাটি বলিলে তাহা দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হয়, তিনি সেই ভাবে তাহা বলেন এবং শক্তি থাকিলে ইহার জন্য গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ আয়ুধই তিনি সমানভাবে ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাটকটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা বিল্বমঙ্গলকে এক প্রেমমুগ্ধ সরল যুবকরূপে দেখিতে পাই। তাহার কথাবার্তাও তদনুরূপ—খুব সরল চল্‌তি ভাষায় সে তাহার প্রাণের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যখন চিন্তামণি-কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে ভীষণ ঝড় উঠিল এবং সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ হৃদয় মধ্যে সে আপনাকে নিতান্ত একা বলিয়া অনুভব করিল, তখন সে নদীস্থিত শবদেহের দিকে চাহিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—

নাটকে পদ্যের ব্যবহার কোথায় সঙ্গত

"এই পরিণাম !
এই নরদেহ—জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায় !
এই নারী—এরও এই পরিণাম !
নশ্বর সংসারে,
তবে হায় ! প্রাণ দিছি কারে ?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন—
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি ?
ওই ঊষা—ও'ও ছায়া।
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি।

হেরি আজ নিবিড় আঁধার ;—
আমি কার, কে আছে আমার ?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন ?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর-নশ্বর ছায়া মাঝে !
কোথা, কে আছ আমার ?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণমন করি সমর্পণ।"

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্ভুত এই অপূর্ব উচ্ছ্বাস কি ছন্দো-যতিহীন গদ্যে এইরূপে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হইতে পারিত ? এমন কি, এস্থানে মিত্রাক্ষর বা মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেও ইহার শক্তি ও স্বাভাবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়, কারণ এখানে বিল্বমঙ্গলের চিন্তাস্রোত ঠিক ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না—একটির পর আর একটি চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় আকুল করিতেছে। এই খণ্ড খণ্ড চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার জন্য যে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দই সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপে নাটকের ভাষা সকল প্রকারই হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়েই স্থান-কাল-পাত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকা দরকার। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক চরিত্রের মুখে এমন কথা বসাইতে হইবে যাহা দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে। যে সকল কথা দর্শকদিগের মনে ছাপ দিতে পারে না সে সকল কথা যত কম কওয়া যায় ততই ভাল। কোন্ অবস্থায় কোন্ চরিত্রের মুখে কোন্ কথা দিলে তাহা সবাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা প্রতিভাবান্ নাট্যকারেরা তাঁহাদের সহজজ্ঞান হইতে বুঝিতে পারেন এবং তদনুসারে তাঁহারা বাক্য প্রয়োগ করেন। এই প্রকার বাক্পটুতা নাট্যপ্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ ও নাটকের সাফল্যের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ভল্‌তেয়ার তাই বলিয়াছেন, "Be eloquent

always and with the eloquence proper to every character represented," অর্থাৎ সকল সময়ে প্রত্যেক পাত্র বা পাত্রীর মুখে এমন কথা বসাও যাহা একেবারে শ্রোতার মর্মস্থানে গিয়া আঘাত করিতে পারে, কিন্তু তাহা যেন চরিত্রোপযোগী হয়, কারণ চরিত্রের সহিত যে ভাষা সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে না তাহা কখনও লোককে মুগ্ধ করিতে পারে না। "নীলদর্পণ" নাটকে তোরাপের প্রত্যেক কথাটি দর্শকগণকে আকুল করিয়া থাকে, তাহার কারণ তাহার ভাষা অমার্জিত হইলেও তাহার ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত প্রাণের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোরাপের মুখে যদি বিশুদ্ধ ভাষা বসাইয়া দেওয়া হয় বা "জনা" নাটকের জনার অগ্নিময় বাক্যাবলী যদি চল্‌তি ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের বর্তমান মর্মস্পর্শিনী শক্তি কতটা কমিয়া যায় তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

নাটকের ভাষা সর্বত্র চরিত্র ও সময়োপযোগী হওয়া উচিত

ভল্‌তেয়ার আর একস্থানে বলিয়াছেন, নাটকে simile বা উপমালঙ্কার অপেক্ষা metaphor বা রূপকালঙ্কারের ব্যবহারই অধিকতর ফলপ্রদ, কারণ metaphor হৃদয় হইতে সোজা বাহির হইয়া আসে, কিন্তু simile বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে রচিত হয়—"A metaphor when it is natural belongs to passion ; but a simile belongs only to intelligence."—সুতরাং metaphorএর স্বাভাবিকতা ও আবেগ simileতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য কবিরা হৃদয়ের গভীরতর আবেগসমূহ প্রকাশ করিতে হইলে রূপক-অলঙ্কার ব্যবহার করাই সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। ম্যাক্‌বেথের "Out, out, brief candle" অথবা যোগেশের "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"—এক একটি জমাটবাঁধা দীর্ঘশ্বাস—বক্তার সমস্ত প্রাণ মথিত করিয়া এ কথাগুলি নির্গত হইয়াছে। যদি এই দুইটিকে উপমা-অলঙ্কারের সাহায্যে প্রসারিত করা যায় তাহা হইলে মুহূর্তমধ্যে ঐ দীর্ঘশ্বাস তরল হইয়া

নাটকে উপমালঙ্কার অপেক্ষা রূপকালঙ্কারের ব্যবহার অধিকতর উপযোগী

বাতাসে উড়িয়া যাইবে—আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার" আর অবকাশ পাইবে না। সেক্সপিয়ার যখন তরুণ ছিলেন, তখন তিনি অন্যান্য লেখকের ন্যায় স্বভাবতই সাহিত্যিক-সমাজে নাম কিনিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার প্রথম বয়সের লেখাতে উপমার ছড়াছড়ি, শব্দালঙ্কারের বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর তিনি যত পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিলেন, ভাব রস ও নাটকীয় ক্রিয়াদির উপরেই তাঁহার মনোযোগ তত বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে তিনি উপমাদির পরিবর্তে রূপক-অলঙ্কার অধিকতর ভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ, উপরেই বলিয়াছি, হৃদয়ের অনির্বচনীয় গভীর ভাবসমূহকে সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ভাবে প্রকাশ করিতে রূপক-অলঙ্কারের যেরূপ শক্তি আছে উপমাদি অলঙ্কারের সেরূপ নাই। সেক্সপিয়ারের প্রথম বয়সের লেখা নাটকগুলির সহিত তাঁহার পরিণত বয়সে রচিত "ম্যাক্‌বেথ" প্রভৃতির তুলনা করিলে সকলেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নাটকের আর একটি প্রধান সমস্যা—সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভাবে নাটকের উপসংহার করা। নির্বিঘ্নে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াও অনেক নাট্যকারকে এইখানে আসিয়াই হোঁচট খাইতে দেখা যায়। অথচ সুসঙ্গত ও সুশোভন সমাপ্তির উপর নাটকের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। একটা কথা আছে, "যার শেষ ভাল তার সব ভাল।" নাটকের পক্ষেও এ কথা খাটে। কিন্তু নাটকের "শেষ ভাল"র অর্থ সকল সময়ে "মধুর-মিলন" নয়। জীবন-রঙ্গভূমিতে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রবিশেষ কিরূপ পরিণতি লাভ করে তাহাই দেখান নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং নাটকের উপসংহার অঙ্কিতচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যে নাট্যকার নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার সংঘাতের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য

নাটকের আদ্যাংশের সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য থাকা উচিত

রাখিয়া নাটকের যথোপযুক্ত উপসংহার করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। সেক্সপিয়ার এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—"Character is destiny"—চরিত্রই নিয়তির জনক। হ্যাম্‌লেট, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি নাটকে তিনি এই সত্য সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই সকল নাটকের নায়কেরা বিশেষ গুণবান্ হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া জন্মগত দুর্বলতা ছিল এবং তাহাই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে তাঁহাকে ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। বাস্তবিক বীজের মধ্যেই ফল নিহিত থাকে—এক প্রকার বীজ হইতে অন্য প্রকার ফল উৎপন্ন হওয়া স্বভাববিরুদ্ধ। যে নাটকের স্বাভাবিক গতি মিলনের দিকে, তাহাকে ট্র্যাজেডির গৌবব দিবার জন্য যদি নায়ক বা নায়িকাকে শেষ মুহূর্তে বিনা কারণে বজ্রাঘাতে বা জলে ডুবাইয়া মারা যায় তাহা হইলে সে বেচারির সহিত নাটকেরও অপমৃত্যু ঘটে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকের ন্যায় যে নাটকের স্বাভাবিক প্রবণতা ট্র্যাজেডির দিকে—যাহার মেরুদণ্ড 'ট্র্যাজিক' উপাদানে নির্মিত—তাহাকে জোর করিয়া 'মিলনান্ত' করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। প্রকৃত নাটকের প্লট একটি অখণ্ড ও সম্পূর্ণ কাহিনী লইয়া রচিত হয়—আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যেক ঘটনা অন্য ঘটনাগুলির সহিত নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং ঐ ধারাবাহিক ঘটনাবলীর যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা ভিন্ন নাটকের অন্য প্রকার উপসংহার হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য নাট্যজগতের ভরতমুনি আরিস্তোতল পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"Tragedy is an imitation of an action that is complete and whole···A whole is that which has a beginning, a middle and an end···A well-constructed plot, therefore, must neither

প্লট-গঠন-সম্বন্ধে আরিস্তোতলের উপদেশ

begin nor end at haphazard." অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু হইতেছে—আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটি সমগ্র ক্রিয়া, সুতরাং তাহা যেখানে সেখানে আরম্ভ ও যেমন তেমন করিয়া শেষ করা চলে না। আরিস্তোতল যে এই কারণে অসম্বদ্ধ-উপকাহিনী-সংবলিত নাটকের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহের আলোচনা-কালে বলিয়াছি। 'ট্র্যাজেডি'-সম্বন্ধে এই উপদেশ দেওয়া হইলেও 'কমেডি'-সম্বন্ধেও যে ইহা প্রযোজ্য তাহা বলা বাহুল্য।

আর একটি কথা। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অনাবশ্যক বাহুল্য ও রসের অপপ্রয়োগাদি দোষ সর্বথা পরিবর্জনীয়। অনুপযুক্ত স্থানে সুন্দর বস্তুও কুৎসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ত স্থানে কুৎসিতও সুন্দর রূপ ধারণ করে। মেকলে ঠিকই বলিয়াছেন, "The sure sign of a general decline of an art is the frequent occurrence, not of deformity, but of misplaced beauty." নাট্যকার পূর্ণ রসভাণ্ডার বা অতুল শব্দসম্পদের অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি উপযুক্ত স্থানে তাহা প্রয়োগ না করিয়া যেখানে সেখানে তাহার ছড়াছড়ি করেন তাহা হইলে কেবল তাহার অপব্যয় করা হয় না, পরন্তু সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির নামে কেবল কদর্য্যতারই সৃষ্টি করা হয়। ঐশ্বর্য্য থাকিলেই হয় না, তাহা উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিবার কৌশলও শিক্ষা করা চাই। রসিকতা ও বাক্‌পটুতা উভয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহাদের অযথা প্রয়োগ বা অতিরিক্ত বাহুল্য সকল সময়েই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। তাই মেকলে বলিয়াছেন, "In general, tragedy is corrupted by eloquence and comedy by wit." অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ নাট্যকারগণ তাহা জানেন। সেইজন্য তাঁহারা স্থানাস্থান বিচার করিয়া যথোপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং "অযথা বাহুল্য" দোষ সকল সময়ে পরিহার করিয়া চলেন।

রসের অপপ্রয়োগ ও অযথা-বাহুল্য সর্বথা বর্জনীয়

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমাদের নাটকের যথার্থ

উন্নতিসাধন করিতে হইলে কি নাট্যকার, কি অভিনেতা, কি দর্শক, সকলকেই নাট্যবিষয়ে অল্পবিস্তর শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত নাট্যানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যরচনার কলা-কৌশল শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। ইংল্যাণ্ড এখনও ততদূর অগ্রসর না হইলেও নিশ্চেষ্ট নয়। লিবারপুল বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যবিষয়েব অনুশীলনের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যবিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ডিপ্লোমা পাইতে হইলে নাট্যবিষয়ের—

নাটক ও নাট্যকলার উন্নতির জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চেষ্টা

ঔপপত্তিক (Theoretical) ও ব্যাবহারিক (Practical)—উভয় অংশই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে হয়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরও এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়-সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও পর্য্যন্ত এবিষয়ে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, হতাশার কারণ নাই। পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সহসা এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হন নাই। ক্রমশঃ তাঁহারা নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পূর্বে বাংলা ভাষার বিশেষ আদর ছিল না, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনই ইংরেজী সাহিত্যের স্থান অতি নিম্নে ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সার আর্থার কুইলার-কোউচ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তথায় "ট্রাইপস্" বা অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যকে মধ্যযুগের ও আধুনিক ভাষা-সমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্ররূপে গণ্য করা হইত।

কিন্তু সার আর্থার আসিয়া ইংরেজী সাহিত্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের স্বতন্ত্র ট্রাইপসের ব্যবস্থা হয়। যখন এইরূপে ইংরেজী সাহিত্যের রীতিমত অধ্যাপনা ও অনুশীলন আরম্ভ হইল, তখন ঐ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংশ নাট্যসাহিত্যের যথেষ্ট পরিমাণে আদর বাড়িয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি, এদেশেও যখন হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে ইংরেজী সাহিত্যের সহিত ইংরেজী নাটক বিশেষ ভাবে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে কলেজের ছেলেদের মধ্যে ইংরেজী নাটক অভিনয় করিবার জন্য একটা প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠে। কিন্তু বাংলা ভাষা বা বাংলা নাটকের প্রতি তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। যাহা হউক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বাংলা ভাষার একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে এবং বাংলা নাটকও বাংলা পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং অচিরে ইহাকে রাজভাষা ও উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছাত্রদের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের চর্চা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব আশা করা যায়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দেশীয় নাটকের অনুশীলন-বিষয়েও পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুগামী হইতে এখন আর কুণ্ঠিত হইবেন না। সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্বেই কর্তৃপক্ষ দেশীয় সঙ্গীত ও সুকুমারকলা-চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন যদি দেশীয় নাটক ও নাট্যকলার চর্চাও এই বিভাগের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হইবে না। এই সঙ্গে কতিপয় পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ-স্থাপনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। দেশের

আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতিসাধনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন

শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ-কর্ত্তৃক পরিচালিত এরূপ একটি রঙ্গালয় যে একটি আদর্শ শিক্ষালয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সাধারণ নাট্যালয়ের মত জনপ্রিয়তার খাতিরে এখানে কোন নিকৃষ্ট নাটকের অভিনয় করা সম্ভবপর হইবে না। প্রমাণস্বরূপ "কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে"র নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একসময়ে এই সমিতির সুশিক্ষিত ছাত্রসভ্যগণ তাঁহাদের সুন্দর অভিনয়ের দ্বারা কেবল নিজেরাই খ্যাতি অর্জন করেন নাই, পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে শিশিরকুমার-প্রমুখ কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা সাধারণ রঙ্গালয়েও নবযুগ প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণসাফল্য লাভ করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে, কারণ ভিত্তি দৃঢ় না হইলে তাহার উপর উচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ করা যায় না। এখন আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কেবল লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার উপর সম্প্রতি কিছু কিছু শিল্প, ব্যবসায় ও কৃষি শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইতেছে। অবশ্য এই দুই প্রকার শিক্ষারই উদ্দেশ্য এক—ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া। জীবনরক্ষার জন্য জীবমাত্রেরই যে এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন আছে, তাহা অবশ্য আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে যে এ শিক্ষা যথেষ্ট নয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি" প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট বৃত্তিই মানবকে অন্য জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে এবং এইগুলিই আমাদের সকল কৃষ্টির ভিত্তি। সুতরাং পূর্ণ-মানবত্ব লাভ করিতে হইলে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এই বৃত্তিগুলিরই পূর্ণবিকাশ-সাধনের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং এ চেষ্টা শৈশবকাল হইতেই আরম্ভ করা উচিত, কারণ এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য যে দুই শক্তির বিশেষ প্রয়োজন—অনুকরণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি—সে দুই শক্তিই শিশুর

পূর্ণ মানবত্বের বিকাশসাধন করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংশোধন আবশ্যক

মধ্যে অতি প্রবল অবস্থায় বর্তমান থাকে। বলিতে গেলে, শিশু-মাত্রেই অভিনেতা হইয়া জন্মায় ও অবিমিশ্র কল্পনা-রাজ্যে বাস করে। সে অপরকে যাহা করিতে দেখে, সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় সে তাহা অনুকরণ করে এবং এইরূপে তাহার জ্ঞানের সীমা বাড়িয়া চলে। সে যে গল্প শুনে অবিলম্বে নিজেকে তাহার নায়করূপে কল্পনা করিয়া বসে এবং মহানন্দে কল্পনার অশ্বে চড়িয়া সে "সাত-সমুদ্দুর তের নদী" পার হইয়া যায়। বস্তুতঃ সকল শিশুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" শিশুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ হেন শিশুর কল্পনা-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া যাঁহারা তাহাকে কেবল অঙ্ক কষাইয়া মানুষ করিতে চাহেন তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত এই কল্পনা-প্রাচুর্যই সকল সাহিত্য ও কৃষ্টির জনক। অতএব ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা না করিয়া উৎসাহদান করাই উচিত। বস্তুতঃ শিশুরা যে সকল সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে সেগুলি সমাজের সম্পত্তি। সমাজ যদি সে সম্পত্তি রক্ষণে ও বর্ধনে অবহেলা করে, তবে সে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করে।

স্থতরাং বালকবালিকাদের জন্মগত প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বৃত্তির বিকাশ সাধন করিতে চেষ্টা করা সমাজহিতৈষিমাত্রেরই কর্তব্য। সুবিখ্যাত

অভিনয়-শিক্ষা কিশোরদের শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত

ফরাসী লেখক ও দার্শনিক রুসো তাঁহার Emil নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বালকবালিকাদের শিক্ষা-বিষয়ে সমাজের এই কর্তব্য-সম্বন্ধে সাধারণের (বিশেষতঃ জননীগণের) দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকর্ষণ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া Countess de Genlis নামে এক সম্ভ্রান্ত ফরাসী মহিলা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরিবারস্থ বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য Theatre of Education for Children নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন এবং স্বয়ং কিশোরোপযোগী কতিপয় নাটক লিখিয়া তাহাদের দ্বারা অভিনয় করান। তাঁহার এই রঙ্গালয় কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এবং এই সদ্দৃষ্টান্ত নানা স্থানে অনুসৃত হইয়াছিল। এখন

ইউরোপে ও আমেরিকায় একপ বহু রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তথাকার বিদ্যালয়সমূহেও বালকবালিকাদের দ্বারা নাট্যাভিনয়ের রীতিমত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য তাহাদের অভিনয়োপযোগী বহু নাটকও এই সঙ্গে লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল নাটক অভিনয়ের ফলে যে, কিশোরছাত্রগণের বোধশক্তি, রসানুভাবকতা ও কল্পনাশক্তি বহুলপরিমাণে বর্ধিত হয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সকল ছাত্র পরে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গালয়ে শিক্ষিত অভিনেতা যোগায় না পরন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে রসজ্ঞ দর্শকগণের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশের নাটক ও রঙ্গালয়ের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কেবল তাহাই নহে। অভিনয়-শিক্ষাকালে স্বরসাধনা ও আবৃত্তিকলাজ্ঞানলাভের ফলে তাহারা যে বাক্‌পটুতা অর্জন করে তাহা উত্তরকালে তাহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি-লাভের পক্ষেও বিশেষ কার্যকরী হয় কারণ এই গণতান্ত্রিক যুগে কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, সাধারণতঃ বাগ্মিগণই নেতৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আমি আশা করি আমাদের বর্তমান শিক্ষানিয়ন্তারা আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের শিক্ষার এই অভাবটিও পূরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার জন্য অবশ্য কিশোরদের উপযোগী স্বতন্ত্র নাটক প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে, কারণ "বালকবালিকাদের উপযোগী" বলিয়া যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বয়স্কদের জন্য রচিত নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণমাত্র। বলা বাহুল্য, পিতার পরিচ্ছদ কাটিয়া শিশুপুত্রকে পরাইবার ব্যবস্থার ন্যায়ই এ সকল রচনা অসঙ্গত ও বিসদৃশ। কিশোরচিত্তের বিকাশসাধনে বা তাহার আনন্দবর্ধনে এ সকল নাটক প্রকৃতপক্ষে কোন সাহায্যই করিতে পারে না। কিন্তু এজন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। নাট্যাভিনয় কিশোরদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাদের উপযোগী নাটক যে অচিরে যথেষ্ট পরিমাণে লিখিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---